স্বদেশ ও সম্পদ

৪

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নূতন পাঠ্যক্রম অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার বিদ্যালয়সমূহের জন্য লিখিত নবম শ্রেণীর ভূগোল বিষয়ের আবশ্যিক পাঠ্যগ্রন্থ

স্বদেশ ও সম্পদ

চতুর্থ ভাগ

শ্রীহর্ষ মল্লিক এম. এ, বি. এড
শিক্ষা-বিভাগঃ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

হরফ প্রকাশনী ।।এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ।।কলকাতা-১২

বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ
অধ্যাপক দেবব্রত মারিক
অধ্যাপক মলয়কুমার বসু
কবি শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশনায়ঃ
হরফ প্রকাশনী
এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা-১২

মুদ্রণেঃ
রূপবাণী প্রেস
শ্রীভোলানাথ হাজরা
৩১ বিপ্লবী পুলিন দাস স্ট্রীট,
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জাঃ
আমিনুর রহমান

মূল্যঃ চার টাকা

সূচীপত্র

সূচীপত্র

।। ভারতের ভৌগোলিক অঞ্চল ।।

১। অবস্থান, আয়তন ও সীমা

ভূমিকা ঃ ভারত এক বিশাল দেশ। যুগে যুগে কত না কবি কত ভাবে এই দেশের বন্দনা গান গাহিয়াছেন। ইহার বুকে কত সম্রাটের রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি শোনা গিয়াছে, কত সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন ঘটিয়াছে, পটপরিবর্তনে ইহার বুকে রচিত হইয়াছে কত না ইতিহাস! কচ্ছ হইতে কামরূপ এবং কাশ্মীর হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত যে বিশাল দেশ—আমরা সেই ঐতিহ্যময় ভারতের নাগরিক।

উপমহাদেশ ঃ এই দেশের মধ্যে আবহমান কাল ধরিয়া বহু বৈচিত্র্যের সমাবেশ হইয়াছে। একটি মহাদেশের মধ্যে ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, জীবনধারণ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি—প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্র্যের সমাহার দেখা যায়—তাহার প্রায় সবগুলিই এই দেশের মধ্যে আছে বলিয়াই মনীষিরা ভারতকে একটি উপমহাদেশ বলিয়া অভিহিত করেন। প্রকৃতপক্ষে বিশাল মহাদেশের সর্বপ্রকার বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্য লইয়াই আমাদের এই ক্ষুদ্র ভারত ভূমি গড়িয়া উঠিয়াছে।

বৈপরীত্যের সমাবেশ ঃ প্রবল শৈত্য ও প্রখর উত্তাপযুক্ত অঞ্চল, শুষ্ক বৃষ্টিপাতহীন মরুস্থলী ও সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চল, শস্যশ্যামলা জনপদ ও রুক্ষ কঠিন মৃত্তিকা, সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গ ও বিস্তীর্ণ সমভূমি—এই সকলই ভারতে দেখা যায়। কবির বাণীঃ 'নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান' অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়া উঠিয়াছে। কচ্ছ হইতে কামরূপ পর্যন্ত যে বৈচিত্র্য, কাশ্মীর হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত তাহা অপেক্ষা কম বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়।

ভারতের সীমা ঃ ভারতের উত্তরে বিশাল হিমালয় পর্বত দাঁড়াইয়া আছে। ইহার একটি অংশ ভারতের উত্তরপূর্ব ও পূর্ব অংশেও প্রসারিত হইয়াছে। হিমালয়ের উত্তরে আছে চীন প্রজাতন্ত্র। ভারতের দক্ষিণে কন্যাকুমারিকার সমুদ্রতটে ভারত মহাসাগরের জল স্পর্শ করিতেছে। দক্ষিণপূর্ব দিকে রহিয়াছে বঙ্গোপসাগর ও দক্ষিণ পশ্চিম দিকে আরব সাগর অবস্থিত। নবগঠিত বাংলাদেশ ভারতের পূর্বদিকে। পশ্চিমে পশ্চিম পাকিস্তান ও আফগানিস্তান প্রভৃতি রাজ্য।

ভারতের অবস্থান ঃ অক্ষাংশ অনুযায়ী এই দেশ পশ্চিমে ৬৮°৭' পূর্ব দ্রাঘিমা

হইতে পূর্বে ৯৭°২৫′ পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বিস্তৃত এলাকার মধ্যে কচ্ছ ও কাথিয়াবাড় উপদ্বীপের পশ্চিমতম প্রান্ত হইতে নাগাভূমির পূর্বতম প্রান্ত পর্যন্ত বিধৃত। দক্ষিণে ৮°৪′ উত্তর অক্ষাংশ হইতে উত্তরে ৩৭°৬′ উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের মধ্যে কন্যাকুমারিকা অন্তরীপের দক্ষিণতম প্রান্ত হইতে কাশ্মীরের উত্তরতম প্রান্ত পর্যন্ত বিধৃত। এই বিচিত্র অবস্থানের জন্যই কর্কটক্রান্তি রেখা (২৩½° উত্তর অক্ষাংশ) ভারতের প্রায় মধ্যভাগের উপর দিয়া পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত।

ভারত ও পৃথিবী ঃ পৃথিবীর মানচিত্রে এশিয়ার দক্ষিণ দিকে তিনটি উপদ্বীপের মধ্যে ভারতের স্থান প্রায় কেন্দ্রস্থলে। ইহার উত্তরে আছে এশিয়া মহাদেশের সমগ্র অংশ দক্ষিণ-পশ্চিমে আরব সাগর ও ভারত মহাসাগর অতিক্রম করিয়া আফ্রিকা মহাদেশের ভূখণ্ড এবং দক্ষিণপূর্বে ভারত মহাসাগর অতিক্রম করিয়া অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ। সুতরাং এশিয়া, আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া পূর্ব গোলার্ধের এই তিন মহাদেশের কেন্দ্রস্থলে ভারতের অবস্থান।

ভারতের আয়তন ঃ সাধারণ ভাবে ভারতের আয়তন প্রায় ৩৬২৭৫০০ বর্গ কিলোমিটার। আয়তনের দিক হইতে ইহা পৃথিবীতে সপ্তম স্থানের অধিকারী। এশিয়া মহাদেশে ইহার স্থান তৃতীয়—রাশিয়া ও চীন যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। ভারতের স্থলসীমার দৈর্ঘ্য ১৫২০০ কিলোমিটার এবং জলসীমার বা উপকূলাঞ্চলের দৈর্ঘ্য ৫৭০০ কিলোমিটার।

২। ভৌগোলিক অঞ্চল ঃ সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা

অঞ্চল গঠন ঃ ভারত বহু বৈচিত্র্যের দেশ। সে বৈচিত্র্য—কখনও প্রাকৃতিক, কখনও আর্থিক আবার কখনও বা নিছকই সাংস্কৃতিক। সুতরাং বিশাল ভূভাগের আলোচনা করিবার জন্য স্বভাবতই কয়েকটি অঞ্চল বিভাগের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এ-ক্ষেত্রে অঞ্চল শব্দটির বিশেষ অর্থ হইল, ভারতের বিভিন্ন অংশে যে সকল ভিন্নধর্মী বা বিষমধর্মী বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, সেগুলির মধ্যে যেগুলি মোটামুটি সমধর্মী সে-গুলির একত্রীকরণ। সুতরাং এই একত্রীকরণ ভূপ্রকৃতি ভেদে হইতে পারে, অর্থ-নৈতিক উৎপাদন ভেদে হইতে পারে কিংবা সাংস্কৃতিক জীবন ভেদেও করা যায়।

একটি উদাহরণ ঃ এই সংজ্ঞাটি বিশদ করিতে হইলে একটি উদাহরণ দেওয়া প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম অংশকে মালভূমি অঞ্চল বলা হয়। এই অংশের ভূ-প্রকৃতির সহিত পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানের ভূপ্রকৃতির সম্বন্ধ বড়ই কম। এই অংশ ও সন্নিহিত অঞ্চলগুলির সহিত একটি প্রাকৃতিক সমধর্মিতা বর্তমান বলিয়াই সমগ্র অঞ্চলটি মালভূমি নামে অভিহিত করা যায়।

ভূপ্রকৃতির গুরুত্ব ঃ একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডকে যে কোন ভিত্তিতেই বিভক্ত করা হউক না কেন, এ কথা সত্য যে দেশের জলবায়ু, মনুষ্যবসতি, অর্থনীতি ইত্যাদি মানবের যাবতীয় কর্মধারা সেই অঞ্চলের ভূপ্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। ভূপৃষ্ঠের বৈচিত্র্যের দ্বারাই জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য নির্ণীত হয়, কৃষি-শিল্প ইত্যাদি উন্নয়নের সুযোগ বহুলাংশে নির্ভর করে ভূপ্রকৃতির গঠনের উপরেই। অনুরূপভাবে জন-বসতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ইত্যাদি মানবের সকল কর্ম প্রচেষ্টাই ভূ-

হইতে পূর্বে ৯৭°২৫′ পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বিস্তৃত এলাকার মধ্যে কচ্ছ ও কাথিয়াবাড় উপদ্বীপের পশ্চিমতম প্রান্ত হইতে নাগাভূমির পূর্বতম প্রান্ত পর্যন্ত বিধৃত। দক্ষিণে ৮°৪′ উত্তর অক্ষাংশ হইতে উত্তরে ৩৭°৬′ উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের মধ্যে কন্যাকুমারিকা অন্তরীপের দক্ষিণতম প্রান্ত হইতে কাশ্মীরের উত্তরতম প্রান্ত পর্যন্ত বিধৃত। এই বিচিত্র অবস্থানের জন্যই কর্কটক্রান্তি রেখা (২৩$\frac{1}{2}$° উত্তর অক্ষাংশ) ভারতের প্রায় মধ্যভাগের উপর দিয়া পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত।

ভারত ও পৃথিবী : পৃথিবীর মানচিত্রে এশিয়ার দক্ষিণ দিকে তিনটি উপদ্বীপের মধ্যে ভারতের স্থান প্রায় কেন্দ্রস্থলে। ইহার উত্তরে আছে এশিয়া মহাদেশের সমগ্র অংশ দক্ষিণ-পশ্চিমে আরব সাগর ও ভারত মহাসাগর অতিক্রম করিয়া আফ্রিকা মহাদেশের ভূখন্ড এবং দক্ষিণপূর্বে ভারত মহাসাগর অতিক্রম করিয়া অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ। সুতরাং এশিয়া, আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া পূর্ব গোলার্ধের এই তিন মহাদেশের কেন্দ্রস্থলে ভারতের অবস্থান।

ভারতের আয়তন : সাধারণ ভাবে ভারতের আয়তন প্রায় ৩৬২৭৫০০ বর্গ কিলোমিটার। আয়তনের দিক হইতে ইহা পৃথিবীতে সপ্তম স্থানের অধিকারী। এশিয়া মহাদেশে ইহার স্থান তৃতীয়—রাশিয়া ও চীন যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। ভারতের স্থলসীমার দৈর্ঘ্য ১৫২০০ কিলোমিটার এবং জলসীমার বা উপকূলাঞ্চলের দৈর্ঘ্য ৫৭০০ কিলোমিটার।

২। ভৌগোলিক অঞ্চল : সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা

অঞ্চল গঠন : ভারত বহু বৈচিত্র্যের দেশ। সে বৈচিত্র্য—কখনও প্রাকৃতিক, কখনও আর্থিক আবার কখনও বা নিছকই সাংস্কৃতিক। সুতরাং বিশাল ভূভাগের আলোচনা করিবার জন্য স্বভাবতই কয়েকটি অঞ্চল বিভাগের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এ-ক্ষেত্রে অঞ্চল শব্দটির বিশেষ অর্থ হইল, ভারতের বিভিন্ন অংশে যে সকল ভিন্নধর্মী বা বিষমধর্মী বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, সেগুলির মধ্যে যেগুলি মোটামুটি সমধর্মী সেগুলির একত্রীকরণ। সুতরাং এই একত্রীকরণ ভূপ্রকৃতি ভেদে হইতে পারে, অর্থনৈতিক উৎপাদন ভেদে হইতে পারে কিংবা সাংস্কৃতিক জীবন ভেদেও করা যায়।

একটি উদাহরণ : এই সংজ্ঞাটি বিশদ করিতে হইলে একটি উদাহরণ দেওয়া প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম অংশকে মালভূমি অঞ্চল বলা হয়। এই অংশের ভূ-প্রকৃতির সহিত পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানের ভূপ্রকৃতির সম্বন্ধ বড়ই কম। এই অংশ ও সন্নিহিত অঞ্চলগুলির সহিত একটি প্রাকৃতিক সমধর্মিতা বর্তমান বলিয়াই সমগ্র অঞ্চলটি মালভূমি নামে অভিহিত করা যায়।

ভূপ্রকৃতির গুরুত্ব : একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডকে যে কোন ভিত্তিতেই বিভক্ত করা হউক না কেন, এ কথা সত্য যে দেশের জলবায়ু, মনুষ্যবসতি, অর্থনীতি ইত্যাদি মানবের যাবতীয় কর্মধারা সেই অঞ্চলের ভূপ্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। ভূপৃষ্ঠের বৈচিত্র্যের দ্বারাই জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য নির্ণীত হয়, কৃষি-শিল্প ইত্যাদি উন্নয়নের সুযোগ বহুলাংশে নির্ভর করে ভূপ্রকৃতির গঠনের উপরেই। অনুরূপভাবে জনবসতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ইত্যাদি মানবের সকল কর্ম প্রচেষ্টাই ভূ-

ভারতের ভৌগোলিক অঞ্চল

১ক ১খ ১গ ১ঘ ১ঙ ১চ ১ছ
২ক ২ক ২খ ২গ ২ঘ
৩ ৪ ৮
৫ক ৫খ ৫গ ৫ঘ ৫ঙ
৬ক ৬খ ৬গ ৬ঘ
৭ক ৭খ ৭গ ৭ঘ
৯ক ৯খ ৯গ ৯ঘ ৯ঙ ৯চ ৯ছ

৮০° ৮২° ৮৪° ৮৬°
৩২° ২০° ১২°
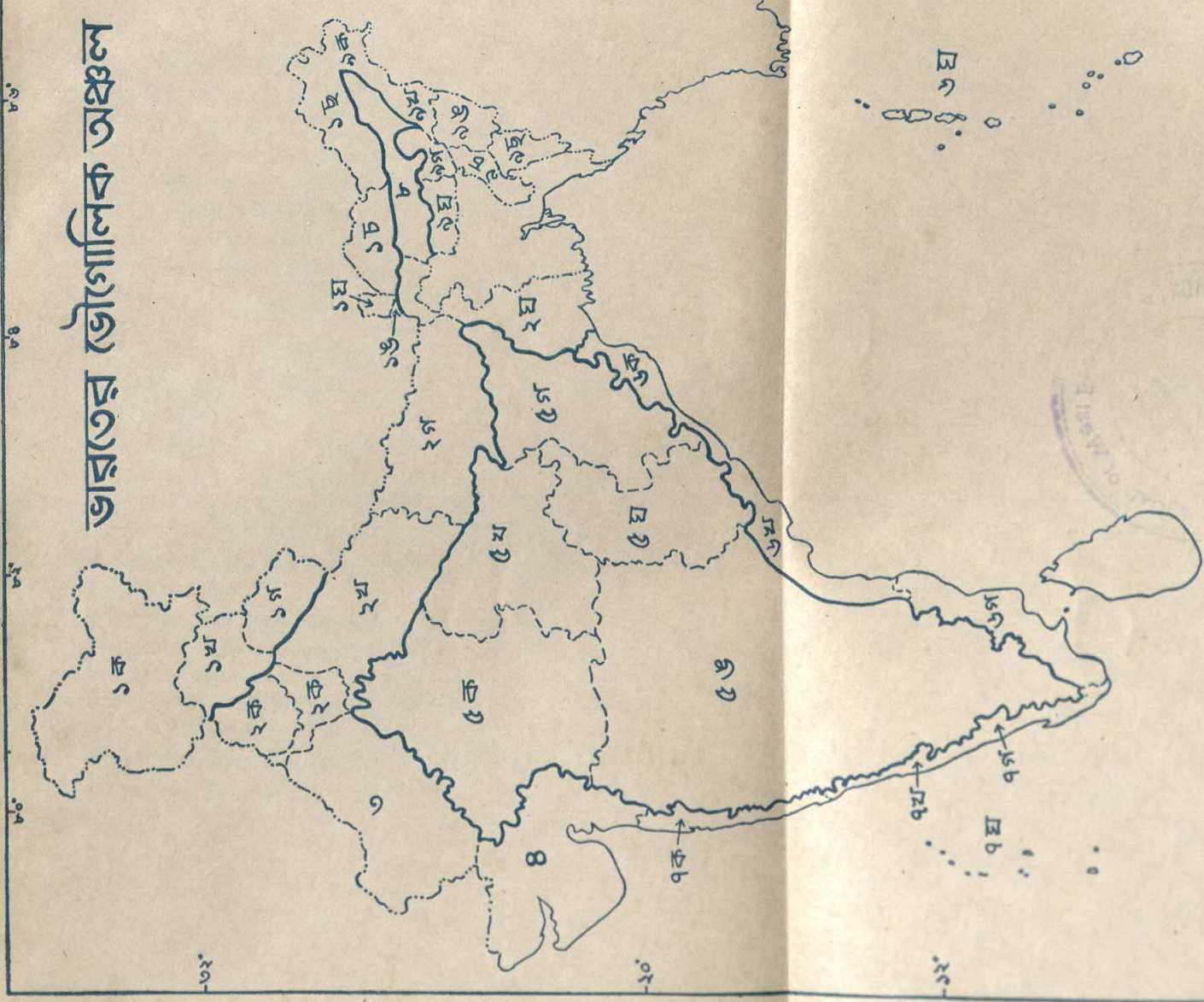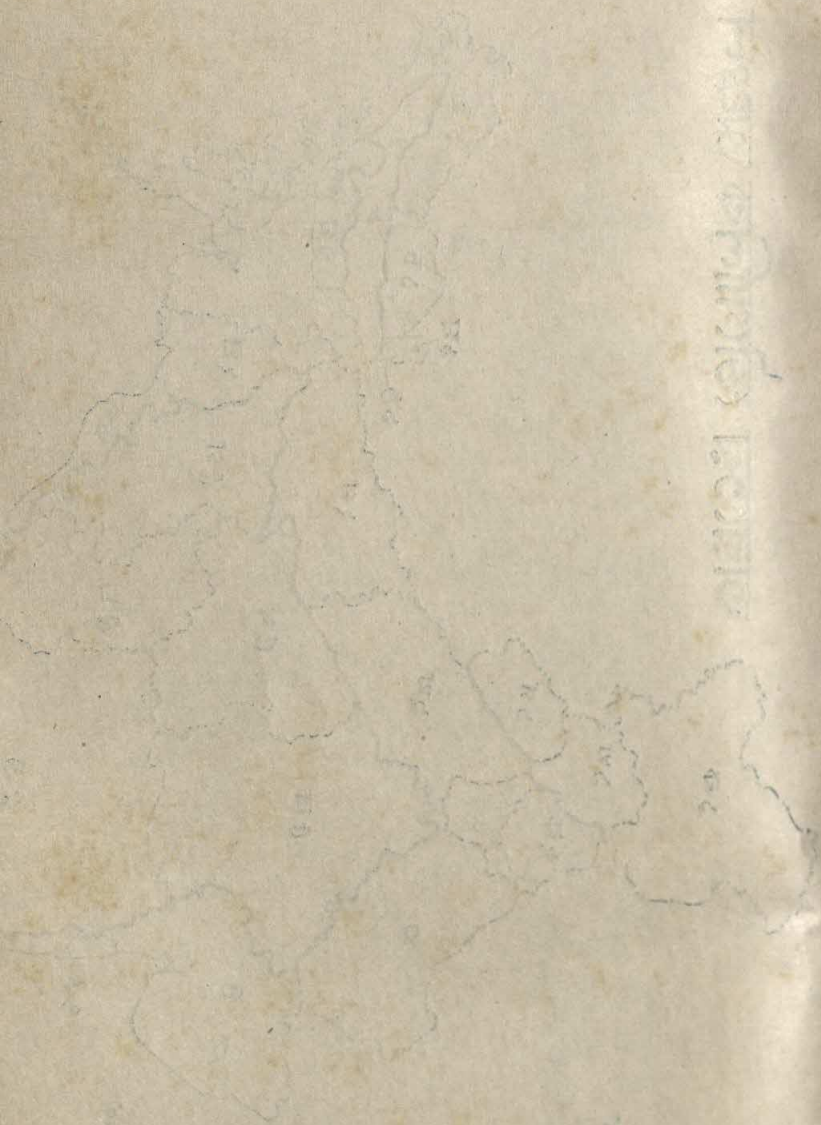
প্রকৃতির গঠনের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং বলা চলে সর্বপ্রথমে ভূ-প্রকৃতি, তাহার পর জলবায়ু, অর্থনীতি ইত্যাদির স্থান।

অঞ্চল গঠনের অসুবিধাঃ ভারতকে ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করিবার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সীমারেখার সমস্যাই প্রধান বাধা। কেন না, অঞ্চল বিভক্তি-করণের আন্তর্জাতিক নিয়মানুযায়ী অন্যান্য দেশের মত ভারতও তাহার রাজনৈতিক সীমারেখা দ্বারাই পরিচিত ও নিয়ন্ত্রিত। এই সীমারেখা যে নিতান্তই প্রয়োজনভিত্তিক এবং তাহার অন্তর্নিহিত যুক্তিগুলি যে মোটেই ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নয়—তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। কেবলমাত্র গুজরাট রাজ্যের সহিত একটি মাত্র ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলের (কাথিয়াবাড় অন্তরীপ) সাদৃশ্য থাকিলেও, অন্যান্য সর্বক্ষেত্রেই ভারতের রাজনৈতিক সীমারেখার সহিত ভূ-প্রকৃতির কোন সম্বন্ধ নাই। রাজস্থান মরুভূমি বলিয়া পরিচিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহার পশ্চিম অংশ মরুভূমি মাত্র, কিন্তু পূর্বাংশ মালভূমির অন্তর্গত। আবার মহারাষ্ট্র, মহীশূর রাজ্যের উপকূলীয় অঞ্চল এবং সমগ্র কেরালা রাজ্য লইয়া গঠিত হইয়াছে পশ্চিম উপকূল অঞ্চল। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক সীমারেখা একান্তই গৌণ হইয়া পড়িয়াছে।

৩। ভারতের ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চল

ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চল ঃ এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতকে সাধারণভাবে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করা যায় ঃ

(১) হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল, (২) গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল, (৩) মরুময় অঞ্চল, (৪) কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ের অন্তরীপ অঞ্চল, (৫) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল, (৬) পূর্ব উপকূল অঞ্চল, (৭) পশ্চিম উপকূল অঞ্চল, (৮) ব্রহ্মপুত্র নদী উপত্যকা ও (৯) উত্তরপূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চল। আলোচনার সুবিধার জন্য প্রতিটি অঞ্চলকে তাহাদের স্বাভাবিক ভূ-প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে আরও ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

ভূপ্রাকৃতিক বনাম রাজনৈতিক অঞ্চলঃ বিশদ আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক অঞ্চলের সহিত এই ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলগুলির সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা করা যাইতে পারে। কারণ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, উপরোক্ত ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলগুলি প্রচলিত রাজনৈতিক অঞ্চলের সীমারেখা দ্বারা নির্দিষ্ট বা নিয়ন্ত্রিত নয়। নিম্নের তালিকাটি হইতে এই বিষয়ের একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যাইবেঃ

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এই ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলের পটভূমিতে সেই অঞ্চলের মানুষের কর্মধারা কিভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইতেছে—তাহাই আলোচিত হইবে।

ক্রমিক নং	ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চল	রাজনৈতিক অঞ্চল	অন্তর্ভুক্ত অংশ	প্রাকৃতিক সীমা
১	হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল	(১) জম্মু ও কাশ্মীর (২) হিমাচল প্রদেশ (৩) উত্তরপ্রদেশ, (৪) পশ্চিমবঙ্গ, (৫) আসাম	(১) সমগ্র জম্মু ও কাশ্মীর, (২) সমগ্র হিমাচল প্রদেশ, (৩) উত্তর প্রদেশের উত্তরাংশ, (৪) পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ, (৫) আসামের উত্তরাংশ।	উত্তরে হিমালয় পর্বত ও তিব্বতের মালভূমি, দক্ষিণে সিন্ধু গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সমভূমি, পূর্বে আরাকান ইয়োমা পর্বতমালা, পশ্চিমে মরু অঞ্চল।
২	গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল	(১) উত্তরপ্রদেশ, (২) বিহার, (৩) পশ্চিমবঙ্গ, (৪) পঞ্জাব, (৫) দিল্লী	(১) সমগ্র দক্ষিণাংশ, (২) সমগ্র উত্তরাংশ, (৩) মধ্য ও দক্ষিণ অংশ, (৪) সমগ্র অংশ সিন্ধু উপত্যকার অন্তর্গত, (৫) সমগ্র অংশ	উত্তরে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল, দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি, পূর্বে বাংলাদেশের পদ্মা-মেঘনা সমভূমি, পশ্চিমে রাজস্থানের মরু অঞ্চল।
৩	মরুময় অঞ্চল	(১) রাজস্থান	(১) সমগ্র পশ্চিম অংশ	উত্তরে সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমি, দক্ষিণে কাথিয়াবাড় অন্তরীপ অঞ্চল, পূর্বে উদয়পুর মালভূমি ও পশ্চিমে পাকিস্তানের মরুপ্রায় অঞ্চল।
৪	কচ্ছ-কাথিয়াবাড় অন্তরীপ অঞ্চল	(১) গুজরাট	(১) সমগ্র প্রদেশ	উত্তরে মরু অঞ্চল, দক্ষিণে কাম্বে উপসাগর, পূর্বে মালব মালভূমি পশ্চিমে কচ্ছ উপসাগর।

ক্রমিক নং	ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চল	রাজনৈতিক অঞ্চল	অন্তর্ভুক্ত অংশ	প্রাকৃতিক সীমা
৫	দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল	(১) মহারাষ্ট্র, (২) মহীশূর, (৩) তামিলনাড়ু, (৪) অন্ধ্র, (৫) উড়িষ্যা, (৬) মধ্যপ্রদেশ, (৭) উত্তর প্রদেশ, (৮) রাজস্থান	মহারাষ্ট্র, মহীশূর, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, উড়িষ্যা—উপকূল ব্যতীত সমগ্র অংশ, সমগ্র মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশের দক্ষিণাংশ, রাজস্থানের পূর্ব অংশ	উত্তরে সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমি, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্বে পূর্ব উপকূল অঞ্চল, পশ্চিমে পশ্চিম উপকূল অঞ্চল
৬	পূর্বতটের উপকূল অঞ্চল	(১) উড়িষ্যা, (২) অন্ধ্র, (৩) তামিলনাড়ু	(১), (২) (৩)-এর উপকূল সন্নিহিত অঞ্চল	উত্তরে ও পশ্চিমে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল, পূর্বে বঙ্গোপসাগর এবং দক্ষিণে ভারত মহাসাগর
৭	পশ্চিমতটের উপকূল অঞ্চল	(১) মহারাষ্ট্র, (২) মহীশূর, (৩) কেরালা	(১) ও (২)-এর উপকূল সন্নিহিত অঞ্চল, (৩) সমগ্র প্রদেশ	উত্তরে কচ্ছ ও কাথিয়াবাড় অন্তরীপ, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর পূর্বে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি, পশ্চিমে আরব সাগর
৮	ব্রহ্মপুত্র নদী-উপত্যকা অঞ্চল	(১) আসাম	(১) আসামের ব্রহ্মপুত্র নদীর উত্তর ও দক্ষিণাংশ	উত্তরে আসাম হিমালয়, দক্ষিণে খাসি-জয়ন্তিয়া পার্বত্য অঞ্চল, পূর্বে নাগা পর্বত, পশ্চিমে বাংলাদেশের পদ্মা-মেঘনা সমভূমি
৯	উত্তরপূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চল	(১) মেঘালয়, (২) নাগাভূমি, (৩) মণিপুর, (৪) ত্রিপুরা, (৫) আসাম	(১), (২), (৩), (৪) সমগ্র অঞ্চল, (৫) সংযুক্ত কাছাড় ও মিকির অঞ্চল এবং মিজোরাম	উত্তরে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, পূর্বে ব্রহ্মের পার্বত্য অঞ্চল, পশ্চিমে ও দক্ষিণে বাংলাদেশের পদ্মা-মেঘনা সমভূমি।

।। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল ।।

১। সাধারণ পরিচয়

ভূমিকা ঃ ভারতের উত্তর ও উত্তরপূর্ব সীমান্ত অঞ্চল ব্যাপিয়া এই পার্বত্য অঞ্চল বিস্তৃত। ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়া এই অঞ্চল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র কাশ্মীর ও জম্মু, হিমাচল এবং উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের কিয়দংশ লইয়া এই বিশাল পার্বত্য অঞ্চল গঠিত। ভারতের উত্তরপূর্ব অংশে হিমালয়ের দক্ষিণমুখী (আরাকান ইয়োমা) শাখাকে ভৌগোলিক ভিন্নতার জন্য পৃথক অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। প্রাকৃতিক দিক হইতে নেপাল, সিকিম ও ভুটান হিমালয় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হইলেও রাজনৈতিক দিক হইতে ইহাদের পৃথক অস্তিত্ব আছে। তবে ভারতের আশ্রিত রাজ্য ও হিমালয়ের অংশরূপে সিকিম ও ভুটানকে আলোচনাভুক্ত করা হইয়াছে।

অবস্থান ও আয়তন ঃ ভারতের উত্তর সীমান্ত বরাবর এই বিশাল পার্বত্য অঞ্চল পশ্চিম হইতে পূর্বে বিস্তৃত রহিয়াছে—২৬°৪০′ উঃ হইতে ৩৭°৫′ উত্তর এবং ৭২°৪০′ পূঃ হইতে ৯৭°৫′ পূর্ব পর্যন্ত এই অঞ্চল বিস্তৃত। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের মোট ৪৪৮৯০৬ বর্গ কিলোমিটার অংশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলের অন্তর্গত রাজ্যগুলির মধ্যে আয়তনের দিক হইতে জম্মু ও কাশ্মীরের স্থান প্রথমেই।

সীমা ঃ ইহার ভৌগোলিক সীমা নিম্নরূপ ঃ পশ্চিমে পশ্চিম পাকিস্তানের পার্বত্য অঞ্চল, উত্তরে পামির ও তিব্বত মালভূমি, পূর্বে আরাকান ইয়োমা পার্বত্য অঞ্চল এবং দক্ষিণে সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদী-বিধৌত সমভূমি। ইহার রাজনৈতিক সীমা নিম্নরূপঃ পশ্চিমে পশ্চিম পাকিস্তান ও আফগানিস্তান, উত্তর ও পূর্বে চীন (তিব্বত) নেপাল, সিকিম, ভুটান এবং দক্ষিণে ভারত রাষ্ট্রের পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের অংশবিশেষ।

বর্তমান পরিচয় ঃ কাশ্মীর হিমালয়ের পশ্চিমাংশের প্রায় ৮৪০০০ বর্গ কিলোমিটার পরিমিত স্থান ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দ হইতে পাকিস্তানের প্রভাবাধীন এবং ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে আরও ৪৬৫০০ বর্গ কিলোমিটার পরিমিত স্থান চীনের কবলিত হইয়াছে। ইহার দক্ষিণে অবস্থিত হিমাচল প্রদেশের পত্তন হয় ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু ১৯৬৬

খৃষ্টাব্দেই ইহা প্রথম পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়। মূলতঃ পাঞ্জাব প্রদেশের কিছু অংশ লইয়া এই রাজ্যটি গঠিত। ইহার দক্ষিণে কুমায়ুন হিমালয় অঞ্চলটি উত্তর প্রদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশ লইয়া গঠিত। ইহার পূর্ববর্তী নেপাল, সিকিম, ভুটান প্রভৃতি হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ভারত রাষ্ট্রের অংশ নহে। হিমালয়ের পূর্বাংশ পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার অধিকাংশ স্থান এবং আসামের উত্তর সীমান্তের পার্বত্য অঞ্চল 'নেফা' বা অরুণাচল দ্বারা গঠিত।

অঞ্চল পরিচয় ঃ এই সকল রাজ্যের নিম্নলিখিত জেলা লইয়া হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল গঠিত হইয়াছে ঃ (ক) কাশ্মীর হিমালয় ঃ (১) যুদ্ধবিরতি রেখার ভিতরে অনন্তনাগ, শ্রীনগর, বরামুলা, ডোডা, উধমপুর, জম্মু, কাঠুয়া, পুঞ্চ, লাডাক, (২) যুদ্ধ বিরতি রেখার বাহিরে গিলগিট, গিলগিট ওয়াজারাত, আদিবাসী এলাকা, চিলা, মুজাফরাবাদ, মিরপুর, পুঞ্চ (একাংশ)। (খ) হিমাচল হিমালয় ঃ সমগ্র প্রদেশের মহাসু, কিন্নায়ুর, মাণ্ডী, চাম্বা, সিরমুর, বিলাসপুর, সিমলা, কাংড়া, কুলু, লাহুল ও স্পিটি জেলা। (গ) কুমায়ুন হিমালয় ঃ উত্তর প্রদেশের উত্তর পশ্চিম অংশের উত্তরকাশী, চামোলী, পিথোরাগড়, আলমোড়া, নৈনিতাল (অংশ), পাউরী, দেরাদুন ও ডেহ্রি জেলা। (ঘ) দার্জিলিং হিমালয় ঃ পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার দার্জিলিং ও কালিম্পং অঞ্চল। (ঙ) সিকিম হিমালয় ঃ সমগ্র সিকিম রাজ্যের সিকিম ও গ্যাংটক অঞ্চল। (চ) ভুটান হিমালয় ঃ সমগ্র ভুটান রাজ্যের থিমপু ও অন্যান্য অঞ্চল। (ছ) আসাম হিমালয় ঃ সমগ্র উত্তরপূর্ব সীমান্ত প্রদেশ বা নেফা (অরুণাচল) অঞ্চলের কামেং, সুবনগিরি, সিয়াং, লোহিত সীমান্ত জেলা লইয়া আলোচ্য হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল গঠিত হইয়াছে।

২। প্রাকৃতিক পরিচয়

ভূপ্রকৃতি ঃ পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গ মাউন্ট্ এভারেস্ট এই পর্বতমালারই একটি শৃঙ্গ। উত্তর ভারতের বিশাল পলিগঠিত সমভূমি সৃষ্টির মূলে যে তিনটি নদীর দান অপরিসীম (সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র), তাহাদের উৎস এই হিমালয়েই। অসংখ্য তুষারাবৃত শৈলশিরা, উচ্চশৃঙ্গ, উপত্যকা, খরস্রোতা নদী লইয়া গঠিত এই বিস্তীর্ণ পার্বত্য অঞ্চলকে সাধারণভাবে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ ১। (ক) কাশ্মীর হিমালয়, (খ) হিমাচল হিমালয় ও (গ) কুমায়ুন হিমালয় লইয়া হিমালয়ের পশ্চিমাঞ্চল এবং ২। (ক) সিকিম (খ) দার্জিলিং (গ) ভুটান ও আসাম হিমালয় লইয়া ইহার পূর্বাঞ্চল। দার্জিলিং ও আসাম হিমালয় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অংশ কিন্তু সিকিম ও ভুটান হিমালয় ভারত রাষ্ট্রের অঞ্চল না হইলেও ভারতের সহিত বিশেষ চুক্তিতে আবদ্ধ বলিয়া একসঙ্গে আলোচনা করা হইল।

পশ্চিমাঞ্চল ঃ (ক) **কাশ্মীর হিমালয়** ঃ এই অঞ্চলের পর্বতগুলি উত্তরপশ্চিম হইতে দক্ষিণপূর্বে নিম্নলিখিতভাবে কয়েকটি প্রায়-সমান্তরাল শ্রেণীতে বিন্যস্তঃ (১) চীনের কুনলুন পর্বতের (৪৫০০ মিটার) অংশমাত্র, (২) গ্রেট কারাকোরাম (৬০০০—৮০০০ মিটার) পর্বতাঞ্চল, (৩) লাডাক (৩৪০০—৪৫০০ মিটার) পর্বতাঞ্চল, (৪) প্রধান হিমালয় ও জাস্কার (৬০০০ মিটার) পর্বতাঞ্চল, (৫) পির পাঞ্জাল (৩৫০০—৫০০০ মিটার) পর্বতাঞ্চল। এই অঞ্চলের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পর্বতশৃঙ্গ হইলঃ নাঙ্গা পর্বত (৮১২৬ মিঃ), নানকুন (৭১৩৫ মিঃ) গডউইন অস্টেন বা k২ (৮৬১১ মিঃ), বাকাপোসী (৭৭৮৮ মিঃ),

দিস্তোগিল (৭৮৮৫ মিঃ) প্রভৃতি। এই অঞ্চলে অনেকগুলি গিরিপথ আছে, তন্মধ্যে জোজিরোটাং প্রভৃতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উল্লিখিত পর্বতমালার মধ্যবর্তী স্থানে এই অঞ্চলের নদী উপত্যকাগুলি অবস্থিত। পির পাঞ্জাল পর্বতমালার দক্ষিণ-প্রান্তে অপেক্ষাকৃত নিম্ন শিবালিক পর্বত (৩০০—৬০০) এবং তাহারও দক্ষিণে পর্বত-পাদদেশের সমভূমি (৩০০ মিঃ) দেখা যায়। (খ) **হিমাচল হিমালয়ঃ** এই অঞ্চলের পর্বতগুলি পূর্বের ন্যায় উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্বে বিন্যস্ত হইয়াছে। কাংরা অঞ্চলে ধওলাধর পর্বতমালা, চাম্বা অঞ্চলে পির পাঞ্জাল পর্বতমালা এবং লাহুল-স্পিটি-কুলু' অঞ্চল প্রধান হিমালয়-জাস্কার পর্বতমালা অবস্থিত। এই অঞ্চলের উচ্চতা সাধারণভাবে পশ্চিম হইতে পূর্বে এবং দক্ষিণ হইতে উত্তরে বাড়িয়াছে। সুতরাং এই অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি নিম্নরূপঃ (১) বহির্হিমালয় বা শিবালিক পর্বত (৬০০ মিঃ উচ্চ) ইহার দক্ষিণাংশ খাড়াই ঢালসম্পন্ন এবং উত্তরাংশে মৃদু ঢাল (২) অব-হিমালয় বা কেন্দ্রীয় শৈলশিরা (৩০০০ মিঃ উচ্চ)—ধওলাধর ও পিরপাঞ্জাল পর্বতের দিকে ইহার উচ্চতা বাড়িয়াছে। (৩) প্রধান হিমালয়-জাস্কার বা উত্তরাঞ্চল (৫০০০—৬০০০ মিঃ উচ্চ) ঃ পূর্ব সীমান্ত বরাবর হিমালয় পর্বত প্রসারিত এবং ইহা বিপাশা ও স্পিটির জলবিভাজিকা। জাস্কার পর্বতশ্রেণী পূর্ব সীমান্তে ভারত হইতে তিব্বতকে পৃথক করিতেছে। এই অঞ্চলের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শৃঙ্গ হইল: শীলা (৭০২৬ মিঃ), পারাং (৫৫৪৮ মিঃ), ধওলাধর (৪৫৫০ মিঃ) ইত্যাদি। (গ) **কুমায়ুন হিমালয়** ঃ এই অংশের পর্বতগুলি উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণপূর্ব দিকে প্রসারিত হইয়াছে। পর্বতের দক্ষিণ ঢাল খাড়াই এবং উত্তরাংশ অপেক্ষাকৃত মৃদু ঢালসম্পন্ন। এই অঞ্চলের পর্বতগুলির বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ (১) প্রধান হিমালয় (৪৮০০—৬০০০ মিঃ) পর্বত উত্তরে অবস্থিত এই পর্বতমালার কয়েকটি উচ্চ শৃঙ্গ হইল নন্দাদেবী (৭৮১৭ মিঃ), কামেত্ (৭৭৫৬ মিঃ), ত্রিশূল (৭১২০ মিঃ) ইত্যাদি। এই সকল উচ্চ পর্বত ভাগীরথী, ধওলাগঙ্গা, অলকানন্দা নদী দ্বারা পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া রহিয়াছে। (২) নিম্ন হিমালয় (১৫০০—২৭০০ মিঃ) ঃ সমগ্র অংশটি বৃহৎ পর্বতময় অঞ্চল, কতকগুলি গভীর উপত্যকা ইহাদিগকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। উপত্যকা পাদদেশের উচ্চতা গড়ে ৮৫০ মিঃ। (৩) শিবালিক (৭৫০—১২০০ মিঃ) ঃ ইহার দক্ষিণে উত্তর-পশ্চিম হইতে ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক বরাবর কতকগুলি সংকীর্ণ ও নিম্ন পর্বতশ্রেণী দেখা যায়। ইহাদের দক্ষিণে খাড়াই ঢাল এবং উত্তরে মৃদু ঢাল বলিয়া সেখানে বিখ্যাত 'দুন' উপত্যকার সৃষ্টি হইয়াছে।

পূর্বাঞ্চল ঃ হিমালয়ের পূর্বাঞ্চলের ভূপ্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অনুসন্ধান করা হয় নাই। এই অংশে হিমালয়ের উচ্চতাও অনেক কম এবং পর্বতগুলি প্রায় উত্তর-দক্ষিণে সমান্তরালভাবে বিস্তৃত। দার্জিলিং ও ভূটান হিমালয়ের (পশ্চিম) দক্ষিণাংশ দক্ষিণে তিস্তা উপত্যকার দিকে এবং ভূটান (পূর্ব) ও আসাম হিমালয়ের পশ্চিমাংশ দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার দিকে ঢালু হইয়াছে। (ক) সিকিম হিমালয় পশ্চিমে সিংগ্‌লীলা (৩৬৮৫ মি.) ও পূর্বে ডংখ্যা পর্বত দুইটি উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। ইহার উত্তর-পশ্চিম অংশে হিমালয়ের বিখ্যাত কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গ (৮৫৯৮ মি.) এবং দক্ষিণে দার্জিলিং সীমান্তে ফালুট শৃঙ্গ (৩৯৩৭ মি.) অবস্থিত। এই পার্বত্য অঞ্চলে তিস্তা নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। (খ) **দার্জিলিং হিমালয়ঃ**

এই অঞ্চলের পর্বতশৃঙ্গগুলি সমুদ্র সমতল হইতে উত্তরে খাড়াভাবে উঠিয়া গিয়াছে। এই পর্বতশ্রেণী ক্রমশঃ সিকিমের পার্বত্য অঞ্চলের সহিত মিশিয়াছে। দার্জিলিং-সিকিম সীমান্তে ফালুট এবং সান্দাকফু (৩৯৭৪ মি.) শৃঙ্গ এবং কার্শিয়াং অঞ্চলে মিরিক (১৮৫৫ মি.) শৃঙ্গ অবস্থিত। (গ) **ভুটান ও আসাম হিমালয়ঃ** এই অঞ্চলের পর্বতগুলি (পশ্চিম হইতে পূর্বে) ভুটানে (হিমালয়ের শাখা পর্বত) এবং আসামে (হিমালয়ের ডাফলা, মিকির অবর ও মিশমী পর্বত) উত্তর-দক্ষিণে প্রায় সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত। ইহারা উত্তরে ৭০০০ মি. হইতে দক্ষিণে ৩০০ মি. ঢাল বিশিষ্ট। হিমালয়ের পূর্ব আলোচিত বৈশিষ্ট্যগুলি এই অংশে দেখা যায় (যথাঃ (১) উচ্চ হিমালয় (৭০০০ মি.)ঃ তুষারাবৃত এই পর্বতাঞ্চল উত্তরের তিব্বত মালভূমি অঞ্চল হইতে পৃথক হইয়া রহিয়াছে। এই অঞ্চলের নদী উপত্যকাগুলি ৩০০০—৪০০০ মি উচ্চতায় অবস্থিত। (২) নিম্ন হিমালয়ঃ পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে প্রসারিত হইয়া এই অঞ্চলের পর্বতরাজি ক্রমশই দক্ষিণে বাঁকিয়া গিয়াছে। এই অংশে যে সকল নদী সমভূমি দেখা যায় তাহার মধ্যে লোহিত নদী সমভূমি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (৩) শিবালিক (৩০০ মি.) দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ১০—১৫ মি. উত্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অংশের পার্বত্য ঢাল খুব তীব্র বলিয়া নদীগুলিতে সহজেই বন্যা হয়।

নদ-নদীঃ এই পার্বত্য অঞ্চলের নদীগুলি দ্বারা বাহিত পলির সাহায্যে উত্তর ভারতের বিস্তৃত সমভূমি গঠিত হইয়াছে। (ক) কাশ্মীর হিমালয়ের নদীগুলির পশ্চিমমুখী প্রবাহ পাকিস্তানে গিয়াছে। এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য নদী হইল সিন্ধু—ইহা তিব্বতের মালভূমি ইহাতে উৎপন্ন হইয়া জাস্কার ও লাডাক পর্বতের মধ্যস্থল দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার দক্ষিণ তটে শায়ক (কারাকোরম ও লাডাক পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে), শিগর (উত্তর) ও গিলগিট উপনদী এবং বামতটে এ্যাক্টর, শিগর (দক্ষিণ), জাস্কার প্রভৃতি উপনদী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঝিলাম নদী কাশ্মীর উপত্যকায় পিরপাঞ্জালকে কাটিয়া পশ্চিম মুখে প্রবাহিত হইয়াছে। হিমালয়ের উচ্চ অংশে তুষারাবৃত স্থানে কয়েকটি হ্রদ আছে। (খ) হিমাচল হিমালয়ের নদীগুলির পশ্চিমমুখী প্রবাহ সিন্ধুর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সকল নদীই সিন্ধু ও গাঙ্গেয় উপত্যকার নদীসমূহে জলসরবরাহ করিতেছে। এই অঞ্চলের প্রধান নদী হইল চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, বিপাশা, শতদ্রু ও যমুনা। প্রধান হিমালয় ও পিরপাঞ্জালের মধ্যবর্তী স্থানে চন্দ্রভাগা নদী প্রবাহিত হইয়াছে। শতদ্রু নদী দক্ষিণ হিমাচলে প্রধান হিমালয় ও ধওলাধর পর্বতমালাকে কাটিয়া পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়াছে। (গ) কুমায়ুন হিমালয়ের অসংখ্য নদীগুলি পূর্ব হইতে পশ্চিমে তিনটি অববাহিকায় বিভক্ত ঃ (১) যমুনা অববাহিকার প্রধান নদীগুলি (টন ও যমুনা) দক্ষিণ-পশ্চিমে পাঞ্জাব সমভূমির দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। (২) গঙ্গা অববাহিকার নদীগুলি (ভাগীরথী ও ইহার উপনদী ভিলুগঙ্গা, অলকানন্দা ও ইহার উপনদী মন্দাকিনী। পিন্ডারী, বিষ্ণুগঙ্গা প্রভৃতি) দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া দেবপ্রয়াগের নিকটে গঙ্গা নামে পরিচিত হইয়াছে। (৩) কালী অববাহিকার নদীগুলি (গৌরী-গঙ্গা, রামগঙ্গা, সরযূ, কোশী) হিমাচল হিমালয়ের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে হিমালয়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণের গাঙ্গেয় সমভূমিতে সারদা নামে প্রবাহিত হইতেছে। পূর্ব হিমালয় অঞ্চলেও অসংখ্য নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। তন্মধ্যে (ঘ)

সিকিম হিমালয়ের তিস্তা নদী দক্ষিণে দার্জিলিংয়ের দিকে প্রবাহিত। (ঙ) দার্জিলিং হিমালয়ে ঐ তিস্তা নদীই ক্রমশই দক্ষিণে গাঙ্গেয় উপত্যকার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। (চ) ভুটান হিমালয়ের প্রধান নদীগুলি (তোর্সা, মানস, সংকোষ) দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র সমভূমির দিকে প্রবাহিত। (ছ) আসাম হিমালয়ের (নেফা) প্রধান নদীগুলিও (ডিহাং, কামলা, সুবর্নাগরি, ডিবাং) দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

জলবায়ুঃ ভূপ্রকৃতি এই অঞ্চলের জলবায়ুর উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। পশ্চিম হিমালয়ে সারা বৎসরই কম উত্তাপ এবং পূর্ব হিমালয়ে প্রায় সারা বৎসরই বৃষ্টিপাত এই অঞ্চলের জলবায়ুর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। পার্বত্য অঞ্চল বলিয়া শীত-গ্রীষ্ম সারা বৎসরই কম উত্তাপ অনুভূত হইলেও ভারতের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত যুক্ত স্থানগুলি কিন্তু এই অঞ্চলেই অবস্থিত। কাশ্মীর হিমালয়, হিমাচল হিমালয় ও কুমায়ুন হিমালয়ের সর্বোচ্চ অংশগুলি প্রায় সারা বৎসরই তুষারাচ্ছন্ন থাকে। পূর্ব হিমালয়েও কোন কোন স্থানে যথেষ্ট তুষারপাত হয়।

তাপমাত্রা ঃ শীতকালে কাশ্মীর হিমালয়ের উত্তাপ গড়ে ১০° সে.-এর কম থাকে এবং হিমাচল ও কুমায়ুন হিমালয়ের তাপমাত্রা গড়ে ১০°—১৫° সে পর্যন্ত (এই সময়ে হিমালয়ের পূর্বাঞ্চলে অপেক্ষাকৃত বেশী তাপমাত্রা (১৫°—১৮° সে.) অনুভূত হয়। গ্রীষ্মকালেও এই সকল স্থানে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা অনেক কম উত্তাপ থাকে। কারণ কাশ্মীর ও হিমাচল হিমালয়ে তখন গড়ে ৩০°—৩২° সে. এবং কুমায়ুন হিমালয় ও সমগ্র পূর্ব হিমালয়েই গড় তাপমাত্রা ২৭°—৩০° সে. পর্যন্ত অনুভূত হয়।

বৃষ্টিপাতঃ এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের বণ্টন বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কাশ্মীর হিমালয়ের উত্তর-পূর্ব অংশে (লাডাক) বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০ সে. মি.-এর কম এবং ইহা পর্বতগুলির অবস্থান বরাবর সমান্তরালভাবে বাড়িতে থাকে বলিয়া সমগ্র উত্তর-পূর্ব অংশে বৃষ্টিপাত মাত্র ২০°—৬০° সে. মি.। কাশ্মীর হিমালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে, হিমাচল ও কুমায়ুনে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়িতে (৬০°—২০০°সে.মি.) থাকে এবং কাংরা উপত্যকায় অধিক পরিমাণে (২০০—৩০০ সে.মি.) বৃষ্টিপাত হয়। পূর্ব হিমালয়ের ব্রহ্মপুত্র নদী উপত্যকায় সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত (প্রায় ৪০০ সে.মি.) হয় এবং উহা উত্তরের দিকে ক্রমাগত কমিতে (২০০—৪০০ সে.মি.) থাকে।

মৃত্তিকাঃ এই পার্বত্য অঞ্চলের অন্তর্গত দেশগুলির মৃত্তিকা সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত বিশেষ কোন তথ্য সংগৃহীত হয় নাই। জলবায়ুর প্রতিকূলতা এবং নিবিড় অরণ্যই ইহার একমাত্র কারণ। তবে সাধারণভাবে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত এই বিশাল ভূখণ্ডে পার্বত্য মৃত্তিকাই দেখা যায়। জলবায়ু ও ভূপ্রকৃতি এই অঞ্চলের মৃত্তিকাকে বিশেষরূপে প্রভাবিত করিয়াছে। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ইহাদিগকে নিম্নরূপ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ

(১) **হিমক্ষয়িত মৃত্তিকাঃ** হিমরেখার ঠিক নিম্নাঞ্চলে হিমবাহের গতিপথে কাঁকর ও বালুকা সঞ্চিত হইয়া এই মৃত্তিকার উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা অতিশয় উর্বর। কাশ্মীর হিমালয়ের লাডাক অঞ্চলের সমগ্র উত্তরে ও দক্ষিণের কিছু অংশে, কুমায়ুন হিমালয়ের ভাগীরথী অলকানন্দা নদীর উচ্চ অংশে এই মৃত্তিকা দেখা যায়। (২)

পার্বত্য মৃত্তিকাঃ উপরোক্ত অঞ্চলের দক্ষিণাংশে তুষারমুক্ত অংশে এই মৃত্তিকা দেখা যায়। কাশ্মীর হিমালয়ের নানা স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে, হিমাচল হিমালয়ের সমগ্র পশ্চিম ভাগে, এবং কুমায়ুন হিমালয়ের উত্তরের উচ্চ অংশে এই মৃত্তিকার বিশেষ প্রাধান্য। (পূর্ব হিমালয়ের এই জাতীয় মৃত্তিকায় জৈব পদার্থ একেবারেই নাই)। সাধারণভাবে এই মৃত্তিকা নানা প্রকার খনিজ ও জৈবগুণ সম্পন্ন বলিয়া বিশেষ উর্বর। (৩) **অরণ্য মৃত্তিকাঃ** উপরোক্ত অঞ্চলের দক্ষিণে কাশ্মীর হিমালয়ের লাডাক ও সমগ্র পশ্চিমাংশে কুমায়ুন হিমালয়ের ভাগীরথী-অলকানন্দা নদীর কোন কোন অংশে, হিমাচল হিমালয়ের মধ্যবর্তী স্থানে বিভিন্ন ধরনের অরণ্য মৃত্তিকা দেখা যায়। তন্মধ্যে কাশ্মীর ও কুমায়ুন হিমালয়ের ধূসর (পোড্জল) অরণ্য মৃত্তিকা, হিমাচল হিমালয়ের বাদামী অরণ্য মৃত্তিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মৃত্তিকা যথেষ্ট জৈব ও খনিজ গুণ-সম্পন্ন বলিয়া এখানে গভীর অরণ্য সৃষ্ট হইয়াছে। (৪) **পলি মৃত্তিকাঃ** উল্লিখিত পার্বত্য অঞ্চলের পাদদেশে স্বল্প উচ্চতা বিশিষ্ট স্থান পলি মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। কাশ্মীরের দক্ষিণে (জম্মু, কাঠুয়া, মীরপুর) শতদ্রু নদীর পলি, কুমায়ুন হিমালয়ের শিবালিক ও দুন অঞ্চলে গাঙ্গেয় পলি ও পূর্ব হিমালয়ের প্রায় সর্বত্রই লাল ধরনের (কাদা, বালি, দোঁয়াশ ইত্যাদি) ব্রহ্মপুত্র-নদীজাত-পলি দেখা যায়। এই মৃত্তিকা কৃষিকাজের পক্ষে বিশেষ অনুকূল।

স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জঃ জলবায়ু ও উচ্চতা এই অঞ্চলের উদ্ভিদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। উচ্চতার দিক হইতে এই অঞ্চলের উদ্ভিজ্জকে নিম্নরূপ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ (১) ১২০০ মিটারের নিম্নে এই অংশে সাধারণতঃ ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় উদ্ভিদ জন্মে। কুমায়ুন হিমালয়ের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে, হিমাচল হিমালয়ের পশ্চিমাংশে ও উত্তরাংশের কোন কোন স্থানে এই জাতীয় উদ্ভিদ দেখা যায়। শাল, হলুদ, খয়ের, শিশু, একপ্রকার পাইন প্রভৃতি এই অঞ্চলের প্রধান বৃক্ষ। (২) ১২০০—১৮০০ মিটার উচ্চেঃ এই অঞ্চল নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের উদ্ভিদ দ্বারা আবৃত। আসাম হিমালয়ের মধ্যবর্তী অংশে, কুমায়ুন হিমালয়ের মধ্যবর্তী অংশে এবং হিমাচল হিমালয়ের পশ্চিমাংশে ও উত্তরের কোন কোন স্থানে এই জাতীয় উদ্ভিদ দেখা যায়। এই অঞ্চলে চেসনাট, চেরী, পপ্লার প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। (৩) ১৮০০—৩০০০ মিটার উচ্চেঃ এই অংশে সাধারণতঃ সরলবর্গীয় বৃক্ষের বন দেখা যায়। আসাম হিমালয়ের উত্তরাংশে কুমায়ুন হিমালয়ের মধ্যবর্তী নদী-উপত্যকাসমূহে, কাশ্মীর হিমালয়ের পিরপাঞ্জালের উত্তরাংশ এই অরণ্য সম্পদে সমৃদ্ধ। এখানে ফার, দেওদার, সাইপ্রাস, বার্চ প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। (৪) ৩০০০—৪৫০০ মিটার উচ্চেঃ এই অঞ্চলে খয়রা, চেতুলা প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। কাশ্মীর হিমালয় ও কুমায়ুন হিমালয়ের উচ্চ অংশে তৃণভূমি ও শুষ্ক অঞ্চলের উদ্ভিদ দেখা যায়।

সাংস্কৃতিক ও আর্থিক পরিচয়

এই বিচিত্র প্রাকৃতিক পটভূমিতে পশ্চিম ও পূর্ব হিমালয়ের অন্তর্গত অঞ্চল-গুলি বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক ও আর্থিক বৈশিষ্ট্য লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল সাংস্কৃতিক ও আর্থিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সাদৃশ্য যতখানি, বৈসাদৃশ্যও কোন অংশে কম নয়। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত এই সকল রাজ্যের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে জানিবার জন্য কাশ্মীর, হিমাচল, কুমায়ুন, সিকিম, দার্জিলিং, ভুটান ও নেফা (আসাম) হিমালয়ের আলোচনা পৃথকভাবে করা প্রয়োজন।

কাশ্মীর হিমালয়

৩. সাংস্কৃতিক পরিচয়

জনসংখ্যা ঃ কাশ্মীর হিমালয়ের ২২২৮০০০ বর্গ কিলোমিটার পরিমিত এলাকায় প্রায় ৪.৪ মিলিয়ন লোক বাস করে। সুতরাং এখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে মাত্র ২০ জন লোকের বসবাস। পার্বত্য অঞ্চল বলিয়া এখানে লোক সংখ্যা খুবই অল্প, সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ কাশ্মীর উপত্যকায় বাস করে। অনন্তনাগ, শ্রীনগর, বরামুলা প্রভৃতি জেলায় সর্বাধিক এবং লাডাক অঞ্চলে সর্বনিম্ন জনসংখ্যা দেখা যায়।

জন-সংস্কৃতি ঃ এখানে বহু বিচিত্র সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। পিরপাঞ্জালের দক্ষিণ হইতে পাঞ্জাব সমভূমি পর্যন্ত অংশে ডোগরা জাতি এবং পুঞ্চ, উধমপুর
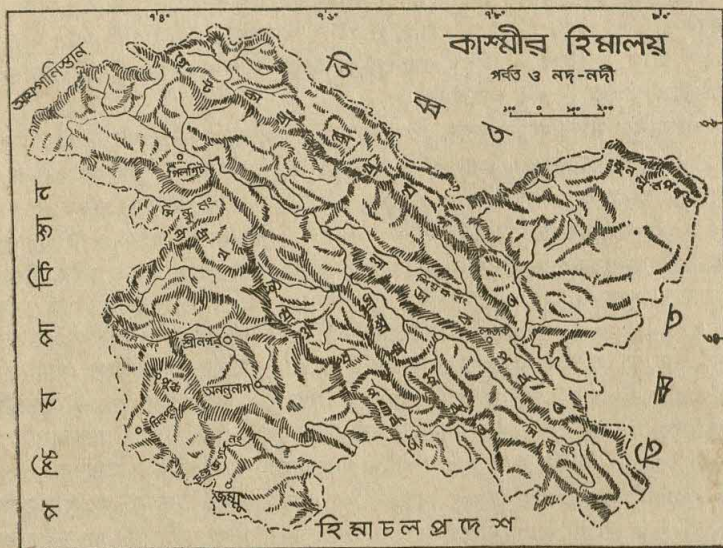
প্রভৃতি অঞ্চলে অর্ধ-যাযাবর গুজ্জর ও গদ্দি জাতি বাস করে। কাশ্মীর উপত্যকার অধিবাসীরা কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। এতদ্ব্যতীত হানজি, গিলগিট অঞ্চলে বল্টি এবং লাডাক অঞ্চলে লাডাকীগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমগ্র জনসংখ্যার মাত্র ২০ শতাংশ শিক্ষিত। তবে শহরাঞ্চলে ইহার হার কিছুটা বেশী (৪২ শতাংশ)। শ্রীনগরে প্রচুর শিক্ষিত লোক বাস করেন। এখানে জম্মু অঞ্চলে হিন্দু, লাডাক অঞ্চলে বৌদ্ধ এবং গিলগিট, পুঞ্চ, বালুচিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলে ইসলাম ধর্মীয় লোক বাস করে। এই সকল অধিবাসীরা প্রায় ৪০ শতাংশ কৃষিকাজ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। কুটির শিল্পে মাত্র ৬ শতাংশ লোক নিযুক্ত আছে। এতদ্ব্যতীত ভ্রমণবিলাসীদের জন্য এখানে হোটেল ব্যবসা যথেষ্ট উন্নত হইয়াছে।

গ্রাম ও শহরঃ সমগ্র জনসংখ্যার ৮৩ শতাংশ এই অঞ্চলের ৬৫৫৯টি গ্রামে বাস করে। প্রতিকূল ভূপ্রকৃতির জন্য গ্রামগুলি আয়তনে বৃহৎ হইলেও লোকসংখ্যা তদনুযায়ী নয়। উপত্যকা অঞ্চলের গ্রামগুলি অপেক্ষাকৃত ঘনবদ্ধ। অবশিষ্ট ১৭ শতাংশ লোক শহরাঞ্চলের অধিবাসী। জম্মু ও উপত্যকা অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া শহরগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শহরের গুরুত্ব নিম্নরূপঃ (১) বিভিন্ন সড়কপথ ও গো-যান পথের সংযোগস্থলে লেহ, স্করদু, কিষ্টোয়ার প্রভৃতি শহরগুলি মূলতঃ বাণিজ্য কেন্দ্র। (২) শ্রীনগর অতি প্রাচীন শহর এবং বর্তমানে রাজধানী। প্রশাসনিক কেন্দ্ররূপে জম্মুও বিশেষ প্রসিদ্ধ। (৩) গুলমার্গ, পহলগাঁও প্রভৃতি অঞ্চল ভ্রমণবিলাসীদের জন্য শহর হইয়া উঠিয়াছে। (৪) সড়কপথের সম্প্রসারণ ও পরিবর্ধনের জন্য উরি, বরামুলা, মিরপুর প্রভৃতি উন্নত হইয়াছে। (৫) পাঠানকোট-জম্মু-শ্রীনগর-লেহ জাতীয় সড়কপথের উন্নতির ফলে জম্মু, উধমপুর, বানিহাল, থাম্পোর প্রভৃতি শহর সমৃদ্ধ হইয়াছে।

প্রধান শহরঃ শ্রীনগর (২৯৫০৮৪) ঝিলাম নদী ও ডাল হ্রদের তীরে কাশ্মীর উপত্যকায় এই শহর অবস্থিত। ইহা কাশ্মীরের রাজধানী এবং পশম, রেশম, কাশ্মীরী শাল, সৌখীন দ্রব্য, নকল গহনা প্রভৃতি নানাবিধ শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। বাণিজ্য কেন্দ্র, স্বাস্থ্য নিবাস ও পর্যটন স্থান রূপেও ইহা গুরুত্বপূর্ণ। **জম্মু** (১০২৭৩৮)**ঃ** পিরপাঞ্জালের দক্ষিণে অবস্থিত এই শহরটি এই অঞ্চলের শীতকালীন রাজধানী। সমগ্র কাশ্মীরের শুধুমাত্র এই অঞ্চলেই রেলপথ প্রসারিত হইয়াছে। ইহা একটি বাণিজ্য কেন্দ্র। **বরামুলা** (১৯৮৫৪)ঃ শ্রীনগরের পশ্চিমে অবস্থিত। লিগনাইট কয়লা ও লবণের জন্য উল্লেখযোগ্য। এখানে একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে। **অনন্তনাগ** (২১০৮৭) ঃ শ্রীনগরের দক্ষিণে অবস্থিত এই শহরটি কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ইহা ক্রমেই উন্নতি করিতেছে। **লেহঃ** উত্তরদিকে সিন্ধু নদীর তীরে অবস্থিত লাডাকের একমাত্র শহর। ইহা ভারতের সর্বোচ্চ শহর। এখানে একটি গিরিপথ আছে। ইহা চীনের সহিত এদেশের স্থলপথে বাণিজ্যের যোগাযোগ কেন্দ্র।

৪. আর্থিক পরিচয়

কৃষিজ সম্পদঃ সমগ্র ভূভাগের মাত্র ২৩ শতাংশ কৃষিকাজের উপযোগী। এখানে মূলতঃ নানাবিধ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। একর প্রতি উৎপাদন খুবই কম। এই অঞ্চলে নিম্নলিখিত শস্য উৎপন্ন হয়ঃ **ধানঃ** ধান এই অঞ্চলের সর্বপ্রধান কৃষি উৎপাদন। অনন্তনাগ জেলায় সর্বাধিক ধান চাষ হয়। উপত্যকার পাদদেশ ভূমিতেও ইহা উৎপন্ন হয়। **ভুট্টাঃ** বরামুলা, পুঞ্চ, অনন্তনাগ, ডোডা প্রভৃতি অঞ্চলে ইহা প্রচুর পরিমাণে চাষ হয়। উপত্যকার ঢালু অংশে ইহার উৎপাদন প্রায় সীমাবদ্ধ। **জোয়ার-বাজরা-রাগী** ঃ সমগ্র জম্মু অঞ্চলে রাগী এবং লাডাক অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জোয়ার ও বাজরা উৎপন্ন হয়। **গমঃ** গম উৎপাদনে জম্মুর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তবে কাঠুয়া, উধমপুর, পুঞ্চ প্রভৃতি অঞ্চলেও ইহার চাষ হয়। **ফলঃ** কাশ্মীর উপত্যকা আপেল উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। এই অঞ্চলে নানাবিধ ফল জন্মিয়া থাকে।

সেচ-ব্যবস্থাঃ জলবায়ুর প্রতিকূলতা ও সেচ ব্যবস্থার অসমবণ্টন কৃষিকাজের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক নয়। তুষারপাতের জন্য কৃষিকাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়। বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন খালের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে সেচ ব্যবস্থা সুরু হইয়াছে।

পশুচারণঃ এই অঞ্চলে দুইটি পশুচারণ সম্প্রদায় দেখা যায়। গুজ্জরগণ জম্মুর অধিবাসী, ইহারা পশুপালনের জন্য গ্রীষ্মকালে পার্বত্য অঞ্চলে চলিয়া যায় এবং শীতকালে নামিয়া আসে। তবে শীতের সময়ের জন্য যথেষ্ট পশুখাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখে। ইহারা মূলতঃ মহিষ পালন করে। গাদ্দ সম্প্রদায় পশুখাদ্যের জন্য হিমাচল অঞ্চল পর্যন্ত যায়। ইহারা গরু ও মহিষ পালন করে।

খনিজ-সম্পদঃ এই অঞ্চলের খনিজ সম্পদ খুবই সীমিত এবং অধিকাংশ দ্রব্যই এখনও পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত। এই সকল খনিজ এই অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিমে কাশ্মীর ও জম্মু এলাকায় সীমাবদ্ধ। **কয়লাঃ** জম্মুর চীনাকাল, চকর, মহাগোলা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর কয়লা সঞ্চিত আছে। এই কয়লা মধ্যম শ্রেণীর। কাশ্মীর উপত্যকার চৌকিবল, তনমার্গ, বরামুলা, বুন্দোয়ারা প্রভৃতি অঞ্চলে লিগনাইট জাতীয় কয়লা পাওয়া যায়। **চুনাপাথরঃ** কাশ্মীরের খুনমুহ্ এবং জম্মুর বাসোলিতে চুনাপাথর পাওয়া যায়। কাশ্মীরের অনন্তনাগ, অচবল, ভেরীনাগ, বন্দীপুর প্রভৃতি অঞ্চলগুলিও উল্লেখযোগ্য। **গন্ধকঃ** অনন্তনাগ, সদরকোট, উইয়ান এবং লাডাকের প্রস্রবণ হইতে প্রচুর পরিমাণে গন্ধক উৎপন্ন হয়। এখানে প্রচুর গন্ধক সঞ্চিত আছে। **লৌহঃ** জম্মুর অন্তর্গত খাণ্ডলি ও মতব, কাশ্মীরের আউনি, খুদু অঞ্চলে লৌহ পাওয়া যায়, তবে লৌহ আকরে লৌহের পরিমাণ কম। **বিবিধঃ** এই সকল খনিজ ভিন্ন বিভিন্ন অঞ্চলে জিপসাম, বক্সাইট, তামা, দস্তা, রৌপ্য, স্বর্ণ, মূল্যবান প্রস্তর প্রভৃতি পাওয়া যায়।

শিল্পজ সম্পদঃ শিল্প সম্পদে এই অঞ্চল তেমন উন্নত নহে। শিল্পে নিযুক্ত সমগ্র কর্মীর তিন-চতুর্থাংশই নানাবিধ কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। খনি সংক্রান্ত শিল্পে কিছু লোক নিযুক্ত আছে। কাশ্মীর উপত্যকার শিল্পকুশলতা বহু দিনের প্রসিদ্ধ। এই অঞ্চলের সেলাইয়ের সূক্ষ্মকাজ, কাগজমণ্ড শিল্প, পশমী কার্পেট, নকল গহনা, কাঠের সৌখীন আসবাব প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অন্যান্য শিল্পঃ এখানে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে মোট ২৮টি বৃহদায়তন শিল্প আছে। এগুলি অধিকাংশই জম্মু ও শ্রীনগর অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত। এই সকল শিল্পগুলি সাধারণভাবে কৃষি, অরণ্য, পশুচারণ, খনিজ ও কারিগরী ভিত্তিক। ইহাদের মধ্যে শ্রীনগরের পশম শিল্প, বরামুলার দেশলাই শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে একটি ঔষধ নির্মাণ কেন্দ্র আছে। শ্রীনগর, সুলিনা, হাওয়াল, ডাল প্রভৃতি অঞ্চলে রেশমী বস্ত্র নির্মাণ কেন্দ্র, অনন্তনাগে সিমেণ্ট শিল্প ও বরামুলায় কারিগরী শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এই অঞ্চলে দুইটি তাপ উৎপাদন কেন্দ্র আছে। মোহ্রা তাপকেন্দ্রটি শ্রীনগরের ধানকল, ময়দাকল, রেশমী বস্ত্র প্রভৃতি শিল্পে তাপ সরবরাহ করে। সিন্ধু উপত্যকার জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি পর্যটন শিল্প ও পহলগামের কুটিরশিল্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে।

পর্যটন শিল্প ঃ কাশ্মীরের গুলমার্গ, পহলগাম, সোনামার্গ, উলার, ডাল হ্রদ প্রভৃতির অনুপম সৌন্দর্য দর্শন করিবার জন্য প্রতি বৎসর মার্চ হইতে অক্টোবর মাসে এখানে বিদেশ হইতে বহু পর্যটক আসিয়া থাকেন। ইহাদের চাহিদা পূরণের জন্য এখানে পর্যটন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

যোগাযোগ-ব্যবস্থাঃ সড়কপথ ব্যতীত এখানে কোন প্রকার যোগাযোগ-ব্যবস্থাই তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। দক্ষিণ-পশ্চিমে কাঠুয়া হইতে জম্মু পর্যন্ত রেলপথ এবং

উপত্যকা অঞ্চলে আভ্যন্তরীণ জলপথ (ঝিলাম নদীর বরামুলা পর্যন্ত নাব্য) চালু আছে। জম্মু ও শ্রীনগর হইতে সরকারী কর্মীদের জন্য বিমানপথের ব্যবস্থা আছে। এতদ্ব্যতীত বর্তমানে কেবলমাত্র দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে পাঠানকোট-কাঠুয়া-জম্মু-বানিহাল-অনন্তনাগ-শ্রীনগর-বরামুলা-উরি জাতীয় সড়ক (১এ) শ্রীনগর-সোনমার্গ-কারগিল-লাডাক জাতীয় সড়ক দুইটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কাশ্মীর উপত্যকার মীরপুর, পুঞ্চ, বরামুলা, মুজাফরাবাদ প্রভৃতি অঞ্চল সড়কপথ দ্বারা যুক্ত হইলেও সমগ্র উত্তরপূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে। লাডাকের পূর্বাংশে এবং কাশ্মীরের উত্তরাংশে অনেকগুলি অনুন্নত পথ আছে। উত্তর সীমান্তের খুনজেরাব, পারপিক, কারাটাঘ গিরিপথ দ্বারা চীনে, পূর্বের লানাক্‌লা কোনেলা, চাংলা গিরিপথ দ্বারা তিব্বতে, দক্ষিণে চারদিংলা, বাকালাচালা গিরিপথ দ্বারা হিমাচল প্রদেশে আসিবার পথ আছে। 'জহর টানেল' নামক সুড়ঙ্গ নির্মাণের ফলে এই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থায় যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে।

হিমাচল হিমালয়

৩. সাংস্কৃতিক পরিচয়

জনসংখ্যাঃ হিমাচল অঞ্চলের ৫৬০১৯৩ বর্গ কিলোমিটার পরিচিত এলাকায় ২৮১২৪৬৩ লোকের বাস। সুতরাং এখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে গড়ে ৫০ জন। উপত্যকা ও পর্বতের নিম্নাংশেই এই জনসংখ্যা কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। প্রতিকূল জলবায়ু ও ভূপ্রকৃতির জন্য সর্বত্রই জনসংখ্যা অল্প, তবে সাধারণভাবে কাংরা ও শতদ্রু নদী উপত্যকায় নানাপ্রকার সুবিধার জন্য অধিক সংখ্যক লোক বাস করে।

জনসংস্কৃতি ঃ অসংখ্য পার্বত্য আদিবাসী এই অঞ্চলে বাস করে, ইহারা সাধারণভাবে 'ডগরা' নামে পরিচিত। ইহাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য অন্যান্য অঞ্চল হইতে বিশেষরূপে পৃথক। 'হিমাচলীরা' শান্তিপ্রিয় ও কর্মঠ জাতি। সমগ্র অধিবাসীর মাত্র ২১ শতাংশ শিক্ষিত। চাম্বা, কুলু, লাহুল প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসীরা এখনও বিশেষ অনুন্নত। সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় অর্ধাংশ বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত আছে। কৃষিকাজ ব্যতীত অরণ্য, মৎস্য শিকার, পশু শিকার খনির কাজ প্রভৃতি দ্বারা ইহারা জীবিকা নির্বাহ করে। নানাপ্রকার ক্ষুদ্রশিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যে মাত্র ৭ শতাংশ কর্মী নিযুক্ত আছে।

গ্রাম ও শহরঃ সমগ্র অধিবাসীর ৯৪ শতাংশ এই অঞ্চলের ১২৬৯০টি গ্রামে এবং অবশিষ্টাংশ ২৯টি ক্ষুদ্র-বৃহৎ শহরে বাস করে। নিম্নে এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য শহরগুলির বিবরণ দেওয়া হইলঃ (১) জেলা অথবা থানার কেন্দ্র বা পূর্বতন দেশীয় রাজ্যগুলি বর্তমানে শহর হইয়া উঠিয়াছে। (২) কসৌলী, দাগসাই, সোলান প্রভৃতি ক্যান্টনমেণ্ট শহররূপে পরিচিত। (৩) সিমলা, কাংরা, ডালহৌসী প্রভৃতি হিলষ্টেশন রূপে বিখ্যাত, (৪) নইনাদেবী, পোয়াণ্টা প্রভৃতি ধর্মীয় কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিয়াছে, (৫) যোগাযোগের কেন্দ্ররূপে পাঠানকোট, কুলু, কালকা-সিমলা ও হিন্দুস্থান-তিব্বত সড়ক পথের কতকগুলি অঞ্চল শহর হইয়া উঠিয়াছে। (৬) বিতস্তার তীরে চাম্বা, বিপাশার তীরে কুলু ও মাণ্ডী, শতদ্রুর তীরে রামপুর ও বিলাসপুর নদীর জন্যই বর্ধিত হইয়াছে।

প্রধান শহরঃ সিমলা (৪২৫৯৭)ঃ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২২০৫ মিটার উচ্চে অবস্থিত হিমাচল প্রদেশের প্রধান শহর ও রাজধানী। প্রতি বৎসর এই শৈল শহরে বহু পর্যটক আসে। এখানে কোন প্রধান শিল্প না থাকিলেও ব্যবসা-কেন্দ্ররূপে ইহার বিশেষ গুরুত্ব আছে। কাংরা ঃ সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ৭১২ মিটার উচ্চে কাংরা উপত্যকায় এই শহরটি অবস্থিত। এই অঞ্চলের স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রস্তর প্রভৃতি শিল্প এবং কাংরা চিত্রশৈলী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পার্বত্য শহর রূপে ইহার খ্যাতি আছে।

৪. আর্থিক পরিচয়

কৃষিজ সম্পদঃ কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ এখানে খুবই কম। গম এই অঞ্চলের প্রধান কৃষিজ সম্পদ হইলেও ইহার উৎপাদন খুবই কম, ইহার পরেই ভুট্টার স্থান। **গমঃ** ইহা কাংরা, মাণ্ডি, কুলু, মহাসু প্রভৃতি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় চাষ

করা হয়। লাহুল, চাম্বা, বিলাসপুর প্রভৃতি স্থানে অন্য শস্যের সহিত ইহা উৎপাদিত হয়। **ভুট্টা** ঃ চাম্বা, বিলাসপুর, সিমলা অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে ভুট্টা উৎপন্ন হয় তবে কাংরা, সিরমুর, পদ্মা প্রভৃতি অঞ্চলে ইহা অল্প পরিমাণে জন্মে। **বার্লি** ঃ ইহা প্রধানতঃ লাহুল অঞ্চলের ফসল হইলেও কিন্নায়ুর, কুলু ও চাম্বা অঞ্চলে অন্যান্য শস্যের সহিতও উৎপন্ন হয়। **বিবিধ শস্য** ঃ এতদ্ব্যতীত কিন্নায়ুর ও মহাসু জেলায় জোয়ার, কাংরা, মাণ্ডি ও সিরমুর অঞ্চলে ধান এবং বিলাসপুর জেলায় নানাবিধ ডাল উৎপন্ন হয়। **ফলঃ** মহাসু ও কুলু উপত্যকায় আপেল, সিমলা, কাংরা ও মাণ্ডি অঞ্চলে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের ফল, সিরমুর, মাণ্ডি ও কাংরা উপত্যকায় নানাবিধ অম্লফল উৎপন্ন হয়।

র্বত্য
ালন
করা
লতঃ

মধ্যে
াদের
ানের
াণী
লনঃ
ইতে
বরফ
কার

নও
ব্যের
লের
ওলে
থন্ট
যরঃ
াথর
এবং
নন
ল্ট,

এই
াপ
ও
রে
প,
প,

প্রধান শহরঃ সিমলা (৪২৫৯৭)ঃ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২২০৫ মিটার উচ্চে অবস্থিত হিমাচল প্রদেশের প্রধান শহর ও রাজধানী। প্রতি বৎসর এই শৈল শহরে বহু পর্যটক আসে। এখানে কোন প্রধান শিল্প না থাকিলেও ব্যবসা-কেন্দ্ররূপে ইহার বিশেষ গুরুত্ব আছে। কাংরা ঃ সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ৭১২ মিটার উচ্চে কাংরা উপত্যকায় এই শহরটি অবস্থিত। এই অঞ্চলের স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রস্তর প্রভৃতি শিল্প এবং কাংরা চিত্রশৈলী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পার্বত্য শহর রূপে ইহার খ্যাতি আছে।

৪. আর্থিক পরিচয়

কৃষিজ সম্পদঃ কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ এখানে খুবই কম। গম এই অঞ্চলের প্রধান কৃষিজ সম্পদ হইলেও ইহার উৎপাদন খুবই কম, ইহার পরেই ভুট্টার স্থান। **গমঃ** ইহা কাংরা, মাণ্ডি, কুলু, মহাসু প্রভৃতি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় চাষ

করা হয়। লাহুল, চাম্বা, বিলাসপুর প্রভৃতি স্থানে অন্য শস্যের সহিত ইহা উৎপাদিত হয়। **ভুট্টা ঃ** চাম্বা, বিলাসপুর, সিমলা অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে ভুট্টা উৎপন্ন হয় তবে কাংরা, সিরমুর, পম্মা প্রভৃতি অঞ্চলে ইহা অল্প পরিমাণে জন্মে। **বার্লি ঃ** ইহা প্রধানতঃ লাহুল অঞ্চলের ফসল হইলেও কিন্নায়ুর, কুলু ও চাম্বা অঞ্চলে অন্যান্য শস্যের সহিতও উৎপন্ন হয়। **বিবিধ শস্য ঃ** এতদ্ব্যতীত কিন্নায়ুর ও মহাসু জেলায় জোয়ার, কাংরা, মাণ্ডি ও সিরমুর অঞ্চলে ধান এবং বিলাসপুর জেলায় নানাবিধ ডাল উৎপন্ন হয়। **ফলঃ** মহাসু ও কুলু উপত্যকায় আপেল, সিমলা, কাংরা ও মাণ্ডি অঞ্চলে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের ফল, সিরমুর, মাণ্ডি ও কাংরা উপত্যকায় নানাবিধ অম্লফল উৎপন্ন হয়।

ভারত
(রাজনৈতিক)
০ ৩০০ ৬০০
কিলোমিটার
চীন
তিব্বত
লাসা
সাংপো
মানস সরোবর
হিমাচল প্রদেশ
সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র
আফগানিস্তান
কাবুল
ইসলামাবাদ
পাকিস্তান
করাচি
গিলগিট
জম্মু ও কাশ্মীর
শ্রীনগর
জম্মু
সিমলা
চণ্ডীগড়
দেরাদুন
আলমোড়া
নৈনীতাল
দিল্লী
মীরাট
বিকানীর
রাজস্থান
জয়পুর
যোধপুর
আজমীর
আবু
বেরিলি
মথুরা
আগ্রা
লক্ষ্ণৌ
গোরক্ষপুর
কানপুর
এলাহাবাদ
বারাণসী
গোয়ালিয়র
ঝান্সি
উত্তর প্রদেশ
কাঠমাণ্ডু
নেপাল
সিকিম
গ্যাংটক
দার্জিলিং
ভুটান
গোহাটী
কোহিমা
নাগাল্যাণ্ড
ইম্ফল
মণিপুর
আগরতলা
ঢাকা
আইজল
মিজোরাম
কর্কটক্রান্তি
ব্রহ্মদেশ
রেঙ্গুন
পাটনা
গয়া
বিহার
রাঁচি
আসানসোল
জামসেদপুর
হাওড়া
কলিকাতা
চট্টগ্রাম
কটক
পুরী
কটনি
ভুপাল
জব্বলপুর
মধ্যপ্রদেশ
ইন্দোর
নর্মদা
বিলাসপুর
রায়পুর
ভিলাই
নাগপুর
ভুজ
কান্দলা
আমেদাবাদ
রাজকোট
ভবনগর
দ্বারকা
পোরবন্দর
দিউ
দমন
দাদরাও নগরহাভেলি
বোম্বাই
নাসিক
ঔরঙ্গাবাদ
পুনা
শোলাপুর
কোলাপুর
পানজিম
গোয়া
গোদাবরী
ওয়ারাঙ্গেল
হায়দরাবাদ
বিজয়ওয়াদা
রাজমহেন্দ্রী
কাকিনাড়া
বিশাখাপত্তনম
রায়পুর
গুন্টুর
অন্ধ্র
নেলোর
সিমোগা
বাঙ্গালোর
মহীশূর
ম্যাঙ্গালোর
মাদ্রাজ
পণ্ডিচেরী
সালেম
তাঞ্জোর
কেরালা
কোজিকোদে
কোচিন
মাদুরাই
ত্রিবান্দ্রম
কুমারিকা অঃ
মান্নার উঃ সাঃ
শ্রীলঙ্কা
কলম্বো
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
লাক্ষা ও আমিনদিভি দ্বীঃ পুঃ (ভারত)
মিনিকয় (ভারত)
মাল দ্বীপপুঞ্জ (ল.স্ত্রা)
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ (ভারত)
পোর্টব্লেয়ার
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ (ভারত)
আন্দালাস (সুমাত্রা)
১ মেঘালয়
২ ত্রিপুরা
৮০°
৮৮°
৭২°
৩২°
২৪°
১৬°
৮°

সেচ-ব্যবস্থা ঃ এই অঞ্চলের সেচকার্য খাল দ্বারা সম্পন্ন হয়। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলে সেচ খালের রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল বলিয়া বর্তমানে জল উত্তোলন পদ্ধতির প্রচলন হইতেছে। সমগ্র কৃষি-জমির ১০.৫ শতাংশ জমিতে জলসেচ করা সম্ভব হইয়াছে। লাহুল ও স্পিটি এলাকার শুষ্ক অঞ্চলে কৃষি ব্যবস্থা মূলতঃ সেচ-নির্ভর।

প্রাণীজ সম্পদ ঃ পশুপালন ঃ এই অঞ্চলে নানাবিধ পশুপালন করা হয়, তন্মধ্যে গরু-মহিষই প্রধান। ইহার পরেই মেষের স্থান। পশু খাদ্য সংকটের জন্য ইহাদের প্রতিপালন করা রীতিমত কষ্টসাধ্য। সংখ্যায় অনেক হইলেও ইহাদের দুগ্ধদানের ক্ষমতা অনুল্লেখ্য। এতদ্ব্যতীত ছাগল, ঘোড়া, গাধা, শূকর প্রভৃতি প্রাণী কৃষিকাজ, পরিবহণ ও দুগ্ধ প্রভৃতির জন্য প্রতিপালন করা হয়। **মৎস্য পালন** ঃ হিমাচল প্রদেশের দুইটি স্থানে মৎস্য পালন করা হয়। দক্ষিণে পাঠানকোট হইতে উত্তর প্রদেশের দেরাদুন পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল এবং ১৫০০ মিটার ঊর্ধ্বে বরফ গলা নাব্য নদীর জলে মৎস্য চাষ করা হয়। এই শিল্পের উন্নতির জন্য সরকার সাহায্য করিতেছেন।

খনিজ সম্পদ ঃ এই অঞ্চল নানাপ্রকার খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তেমন কিছুই অনুসন্ধান করা হয় নাই। এ পর্যন্ত যে সকল খনিজ দ্রব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহা নিম্নে উল্লেখিত হইল। **খনিজ লবণ** ঃ এই অঞ্চলের মাণ্ডি ভারতের একমাত্র খনিজ লবণের কেন্দ্র। উৎপাদনের অধিকাংশই নানা অঞ্চলে রপ্তানী করা হয়। **শ্লেট পাথর** ঃ চাম্বা, কাংরা, মাণ্ডি প্রভৃতি অঞ্চলে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। ঘরের ছাদ নির্মাণের জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। **চূণাপাথর** ঃ সিরমুর অঞ্চলে সর্বাধিক পরিমাণে এবং কাংরা ও বিলাসপুর অঞ্চলেও চূণাপাথর পাওয়া যায়। **জিপসাম** ঃ এই অঞ্চলের জিপসাম অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর। লাহুল অঞ্চলে জিপসামের বৃহত্তম খনিটি অবস্থিত। **তৈল ও গ্যাস** ঃ কাংরা এবং হোসিয়ারপুর অঞ্চলে খনিজ তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের জন্য কয়েকটি কূপ খনন করা হইয়াছে। ইহার উৎপাদন এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। **বিবিধ** ঃ সিরমুরে ব্যারাইট ; মাণ্ডি ও কাংরায় লৌহ এবং নানাস্থানে এ্যাণ্টিমণি, এ্যাসবেস্টস, কোবাল্ট, নিকেল তামা, চীনামাটি ইত্যাদি পাওয়া যায়।

শিল্পজ সম্পদ ঃ তাপ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন ঃ (ক) গিরি নদীতে বাঁধ দিয়া এই প্রকল্পের কাজ শেষ হইলে এখান হইতে ০.২০১ মিলিয়ান কিলোওয়াট তাপ উৎপাদন হইবে। (খ) মধ্য হিমাচলের উল নদী প্রকল্পের কাজ শেষ হইলে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে সম্মিলিতভাবে ১০৮ মেগাওয়াট তাপ উৎপন্ন হইবে। **কৃষি-ভিত্তিক শিল্প** ঃ কসৌলিতে শস্য সংক্রান্ত শিল্প, কাংরা জেলার কাংরা ও পালামপুরে চা-সংক্রান্ত শিল্প, ডালহৌসী, চাম্বা ও কুলু উপত্যকায় শাল-পশম সংক্রান্ত শিল্প, নাহান জেলায় চিনি, মাণ্ডি, কুলু ও কাংরায় ফল সংরক্ষণ, মোলানে বস্ত্রবয়ন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। **অরণ্য-ভিত্তিক শিল্প** ঃ চাম্বা অঞ্চলে কাষ্ঠ শিল্প, সেওনি ও নাহান অঞ্চলে রজন ও তার্পিন তৈল। মাণ্ডি, যোগীন্দর নগর, সিমলা প্রভৃতি অঞ্চলে আয়ুর্বেদীয় ঔষধ নির্মাণ শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **কারিগরী শিল্প** ঃ নাহান, পাওনটা অঞ্চলে বাসনপত্র ও মাণ্ডিতে বন্দুক নির্মাণ, সিমলা, মাণ্ডি প্রভৃতি অঞ্চলে মোটর মেরামত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। **পর্যটন শিল্প** ঃ কুলু, মাণ্ডি, মানালি, যোগীন্দর নগর, পালামপুর, কাংরা, ডালহৌসী, চাম্বা, সিমলা, নলদেরা, টাটাপানি,

ছেরাব্রা, কুফ্রী, নারকান্ডা সোলান এবং নাহান, রায়নুকা অঞ্চলগুলি পর্যটন শিল্পের জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ প্রতিকূল ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু ইত্যাদি নানা কারণে এই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ। বর্তমানে এই রাজ্যের দক্ষিণে কালকা-সিমলা রেলপথ এবং পশ্চিমে পাঠানকোট, কাংরা, যোগীন্দর নগর রেলপথ প্রসারিত হইয়াছে। জাতীয় সড়ক ২২ এই অঞ্চলের দক্ষিণ হইতে পূর্ব সীমান্ত (সোলান-সিমলা-রামপুর-কলপা-পুহ্) পর্যন্ত বিস্তৃত। এতদ্ব্যতীত সিমলা, বিলাসপুর, ভাকরা, মান্ডি, দৌলতপুর, ডালহৌসী প্রভৃতি শহরগুলি সড়কপথ দ্বারা যুক্ত। কুলু হইতে দিল্লী ও চন্ডীগড়ে যাইবার বিমান পথের ব্যবস্থা আছে।

কুমায়ুন হিমালয়

৩। সাংস্কৃতিক পরিচয়

জনসংখ্যাঃ উত্তর প্রদেশের হিমালয় অঞ্চলটি কুমায়ুন হিমালয় নামে পরিচিত। এই এলাকার ৪৬৪৮৫ বর্গ কিলোমিটার ভূখণ্ডে প্রায় ২.৭ মিলিয়ন লোক বাস করে। সুতরাং এখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৫৮ জন। মধ্য-

ভাগের ভাগীরথী, অলকানন্দা, যমুনা, রামগঙ্গা, কোশী প্রভৃতি নদী উপত্যকায় সর্বাধিক সংখ্যক জনপদ গঠিত হইয়াছে। উত্তরাংশের প্রতিকূল জলবায়ু ও অরণ্যের জন্য ভাটওয়ারি, যোশীমঠ প্রভৃতি অঞ্চলে তেমন জনসংখ্যা দেখা যায় না।

জনসংস্কৃতিঃ এই পার্বত্য অঞ্চলে ভোটিয়া, গাড়োয়াল প্রভৃতি পার্বত্য উপজাতি বাস করে। ইহাদের শতকরা ৬১ জন বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত আছে। প্রায়

সকলেই কৃষি-সংক্রান্ত কাজ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। কুটির শিল্প দ্বারা খুব অল্প লোকের অন্ন সংস্থান হয়। ইহারা খুব কর্মঠ ও নির্ভীক বলিয়া ভারতের প্রতিরক্ষা বিভাগে যোদ্ধার চাকুরি পায়। পর্যটন শিল্পের সংগেও কিছু কর্মী জড়িত আছে।

গ্রাম ও শহরঃ সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় ৯০ শতাংশ এই অঞ্চলের ১৪১৭৭টি গ্রামে বাস করে। চামোলী ও পিথোরাগড় সম্পূর্ণরূপে গ্রামাঞ্চল। অবশিষ্ট জনসংখ্যা এই অঞ্চলের ২৫টি ক্ষুদ্র বৃহৎ শহরে বাস করে। এই সকল শহরের প্রকৃতি নিম্নরূপঃ

(১) মুসৌরী, রানীক্ষেত, লান্সডাউন প্রভৃতি পর্বতের উচ্চ অংশে কান্টনমেন্ট শহররূপে (২) দেরাদুন, নৈনিতাল প্রভৃতি উপত্যকা অংশে জেলার প্রধান কেন্দ্ররূপে (৩) শ্রীনগর, কীর্তিনগর, উত্তরকাশী প্রভৃতি নদী উপত্যকার শহর রূপে (৪) তেহ্‌রি, দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ প্রভৃতি নদীসংগমের শহররূপে (৫) হৃষিকেশ, হরিদ্বার প্রভৃতি বহির্দ্বার শহর রূপে গড়িয়া উঠিয়াছে।

দেরাদুন (১৮২৯১৮)ঃ বিন্দল ও বিসপালা নদীর মধ্যবর্তী উপত্যকায় এই শহরটি অবস্থিত। পশম, তুলা ও রেশমী বস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্র, করাত কল, বাল্‌ব্‌ শিল্প প্রভৃতি এই অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারত সরকারের বনবিদ্যা কেন্দ্র, সামরিক শিক্ষা কেন্দ্র, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস সংস্থা, **সার্ভে অব** ইন্ডিয়ার প্রধান কেন্দ্র এই শহরে অবস্থিত। **আলমোড়া** (১৭১০০) ঃ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে গড়ে ১৭৫০ মিটার উচ্চে অবস্থিত। এই শহরটি জেলার প্রধান শহর। ইহা মূলতঃ প্রশাসনিক এবং পর্যটন কেন্দ্ররূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। নৈনিতাল (১৭১৭১)ঃ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ২০০০ মিটার উচ্চে অবস্থিত। শহরটি জেলার প্রধান কেন্দ্র। প্রশাসনিক কেন্দ্র ও ক্যান্টনমেন্ট এলাকা লইয়া শহরটি গঠিত। স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ভ্রমণকেন্দ্র রূপেই ইহা বিখ্যাত। পিথোরাগড় (১২০০০)ঃ সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ১৬০০ মিটার উচ্চে অবস্থিত জেলার প্রধান শহর। ভারত-তিব্বত সীমান্তে অবস্থিত এই শহরটির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৪. আর্থিক পরিচয়

কৃষিজ সম্পদঃ অধিকাংশ ভূমি অরণ্য ও তুষারাবৃত বলিয়া কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ খুবই কম। সেই জন্য পাহাড়ের গায়ে ধাপ কাটিয়া এক জমিতে ২।৩ বার চাষ করিয়া সেচকার্য দ্বারা উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করা হয়। **জোয়ার-বাজরা-রাগী** ঃ সমগ্র অঞ্চলের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য হইলেও চামোলী, পাউরী, তেহরী প্রভৃতি অঞ্চলে ইহা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ইহার পর গাড়োয়ার অঞ্চলে (উত্তরকাশী, চামোলী) গম এবং কুমায়ুন (দেরাদুন, নৈনিতাল) অঞ্চলে ধান গুরুত্বপূর্ণ শস্য। উত্তর কাশী, পাউরী, উখিমঠ অঞ্চলে গমের সহিত বার্লি চাষ করা হয়। তেহরী ও উত্তর কাশীর কোন কোন স্থানে ধান ও জোয়ার প্রভৃতির সহিত নানাবিধ ডাল উৎপন্ন করা হয়। ইক্ষু এই অঞ্চলের একটি অন্যতম পণ্য শস্য। উচ্চ অংশে আপেল, চেরী, পাম, বাদাম এ্যাপ্রিকট প্রভৃতি ফলের চাষ হয়। যোশীমঠ, চৌবাতিয়া, চামোলী প্রভৃতি অঞ্চল নানাবিধ ফল চাষের জন্য উল্লেখযোগ্য।

পশুপালন ঃ ধবলগংগা নদী উপত্যকায়, ভোটিয়া, কাশ্মীর হইতে আগত গুজ্জর এবং হিমাচল প্রদেশের উচ্চ অংশে বসবাসকারী গদ্দি সম্প্রদায় গ্রীষ্মকালে এই

অঞ্চলে নামিয়া আসে। ইহারা যাযাবর প্রকৃতির, পশুচারণই ইহাদের প্রধান উপ-জীবিকা। ভোটিয়ারা ভেড়া, ছাগল, খচ্চর, গুজ্জরগণ গরু, মহিষ, ঘোড়া এবং গদ্দিগণ ছাগল, ভেড়া প্রতিপালন করে।

খনিজ ও বনজ সম্পদঃ এই অঞ্চলে খনিজ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও যথেষ্ট অনুসন্ধান কার্য হয় নাই বলিয়া খনিজ দ্রব্যের পূর্ণ সদ্ব্যবহার এখনও হয় নাই। তবে উত্তর কাশী, দেরাদুন, তেহরী ও নৈনিতাল অঞ্চলের অরণ্যে বাঁশ, বেত প্রভৃতি নানাবিধ বনজ সম্পদ পাওয়া যায়।

শিল্পজ সম্পদঃ বর্তমানে এখানে যমুনা ও রামগঙ্গা নদীতে বাঁধ দিয়া তাপ উৎপাদন ও জলসেচন করা হইতেছে। মুসৌরী, নৈনিতাল প্রভৃতি শহরে জলবিদ্যুৎ এবং তেহরী, দেরাদুন, পিথোরাগড় প্রভৃতি শহরে ডিজেল দ্বারা তাপ সরবরাহ করা হয়। এতদ্ব্যতীত দেরাদুনের বাল্‌ব্‌ নির্মাণ, বস্ত্রবয়ন, চিনিকল প্রভৃতি শিল্প এবং **অন্যান্য ক্ষুদ্রায়তন শিল্প** (চা-সংক্রান্ত শিল্প, কাগজ ও কাগজ মণ্ড, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ প্রভৃতি) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অরণ্য ও পশু সম্পদ ভিত্তি করিয়া এখানে কুটির শিল্পের মাধ্যমে পশম, বাস্কেট, দড়ি, চর্ম শিল্প, কাষ্ঠ শিল্প প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এতদ্ব্যতীত উপরোক্ত পার্বত্য শহরগুলিতে প্রতি বৎসর বহু পর্যটক ভ্রমণ করিতে আসে বলিয়া নানারূপ ভ্রমণকেন্দ্রিক শিল্প (হোটেল, যানবাহন প্রভৃতি) গড়িয়া উঠিয়াছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ পার্বত্য ও অরণ্যময় অঞ্চল বলিয়া যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন উন্নত নয়। একমাত্র রেলপথটি দেরাদুন অবধি প্রসারিত। কুমায়ুন হিমালয়ের সমগ্র অঞ্চলে সড়কপথ এবং উত্তরের গাড়োয়াল, হিমালয়ের সর্বত্র সাধারণ পথ দেখা যায়। সড়কপথগুলি এই অঞ্চলের মুসৌরী, দেরাদুন, নরেন্দ্রনগর, হৃষিকেশ-তেহরি, ল্যান্সডাউন দেবপ্রয়াগ-শ্রীনগর, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্মপ্রয়াগ, কাঠগোদাম-নৈনিতাল, রানী-ক্ষেত-কর্ণপ্রয়াগ, নৈনিতাল-আলমোড়া, সোমেশ্বর-বাঘেশ্বর-কর্ণপ্রয়াগ প্রভৃতি স্থানে প্রসারিত হইয়াছে। উত্তরাঞ্চলের তুষারাবৃত স্থানের কাঁচাপথ দ্বারা উত্তর কাশী, নন্দপ্রয়াগ, যোশীমঠ, যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী তীর্থস্থান সমূহ যুক্ত হইয়াছে।

সিকিম হিমালয়

৩. সাংস্কৃতিক পরিচয়

জনসংখ্যা ঃ সিকিম রাজ্যের পূর্বাংশে সিংগালীলা পর্বতমালা এবং পশ্চিমাংশে ডংখ্যা পর্বতমালা হইতে অসংখ্য নদীর সৃষ্টি হইয়াছে। মাত্র ৬৪ কিলোমিটার প্রস্থ

বিশিষ্ট এই অঞ্চলে ১৬২১৮৯ লোক বাস করে। সুতরাং এখানে প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে গড়ে ১ জনেরও কম লোক থাকে। উত্তরের হিমবাহ অধ্যুষিত অঞ্চল ব্যতীত দক্ষিণের অংশেই লোকবসতি অপেক্ষাকৃত ঘন। ভুটান, দার্জিলিং প্রভৃতির ন্যায় এই অঞ্চলের অধিবাসীরাও মূলতঃ মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর। ইহারা খুবই কুসংস্কারাচ্ছন্ন। কৃষিকাজ, পশুচারণ, প্রাণীজ দ্রব্য সংক্রান্ত শিল্প ইহাদের প্রধান জীবিকা। সমগ্র এলাকাটি প্রধানতঃ পল্লী অঞ্চল হইলেও টামলং ইহার একটি বড় শহর। গ্যাংটক সিকিম রাজ্যের রাজধানী।

৪. আর্থিক পরিচয়

কৃষিজ সম্পদঃ কৃষি উৎপাদনই ইহাদের প্রধান আর্থিক সম্পদ। ধান, ভুট্টা এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং দারুচিনি, আপেল, আনারস, অম্লফল প্রভৃতির বাণিজ্য হইয়া থাকে। উচ্চ অংশে আলু উৎপন্ন হয়। মেষ, ছাগল, গরু, মহিষ প্রভৃতি প্রাণী প্রতিপালন করা হয়। স্থানীয় চাহিদা পূরণের পর ইহাদের পশম, চর্ম প্রভৃতি দ্বারা বাণিজ্য করা হয়। সম্প্রতি ভারতের সহযোগিতায় এখানে উন্নত বীজ ও সারের সাহায্যে চাষ শুরু হইয়াছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ সড়কপথের পরিবহণ ব্যবস্থা এখানে উন্নতি লাভ করিয়াছে। পূর্বের গ্যাংটক-রংপো (বঙ্গ-সিকিম সীমান্তে) সড়কপথ ব্যতীত। বর্তমানে গ্যাংটক হইতে উত্তর সিকিম (লোচেন) পর্যন্ত সড়কপথ নির্মাণ করা হইয়াছে। ইহার সাহায্যে অরণ্যজাত দ্রব্য, ফল, কৃষিদ্রব্য উত্তরাঞ্চল হইতে দক্ষিণ সিকিমের বাজারে আসিতে পারে। রিষি-জিপালো, গ্যাংটক-নাথুলা পথগুলিও ঐ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে গ্যাংটক হইতে সর্বত্রই সড়কপথের সুব্যবস্থা হইয়াছে।

দার্জিলিং হিমালয়

৩. সাংস্কৃতিক পরিচয়

জনসংখ্যাঃ ভূ-প্রকৃতি অনুসারে ইহা পূর্ব হিমালয়ের একটি অংশ। হিমালয়ের পূর্ব অংশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এখানে জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে এখানে ২১০ জন লোক বাস করে। সমগ্র পূর্ব হিমালয়ে বৌদ্ধ ও তিব্বতীয় লামা ধর্ম প্রধান হইলেও এখানে বিভিন্ন ধর্মের ও সংস্কৃতির প্রসার হইয়াছে। শহরাঞ্চলে প্রচুর লোক বাস করে।

জনসংস্কৃতিঃ সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় ৮৭% গ্রামে বাস করে এবং অবশিষ্টাংশ এই অঞ্চলের দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং প্রভৃতি শহরে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। সমগ্র পূর্ব হিমালয়ের মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা উন্নত অঞ্চল। মঙ্গোলীয়, তিব্বতীয়, নেপালী প্রভৃতি জাতি এখানে বাস করে। ইহাদের প্রধান উপজীবিকা পর্যটন শিল্প ও কৃষি কাজ। ইহার মধ্যে চা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রধান শহর ঃ দার্জিলিং (৬২৪৬৪০) ঃ ইহা জেলার সদর শহর। পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র পার্বত্য স্থানরূপে বিখ্যাত। এই শহরের সন্নিহিত অঞ্চলে ম্যাল, বার্চহিল, অবজারভেটরী হিল, লয়েড বোটানিকাল গার্ডেন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান। **কালিম্পং** (২৫১০৫) ঃ দার্জিলিং শহরের ৪০ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত। ভারত-সিকিম-তিব্বতের বাণিজ্যিক যোগাযোগ-ব্যবস্থা এই শহরের

মাধ্যমে হইতেছে। কার্শিয়াং (১৩৪১০)ঃ ইহা কলিকাতা-দার্জিলিং বিমানপথের প্রধান কেন্দ্র। শহরের নিকটস্থ বাগডোগরা অঞ্চলে বিমান বন্দরটি অবস্থিত।

৪. আর্থিক পরিচয়

কৃষিজ সম্পদঃ এই অঞ্চলের প্রধান কৃষিজ উৎপাদন চা। দার্জিলিং-এর চা ভারতের চা-শিল্পে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। ভারতের অধিকাংশ চা এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয় এবং বিদেশের বাজারে ইহা শ্রীলংকার চায়ের সহিত প্রতিযোগিতা করে। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে এই চা রপ্তানী করা হয়। এই অঞ্চলের দ্বিতীয় কৃষিজ দ্রব্য হইল কমলালেবু। ভারতের বাজারে ইহার বিশেষ চাহিদা আছে। এতদ্ব্যতীত কালিম্পং-এর ১৬ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে মংপু নামক স্থানে সিংকোনা ও দারুচিনি চাষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অন্যান্য সম্পদঃ খনিজ ও অরণ্য সম্পদ এই অঞ্চলে থাকিলেও তাহা এখনও উপযুক্ত পরিমাণে সদ্ব্যবহার করা হয় নাই। খরস্রোতা নদী হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা আছে। এই অঞ্চলের একমাত্র শিল্প পর্যটনকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। সারা বৎসর পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ও বিদেশের নানাস্থান হইতে এই অঞ্চলে পর্যটক আসিয়া থাকে বলিয়া এখানে এক মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভব হইয়াছে। ইহার ফলে এখানে হোটেল ব্যবসা বেশ ভালই চলে।

যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল পথের একটি শাখা এই অংশে প্রসারিত হইয়াছে। দার্জিলিং ও কার্শিয়াং শহর আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের অন্যান্য স্থানের সহিত যুক্ত হইয়াছে। কলিকাতা হইতে একটি প্রধান জাতীয় সড়ক শিলিগুড়ি, কার্শিয়াং, দার্জিলিং, কালিম্পং পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। এই অঞ্চলে কোন উল্লেখযোগ্য জলপথ নাই। কলিকাতা ও ভারতের অন্যান্য অংশের সহিত যোগাযোগ করিবার জন্য এই অঞ্চলের দক্ষিণে (শিলিগুড়ি) বাগডোগরা নামক স্থানে একটি বিমান বন্দর আছে।

ভূটান হিমালয়

৩. সাংস্কৃতিক পরিচয়

জনসংখ্যাঃ এই অঞ্চলের জনসংখ্যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। উত্তরের চোমোলহরি (৭৩১৪ মিটার উচ্চ) ও কুলকাংরি (৭২৯০ মিটার উচ্চ) হিমবাহ অধ্যুষিত পার্বত্য অঞ্চলে লোকবসতি নাই। তবে ইহার দক্ষিণের পর্বত-পাদদেশ অঞ্চলের পশ্চিমাংশে (পুংখা, থিম্বু, ফুণ্ট সোলিং) লোকবসতি বেশ ঘন। কিন্তু ইহার পূর্বাংশে (টংসা ও দেওয়ান গিরি) এখনও যথেষ্ট অনুন্নত রহিয়া গিয়াছে।

জনসংস্কৃতিঃ এই অঞ্চলের অধিবাসীরা মূলতঃ গ্রাম্য এবং আদিবাসী শ্রেণীর। তিব্বত, আসাম, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশের মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর লোকেরা এখানে বসতি করিয়াছে। অপ্রশস্ত নদী উপত্যকা এবং কৃষিযোগ্য পার্বত্য অঞ্চলে এই সকল অধিবাসী বাস করে। কৃষিকাজ ইহাদের একমাত্র জীবিকা। ভুটানের প্রধান শহর থিম্পু। পারো ও পুংখা এই অঞ্চলের অন্য দুইটি শহর। এই রাজ্য পররাষ্ট্র নীতি সম্বন্ধে ভারত সরকারের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকে।

৪. আর্থিক পরিচয়

কৃষিজ সম্পদঃ কৃষিকাজ এই অঞ্চলের অর্থনীতিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ধান, গম, বার্লি প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে চাষ হয়। কিন্তু অনুর্বর ভূমি, ভূমিক্ষয় প্রভৃতির জন্য উৎপাদন অত্যন্ত কম। পশুচারণ ইহাদের দ্বিতীয় আর্থিক প্রচেষ্টা বলা যাইতে পারে। মাংস, পশম ও দুধের জন্য এখানে ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পালন করা হয়। ভারবহনের জন্য ইয়াক প্রতিপালন করা হয়।

যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ উত্তরে তিব্বতের সহিত যোগসূত্র বন্ধ হওয়ায় এই অঞ্চলের পরিবহণ ব্যবস্থা বর্তমানে কিছুটা অনুন্নত অবস্থায় আছে। তাই উদ্বৃত্ত কৃষিজ উৎপাদনের বাণিজ্য করা এক সমস্যা বিশেষ। ভারত সরকার ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে ফুণ্ট সোলিং হইতে পশ্চিমে পারো পর্যন্ত সড়কপথ নির্মাণ করিবার পর ভারতের সহিত ভুটানের যোগাযোগের পথ প্রস্তুত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এখানে অন্য কোন প্রকার যোগাযোগ ব্যবস্থা নাই। তবে বর্তমানে পারো এবং থিম্বুতে বিমান অবতারণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

আসাম হিমালয়

৩. সাংস্কৃতিক পরিচয়

জনসংখ্যাঃ নর্থ ইস্টার্ন ফ্রণ্টিয়ার এজেন্সীর আদ্যক্ষর লইয়া গঠিত নেফা (NEFA) অঞ্চলের আধুনিক নামকরণ করা হইয়াছে অরুণাচল। এই অঞ্চলের পার্বত্য এলাকায় প্রায় ৩৬৯২০০ লোক বাস করে। সুতরাং আয়তনের বিচারে এখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১ জনেরও কম লোক বাস করে। সমগ্র অঞ্চল পর্বতময় ও অরণ্যসংকুল হওয়ায় অধিবাসীরা বিক্ষিপ্তভাবে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছে।

জনসংস্কৃতি ঃ এই পার্বত্য অঞ্চলের পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব দিক বরাবর কামেং সীমান্ত প্রদেশে ডাফ্লা, সুবর্নসিরি সীমান্ত প্রদেশে মিরি, সীয়াং সীমান্ত প্রদেশে অবর এবং লোহিত সীমান্ত প্রদেশে মিশমী উপজাতি বাস করে। এতদ্ব্যতীত মন্পা, তাগিন, অপাটানি প্রভৃতি উপজাতিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহারা অত্যন্ত অনুন্নত। গোষ্ঠীভাব ইহাদের মধ্যে খুবই প্রবল। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য একই প্রকারের হইলেও ইহাদের সাংস্কৃতিক জীবনে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। ইহারা অত্যন্ত স্বাধীনচেতা সহজে বশ্যতা স্বীকার করিতে চায় না। ইহাদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচলিত আছে। কৃষিকাজ ও পশুপালনই ইহাদের একমাত্র জীবিকা।

প্রধান শহরঃ বমডিলা, তওয়াং, সেলা, ডিরাং, রামেং, তেজু প্রভৃতি নেফার উন্নত ও বর্দ্ধিষ্ণু অঞ্চল। এই সকল শহর হইতে প্রশাসনিক ও অনান্য কাজকর্ম পরিচালনা করা হয়।

৪. আর্থিক পরিচয়

কৃষিজ সম্পদঃ কৃষিকাজ দ্বারাই এই অঞ্চলের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হয়। কামেং জেলায় বার্লি, গম, জোয়ার, সয়াবীন ধান প্রভৃতি এবং সুবর্নসিরি জেলায় ধান, ভুট্টা, জোয়ার, সব্জী প্রভৃতির চাষ হয়। সিয়াং জেলায় নানাবিধ সব্জী চাষ করা হয় এবং লোহিত জেলার উচ্চ অংশে গম, বার্লি ও নিম্ন অংশে ধান, জোয়ার,

আলু, তৈলবীজ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। গরু-মহিষ প্রতিপালন এই অঞ্চলের দ্বিতীয় আর্থিক সম্পদ। সুবনসিরি ও লোহিত জেলায় হস্তশিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যোগাযোগ ব্যবস্থা: এই অঞ্চলে রেলপথের প্রসার না হইলেও সড়ক পথ তুলনায় কিছুটা উন্নত। এই সড়কপথগুলির মধ্যে লোহিত জেলায় নামাসী-চকহাম, সাদিয়া শইং সড়ক, সিয়াং জেলায় পাসীঘাট-ডিব্রুগড়। আলং সোনারি ঘাট সড়ক, সুবনসিরি জেলায় উত্তর লখিমপুর-হাপোলী সড়ক ও কামেং জেলায় তেজপুর-বমডিলা তওয়াং সড়কপথ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করিবার জন্য সমগ্র অঞ্চলের চারটি স্থানে বিমান অবতারণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৩
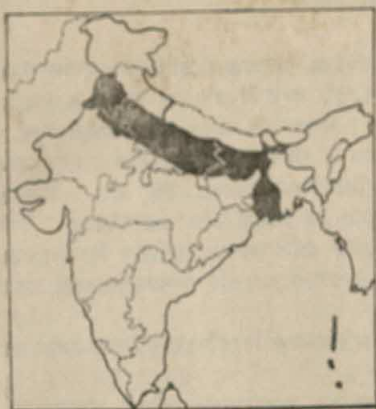
।। গঙ্গা সমভূমি ।।

১ সাধারণ পরিচয়

ভূমিকাঃ প্রকৃতপক্ষে গঙ্গা সমভূমির বিস্তৃর্ণ অঞ্চলটিকে উত্তর ভারতের সমভূমি বলা অধিক সঙ্গত, কারণ এই বিশাল সমভূমি শুধুমাত্র গঙ্গা অববাহিকার দান নয়। একদিকে সিন্ধু ও অপরদিকে ব্রহ্মপুত্র নদীর পলি দ্বারা ইহা গঠিত হইয়াছে। ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্যের জন্য ব্রহ্মপুত্র সমভূমি পৃথক রূপে আলোচনা করা হইবে, কিন্তু সিন্ধু ও গঙ্গা সমভূমির ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য পরস্পরের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত বলিয়া পাঞ্জাব-হরিয়ানা-দিল্লী-উত্তরপ্রদেশ-বিহার-পশ্চিমবঙ্গের এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে সিন্ধু-গঙ্গা সমভূমি আখ্যা দেওয়া অধিক সঙ্গত। ভারতের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির ক্ষেত্রে এই সমভূমির দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অবস্থান ও আয়তনঃ এই সমভূমি অঞ্চল ২১°২৫′ উ—৩২°৩০′ উত্তর পর্যন্ত এবং ৭৩°৫১′ পূ—৮৯°৫৮′ পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরে হিমালয় অঞ্চল এবং দক্ষিণে মালভূমি অঞ্চলের মধ্যে বিধৃত এই সমভূমির আয়তন ৪৭০১২০ বর্গ কিলোমিটার। সিন্ধু সমভূমি ব্যতীত আয়তনের দিক হইতে নিম্নগঙ্গা সমভূমি সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, উচ্চ এবং মধ্য গঙ্গা সমভূমি ইহার প্রায় দ্বিগুণ।

সীমাঃ সিন্ধু-গঙ্গা সমভূমির প্রাকৃতিক সীমারেখা নিম্নরূপঃ ইহার উত্তর-পশ্চিমে রহিয়াছে বিতস্তা-শতদ্রু বিধৌত সিন্ধু-সমভূমির পশ্চিমাংশ, দক্ষিণ-পশ্চিমে মরু অঞ্চল, দক্ষিণে মালব বুন্দেলখণ্ড, বাঘেলখণ্ড, ছোটনাগপুর মালভূমি ও বঙ্গোপসাগর এবং সমগ্র উত্তরাংশ হিমালয় পর্বত দ্বারা পরিবেষ্টিত। পূর্বাংশে পদ্মা-যমুনার ব-দ্বীপ অঞ্চল (অধুনা বাংলাদেশ) অবস্থিত। রাজনৈতিক দিক হইতে ইহার উত্তরে চীন (তিব্বত) ও নেপাল, দক্ষিণে ভারতের রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, দক্ষিণ-বিহার ও বঙ্গোপসাগর। বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, এই সমভূমি পূর্বে ও পশ্চিমে যথাক্রমে বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তান দ্বারা সীমিত।

বর্তমান পরিচয়ঃ সিন্ধু সমভূমির অন্তর্গত পাঞ্জাব প্রদেশ ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। সাধারণভাবে ঘাঘারা নদীর উত্তরাংশ পাঞ্জাব এবং দক্ষিণাংশ হরিয়ানা নামে পরিচিত। প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থিক সাদৃশ্যের জন্য সমগ্র

দিল্লী রাজ্য এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ভিন্নতর ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের জন্য উত্তর প্রদেশের উত্তর ও দক্ষিণ অংশ এই সমভূমি অঞ্চলের সহিত যুক্ত হয় নাই. ইহারা যথাক্রমে হিমালয় ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমির অন্তর্গত। অনুরূপভাবে বিহারের দক্ষিণাংশ এবং পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও পশ্চিম অংশ বর্জন করা হইয়াছে। সিন্ধু-সমভূমি ব্যতীত সমগ্র গঙ্গা-সমভূমির তিনটি অংশঃ উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন গঙ্গা সমভূমি। গঙ্গা নদীর প্রবাহ অনুসারে এই তিনটি ভাগ করা হইয়াছে।

অঞ্চল পরিচয়ঃ ভূ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলি লইয়া এই বিস্তীর্ণ সমভূমি অঞ্চলকে কয়েকটি বিশদভাগে ভাগ করা যায়ঃ

(ক) সিন্ধু সমভূমিঃ সমগ্র পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও দিল্লী প্রদেশ ইহার অন্তর্গত হইয়াছে।

(খ) উচ্চগঙ্গা সমভূমি ঃ উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশের মীরাট (আংশিক, আগ্রা, রোহিলখণ্ড, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ (আংশিক), ফৈজাবাদ (আংশিক), কুমায়ুন (আংশিক) মহকুমা লইয়া এই অঞ্চল গঠিত।

(গ) মধ্যগঙ্গা সমভূমিঃ উত্তরপ্রদেশের গঙ্গা নদীর উভয় তটের পূর্বাংশ, উত্তর বিহারের গঙ্গা নদীর উভয় তটের (পূর্ণিয়া জেলার অংশ ব্যতীত) সমগ্র অংশ লইয়া এই অঞ্চল গঠিত।

(ঘ) নিম্নগঙ্গা সমভূমিঃ পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমা এবং পুরুলিয়া জেলা ব্যতীত সমগ্র রাজ্য ও বিহারের পূর্ণিয়া জেলার কিয়দংশ লইয়া এই অঞ্চল গঠিত হইয়াছে।

২. প্রাকৃতিক পরিচয়

ভূপ্রকৃতি ঃ এই বিস্তীর্ণ সমভূমির ভূপ্রকৃতি সর্বত্র প্রায় একই রকম। ইহার উত্তরাংশ হিমালয়-পাদদেশের এবং দক্ষিণাংশ দাক্ষিণাত্যের মালভূমির নিকটবর্তী বলিয়া ঐ সকল অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি কিঞ্চিৎ ভিন্নধর্মী। এই সমভূমি অঞ্চলের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপঃ

সিন্ধু-সমভূমিঃ শিবালিক পর্বতমালার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমের ঢালু অংশ সিন্ধু সমভূমির উত্তরাংশে বিস্তৃত হইয়াছে। দক্ষিণের আরাবল্লী পর্বতের ঢালু অংশ সিন্ধু সমভূমির দক্ষিণ হইতে উত্তরে প্রসারিত হইয়াছে। ভূপ্রকৃতির এইরূপ বৈচিত্র্যের জন্য দক্ষিণ-পূর্বের রোঠাষ্ অঞ্চলে একটি নিম্নভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। সমগ্র পূর্ব অংশ উত্তরে ও দক্ষিণে যথাক্রমে শিবালিক ও আরাবল্লী পর্বত প্রভাবিত হইলেও পশ্চিমের হিসার, ভাতিন্দা, ফিরোজপুর প্রভৃতি সমভূমি অঞ্চল। এই সমভূমির উত্তর হইতে দক্ষিণে কয়েকটি দোয়াব (নদী-মধ্যবর্তী-স্থান) অঞ্চল দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি হইলঃ বিতস্তা-বিপাশা দোয়াব, বিপাশা-শতদ্রু দোয়াব, শতদ্রু-ঘর্ঘরা দোয়াব ও ঘর্ঘরা-যমুনা দোয়াব। ইহাদের সম্মিলিত প্রবাহের ফলেই এই সমভূমি গঠিত।

উচ্চগঙ্গা সমভূমি ঃ উত্তরের শিবালিক পর্বতমালার পাদদেশ হইতে দক্ষিণে যমুনা নদী উপত্যকার মধ্যাংশে বিধৃত এই বিস্তীর্ণ পলিগঠিত সমভূমিতে কেবলমাত্র নদীউপত্যকা, নদীপ্লাবনভূমি ইত্যাদি ব্যতীত এই সমভূমিতে অন্য কোন প্রকার ভূ-প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য নাই। এই অঞ্চলের ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য

নিম্নরূপঃ (১) উত্তর-পশ্চিমে শিবালিক পর্বত পাদদেশের ভূমি—ইহার দক্ষিণের ঢাল হইতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। (২) ঘর্ঘরা-গঙ্গা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল বালিমিশ্রিত পলি দ্বারা গঠিত এবং দক্ষিণপূর্বে ঢালু। (৩) ইহার দক্ষিণে গঙ্গা-যমুনা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী দ্বারা চিহ্নিত। (৪) ইহারও দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে যমুনা-চম্বল নদীর মধ্যবর্তী অংশ দ্বারা উচ্চগঙ্গা সমভূমি সীমিত হইয়াছে।

মধ্যগঙ্গা সমভূমি ঃ ভূপ্রকৃতি অনুসারে এই অঞ্চল গঙ্গা অববাহিকার অন্তর্গত হইলেও ইহার উত্তরের সামান্য অংশে (চম্পারণ জেলা) হিমালয় পাদদেশের শিবালিক পর্বত এবং দক্ষিণে (ডালটনগঞ্জ, হাজারীবাগ, কোডারমা, গিরিডি অঞ্চল) দাক্ষিণাতের বিন্ধ্য ও ছোটনাগপুরের মালভূমি প্রসারিত হইয়াছে। সুতরাং ইহার মধ্যবর্তী অংশের সমভূমি উত্তরে মৃদু উচ্চতাযুক্ত এবং দক্ষিণে প্রায় খাড়াই-ভাবে যথাক্রমে হিমালয় ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। নদী-প্রবাহের গতি ও প্রকৃতি অনুসারে এই বিস্তীর্ণ সমভূমি অঞ্চল গঙ্গার উত্তরে মহানন্দা-কোশী, কোশী-গণ্ডক, গণ্ডক-ঘর্ঘরা, ঘর্ঘরা-গঙ্গা এবং দক্ষিণে গঙ্গা-শোন ও মগধ-অঙ্গ সমভূমি দেখা যায়।

নিম্নগঙ্গা সমভূমিঃ এই অংশটি পলিগঠিত সমভূমি হইলেও এখানে নিম্নরূপ বৈচিত্র্য দেখা যায়ঃ (১) মালদহ-পশ্চিম দিনাজপুর অঞ্চলে ল্যাটেরাইট গঠিত অঞ্চল, (২) পশ্চিমাংশে বাঁকুড়া-মেদিনীপুর-বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে ছোটনাগপুর মালভূমির ক্ষীণ প্রভাব, (৩) উত্তরের জলপাইগুড়ি ও দক্ষিণ দার্জিলিং অঞ্চলে হিমালয় পাদদেশের উচ্চভূমি, (৪) মেদিনীপুরের দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্রতীরে বালিয়াড়ী অঞ্চল। সামগ্রিক ভাবে এই বিস্তীর্ণ সমভূমি উত্তর ও পশ্চিম হইতে দক্ষিণে ঢালু হইয়াছে। এই সমভূমির উত্তর অংশ ডুয়ার্স ও বারিন্দ (বরেন্দ্র ভূমি), পশ্চিম অংশ রাঢ় নামে পরিচিত। গঙ্গা সমভূমির দক্ষিণাংশে (মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া) দ্বীপ গঠনের কাজ বহু পূর্বেই শেষ হইয়াছে বলিয়া ইহারা বর্তমানে মৃত। হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান (পূর্ব) প্রভৃতি অঞ্চলে দ্বীপগঠন বেশ পরিণত হইয়াছে এবং দক্ষিণতম অঞ্চলে (চব্বিশ পরগণা ও সুন্দরবন অঞ্চলে) ব-দ্বীপ গঠনের কাজ এখনও চলিতেছে।

নদনদীঃ সিন্ধু-গঙ্গা সমভূমির পশ্চিমাংশে সিন্ধুর শাখানদী এবং পূর্ব অংশে গঙ্গা ও গঙ্গার অসংখ্য শাখা নদী প্রবাহিত হইতেছে। ইহাদের সম্মিলিত প্রবাহ দ্বারা আনীত পলিদ্বারা এই সমভূমি গঠিত হইয়াছে। **সিন্ধু সমভূমির নদী**ঃ এই অঞ্চলের প্রধান নদী উত্তরের বিতস্তা ও বিপাশা নদী হিমাচল প্রদেশের রোটাং হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে (পাকিস্তানে) চন্দ্রভাগা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার দক্ষিণে শতদ্রু নদী হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়া এবং পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়া জালন্ধরের নিকটে বিপাশার সহিত মিলিত হইয়াছে। পূর্বের উচ্চভূমি হইতে অসংখ্য ক্ষীণজীবি নদী সম্মিলিতভাবে ঘাঘারা নামে শিবালিক পর্বত হইতে নামিয়া আসিয়া সমভূমির প্রায় মধ্যভাগ দিয়া পশ্চিম মুখে প্রবাহিত। এই অঞ্চলের একমাত্র দক্ষিণমুখী নদী যমুনা (গঙ্গার উপনদী) সিন্ধু সমভূমির পশ্চিমসীমা চিহ্নিত করিতেছে। **গঙ্গা-সমভূমির নদী**ঃ এই সকল নদী-প্রবাহ উচ্চ অংশে উত্তর-পশ্চিম-দক্ষিণপূর্ব অভিমুখে হইলেও, মধ্য ভাগে তাহাদের গতি পূর্ব মুখে ও নিম্ন-সমভূমিতে ইহারা দক্ষিণাভিমুখী। প্রধান নদী গঙ্গা

সমভূমির প্রায় মধ্য অংশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ইহার উত্তর তটে রামগঙ্গা নদী ফতেগড়ের নিকট গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। উত্তরে ঘর্ঘরা ও দক্ষিণে যমুনা নদী মূল নদীর সমান্তরালে প্রবাহিত হইয়া মধ্যগঙ্গা সমভূমিতে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সমভূমিতে গঙ্গার উত্তরে গোমতী, ঘর্ঘরা, গণ্ডক, কোশী প্রভৃতি এবং দক্ষিণে যমুনা প্রভৃতি নদী মিলিত হইয়াছে। এই সমভূমির ঢাল অত্যন্ত কম বলিয়া এই অঞ্চলের নদীগুলি অসংখ্যবার গতি পরিবর্তন করিয়াছে। তাহার ফলে একদিকে বন্যার আশংকা থাকিলেও পলিগঠনের বিশেষ সুযোগ রহিয়াছে। প্রসঙ্গত, কোশী নদী এখনও গতি পরিবর্তন করিতেছে। অতঃপর সম্মিলিত জলপ্রবাহ রাজমহলের পর্বতের উত্তরে নিম্নগঙ্গা সমভূমিতে প্রবেশ করিয়া দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরপ্রান্ত হইতে গঙ্গা নদী দ্বিধা বিভক্ত হইয়া ইহার মূল স্রোতটি পদ্মা নামে বাংলাদেশের দিকে প্রবাহিত হইয়াছে এবং অপর অংশটি ভাগীরথী নামে পশ্চিমবঙ্গে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত, ইহার নিম্নাংশ হুগলী নামে পরিচিত। ছোটনাগপুর মালভূমি হইতে উৎপন্ন রাঢ়বঙ্গের নদীগুলি (ময়ূরাক্ষী, দামোদর, অজয় ইত্যাদি) ভাগীরথীকে পুষ্ট করিতেছে। এতদ্ব্যতীত, দ্বারকেশ্বর, কংসাবতী, শিলাবতী প্রভৃতি নদীগুলিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উত্তরবঙ্গের প্রধান নদী তিস্তার দক্ষিণমুখী প্রবাহ পূর্বের ব্রহ্মপুত্র নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে এবং মহানন্দা নদী মধ্যগঙ্গা সমভূমিতে ও করতোয়া জলঢাকা প্রভৃতি নদীগুলি বাংলাদেশের দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। এই বিস্তীর্ণ গতিপথে গঙ্গা নদী উত্তরতটে সরযূ, কালী, সারদা, সীর্সা, বুড়িগঙ্গা, ছোট গণ্ডক, রাপ্তী, ছোট সরযূ, বরুণা, কর্মনাশা প্রভৃতি অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর জলদ্বারা পুষ্ট হইয়াছে।

জলবায়ু ঃ সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থানের জন্য পাঞ্জাব মৌসুমী বায়ুর প্রভাব-বঞ্চিত, কিন্তু সমগ্র গঙ্গা-সমভূমির জলবায়ু মৌসুমী বায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তদুপরি উত্তরে হিমালয় অঞ্চল, দক্ষিণে মালভূমি অঞ্চল, পূর্বে মেঘালয়ের পার্বত্য অঞ্চল এবং পশ্চিমে পাঞ্জাবের প্রায়-শুষ্ক অঞ্চল থাকায় উচ্চগঙ্গা সমভূমিতে আর্দ্র মৌসুমী, নিম্নগঙ্গা সমভূমিতে উষ্ণ ও আর্দ্র মৌসুমী এবং মধ্যবর্তী অঞ্চলে মিশ্র মৌসুমী জলবায়ু দেখা যায়।

তাপমাত্রা ঃ শীতকালীন তাপমাত্রা গড়ে ১৩°—২০° সে-এর মধ্যে থাকে। পাঞ্জাব হইতে তাপমাত্রা উত্তরপ্রদেশ-বিহার-পশ্চিমবঙ্গ অভিমুখে বাড়িতে থাকে। এই সমভূমির বিভিন্ন স্থানের শীতকালীন গড় তাপমাত্রা নিম্নরূপঃ পাঞ্জাব ১০—১২.৫° সে. উত্তরপ্রদেশ ১২.৫°—১৭.৫° সে., উত্তর বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ ১৫°—১৭.৫° সে. পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাঞ্চলে ১৫°—২০° সে. পর্যন্ত। গ্রীষ্মকালের তাপমাত্রা পশ্চিমাভিমুখে বৃদ্ধি পায়। তখন সমগ্র গঙ্গা সমভূমির গড় তাপমাত্রা ২৭.৫°সে.—৩০°সে. থাকে, তবে রাজস্থানের মরু অঞ্চলের প্রভাবে সিন্ধু সমভূমির তাপমাত্রা (৩০°—৩২.৫° সে) কিছু বেশীই থাকে।

বৃষ্টিপাত ঃ গাঙ্গেয় উপত্যকায় মৌসুমী বায়ু প্রবাহের ফলে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হইলেও সিন্ধু উপত্যকায় পার্শ্ববর্তী মরু অঞ্চলের প্রভাব রহিয়াছে। ফলে পাঞ্জাব হরিয়ানা সমভূমির পশ্চিমাংশে গড় বৃষ্টিপাত ২০.—৪০. সে. মি. হইলেও পূর্বাংশে বৃষ্টিপাত ক্রমেই বাড়িতে থাকে এবং শিবালিক পর্বত পাদদেশে ১০০ সে.মি. পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়। আবার উত্তর প্রদেশের সমভূমি অঞ্চলে (অর্থাৎ দক্ষিণাংশে) ইহার

পরিমাণ কিছু কম (৬০—১০০ সে মি.)—সমগ্র মধ্য ও নিম্নগঙ্গা সমভূমির গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ঐ প্রকার।

মৃত্তিকাঃ এই অঞ্চলটি প্রধানতঃ পলি মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত হইলেও ইহার নানা স্থানে নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়ঃ (১) ধূসর ও বাদামী মৃত্তিকাঃ এই মৃত্তিকা সমগ্র পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশের দক্ষিণাংশ ও বিহারের উত্তরাংশে দেখা যায়। (২) গাঙ্গেয় পলিঃ ইহা উত্তরপ্রদেশের সমগ্র উত্তর অংশে এবং উত্তর বিহারের কোন কোন স্থানে, পাঞ্জাবের মধ্য অংশে, পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে ও উত্তরবঙ্গে এই মৃত্তিকা দেখা যায়। (৩) ল্যাটেরাইটঃ পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাংশ (বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর) এই মৃত্তিকায় গঠিত। (৪) লবণাক্ত মৃত্তিকাঃ চব্বিশ পরগণা ও মেদিনীপুর জেলার সমুদ্র সন্নিহিত অঞ্চলে লবণাক্ত মৃত্তিকা দেখা যায়। এই সকল মৃত্তিকার (বিশেষতঃ গাঙ্গেয় পলি) উর্বরা শক্তি খুবই বেশী।

স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জঃ সিন্ধু সমভূমিতে অত্যধিক শুষ্কতা ও উত্তাপের জন্য স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ প্রায় নাই বলিলেই চলে, অন্যান্য অঞ্চলে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। যে সকল মূল্যবান বৃক্ষ ও অরণ্যে এই অঞ্চল সমৃদ্ধ তাহার বিবরণ নিম্নরূপঃ (১) ক্রান্তীয়ঃ পাঞ্জাবের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে কাঁটা জাতীয় (বাবুল প্রভৃতি) বৃক্ষ জন্মে। গঙ্গা সমভূমির পশ্চিমাংশে খয়ের, সেমাল প্রভৃতি শুষ্ক অঞ্চলের বৃক্ষ দেখা যায়। (২) ক্রান্তীয় আর্দ্র পর্ণমোচীঃ যে সকল স্থানে ৫০ সে. মি. বৃষ্টিপাত হয় সেখানে সিসম, ঢাক প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। সাধারণতঃ সিন্ধু সমভূমির দক্ষিণ-পশ্চিম, উত্তর শিবালিক পর্বতের পাদদেশে, উচ্চ গঙ্গা সমভূমির তরাই অঞ্চলে, মধ্যগঙ্গা সমভূমির নদী উপত্যকার নানা স্থানে এবং নিম্নগঙ্গা অববাহিকার সমুদ্রতীরবর্তী সুন্দরবন অঞ্চলে ইহা জন্মে। (৩) ক্রান্তীয় চিরহরিৎঃ নিম্নগঙ্গা সমভূমির উত্তরাংশে এই জাতীয় বৃক্ষ দেখা যায়। এই সমভূমির পশ্চিমাংশের ল্যাটেরাইট গঠিত অঞ্চলে পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য আছে।

সাংস্কৃতিক ও আর্থিক পরিচয়

এই বৈচিত্র্যপূর্ণ ভৌগোলিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে সিন্ধু-গঙ্গা সমভূমির বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ও আর্থিক পরিচয় গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতির এই সূক্ষ্ম পার্থক্যের জন্যই পশ্চিমের সিন্ধু সমভূমি হইতে পূর্বের নিম্নগঙ্গা সমভূমির বিভিন্ন অঞ্চলে সাংস্কৃতিক ও আর্থিক উন্নতির বিষয়ে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয়। এই সমভূমির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন রাজ্যের বিশদ বিবরণ জানিতে হইলে এই অঞ্চলগুলির পৃথকভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

সিন্ধু সমভূমি

৩. সাংস্কৃতিক পরিচয়

জনসংখ্যাঃ দেশ বিভাগের ফলে এই অঞ্চলের জনসংখ্যার এক বিপুল পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। সিন্ধু সমভূমির ৯৫৭১৪ বর্গকিলোমিটার পরিমিত অঞ্চলে প্রায় ২৭.৪৭ মিলিয়ন লোক বাস করে। সুতরাং এই অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে গড়ে ২২৪ জন এবং দিল্লী রাজ্যের জনসংখ্যার ঘনত্ব ১৮৫৪ জন। তবে সাধারণভাবে উত্তরাঞ্চলের অমৃতসর, জালন্ধর, গুরদাসপুর, লুধিয়ানা

প্রভৃতি অঞ্চলেই অধিক ঘনবসতি। অপরপক্ষে সংগোর, হিসার, জিন্দ, ভাতিন্দা, ফিরোজপুর, মহেন্দ্রগড় প্রভৃতি অঞ্চলে অনেক কম লোক বাস করে।

জনসংস্কৃতিঃ দেশ বিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের ন্যায় এই রাজ্যেও যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শহরের উৎপত্তি, নতুন রাজধানী নির্মাণ এবং দ্রুত শিল্পায়ন তাহার অন্যতম। ফরিদাবাদ ও নীলোখেরি শহর দুইটি উদ্ভবের পর উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান হইয়াছে। দিল্লী-ফিরোজপুর রেলপথ চালু হওয়ায় জুলানা, উচানা, মান্ডীকোট, গোনিয়ানা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শহরের উৎপত্তি হইয়াছে। পুরাতন শহরগুলিতে লোক সংখ্যা বাড়িয়াছে। ইহারা পাঞ্জাবী নামে পরিচিত হইলেও এখানে প্রধানতঃ শিখ ও হিন্দু ধর্মেরই প্রাধান্য। দিল্লী অঞ্চলে সর্বভাষী ও সর্বধর্মী লোক বাস করে। হরিয়ানা অঞ্চলে কৃষিকাজ প্রধান জীবিকা কিন্তু পাঞ্জাব অঞ্চলের অধিবাসীরা অনেকাংশে শিল্পের উপর নির্ভরশীল। দিল্লী শহরের অধিবাসীরা প্রশাসনিক, ব্যবসা-বাণিজ্য ও নানাবিধ শিল্পে নিযুক্ত।

গ্রাম ও শহরঃ সমগ্র জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ এই সমভূমির ১৮৯১৭টি ক্ষুদ্র-বৃহৎ গ্রামে বাস করে। গুরগাঁও, লুধিয়ানা, গুরদাসপুর, রুপার, আম্বালা, জালন্ধর প্রভৃতি জেলার গ্রামে প্রচুর জনসংখ্যা বাস করে, অবশিষ্ট জনসংখ্যা শহরবাসী। পাঞ্জাব রাজ্যে শহরবাসীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী, কেন্দ্রশাসিত দিল্লী রাজ্যের প্রায় ৮৯ শতাংশই শহরে বাস করে। এই অঞ্চলের শহরগুলির মধ্যে চণ্ডীগড়, আম্বালা, অমৃতসর, লুধিয়ানা, জালন্ধর, পাতিয়ালা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চণ্ডীগড়ঃ দেশবিভাগের ফলে পাঞ্জাবের শহরটি রাজধানীরূপে নির্মিত হইয়াছে। ইহা পাতিয়ালী ও শুখনা নদীর মধবর্তী স্থানে অবস্থিত। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। সড়কপথের দ্বারা ইহা দিল্লী, সিমলা প্রভৃতি শহরের সহিত যুক্ত। **অমৃতসর ঃ** পাঞ্জাবের উত্তরে অবস্থিত একটি বৃহৎ শিল্পকেন্দ্র। শিখদের প্রধান তীর্থস্থান ও পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব রাজধানী। কার্পাস রেশম ও পশম শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানকার গালিচা, শাল ও নকসাদার কাঠ বিখ্যাত। রেলপথের কেন্দ্ররূপেও ইহার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। **লুধিয়ানাঃ** জেলার সদর শহর ও বাণিজ্য কেন্দ্র। ইহা সড়কপথের দ্বারা পাকিস্তানের লাহোর, পাঞ্জাবের ফিরোজপুর ও উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরের সহিত যুক্ত। কার্পাস বস্ত্র, কাশ্মীরী শাল, সৈন্যদের পোশাক ও পাগড়ী প্রধান শিল্প দ্রব্য। **আম্বালা ঃ** হরিয়ানা রাজ্যের ঐ জেলার প্রধান শহর। এই শহরের সেনানিবাস বিশেষ বিখ্যাত। এখানে কাঁচ, কার্পাস, সেলাই মেসিন প্রভৃতি নানাবিধ শিল্প আছে। **পাতিয়ালাঃ** জেলার সদর শহর। এখানে লৌহ ও ইস্পাত এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্রস্তুত হয়। ময়দা শিল্পের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। **জালন্ধরঃ** জেলার প্রধান শহর। দেশবিভাগের ফলে এই শহরটি খেলা-ধুলার সরঞ্জাম নির্মাণে অগ্রণী হইয়া উঠিয়াছে। **দিল্লীঃ** প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের রাজধানীরূপে খ্যাত, বর্তমানে রাজধানীর নাম নয়াদিল্লী। পুরাতন দিল্লী একটি শিল্পপ্রধান নগর ও বাণিজ্যস্থান। বিশ্ববিদ্যালয়, ভারতের প্রশাসনিক কেন্দ্র ও রেলওয়ে জংশন রূপে খ্যাত।

৪. আর্থিক পরিচয়

কৃষিজ সম্পদঃ শতকরা ৭০ জনই কৃষিকাজ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। নানা ধরনের শস্য চাষ এবং খাদ্য শস্যের উপর গুরুত্ব—এই অঞ্চলের কৃষিকাজের বৈশিষ্ট্য। এখানকার কৃষি উৎপাদন দুই প্রকারেরঃ (১) খরিফ শস্য—জুন-আগস্ট

হইতে সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে বাজরা, জোয়ার, ভুট্টা, তুলা, ধান, ইক্ষু চাষ করা হয়। (২) রবি শস্য— অক্টোবর-নভেম্বর হইতে এপ্রিল-মে পর্যন্ত সময়ে ছোলা, বার্লি, সরিষা প্রভৃতির চাষ করা হয়।

গমঃ মহেন্দ্রগড় জেলা ব্যতীত সমগ্র অঞ্চলেই ইহার চাষ হয়। শতদ্রু-ঘাঘারার মধ্যবর্তী অঞ্চলে জলসেচের সাহায্যে ইহার উৎপাদন হইয়া থাকে। হরিয়ানার কর্ণাল, রোটাকে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন হয়। বিতস্তা বিপাশার মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে ইহার উৎপাদন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **বাজরা**ঃ হরিয়ানার হিসার, মহেন্দ্রগড় ও গুরগাঁওয়ের শুষ্ক ও বালুময় অঞ্চলে ইহা সর্বাধিক পরিমাণে জন্মে। ইহার পর ফিরোজপুর, রোটাক, জিন্দ, ভাতিন্দার নাম উল্লেখযোগ্য। ইহা পশু ও মনুষ্য খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। **ছোলা** ঃ শতদ্রুর দক্ষিণে শুষ্ক অঞ্চলে অর্থাৎ হিসার, ভাতিন্দা, ফিরোজপুর ও রোটাকে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। **ধান্য**ঃ আর্দ্র ও জলসিক্ত অঞ্চলে এবং খাল-সেচযুক্ত অঞ্চলে ইহার চাষ হয়। কর্ণাল জেলায় সর্বাধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইলেও অমৃতসর, গুরদাসপুর, পাতিয়ালা, আম্বালা প্রভৃতি অঞ্চলেও ইহা উৎপন্ন হয়। **জোয়ার**ঃ হরিয়ানার হিসার ব্যতীত অন্যান্য সকল জেলার শুষ্ক অঞ্চলেই জোয়ার উৎপন্ন হয় এবং ইহা পশু ও মনুষ্য খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। **ভুট্টা**ঃ ইহা অপেক্ষাকৃত আর্দ্র অঞ্চলে অর্থাৎ জালন্ধর, হোসিয়ারপুর, লুধিয়ানা প্রভৃতি স্থানে সিন্ধু সমভূমির দুই-তৃতীয়াংশ অংশে ভুট্টা উৎপন্ন হয়। **তুলা**ঃ শতদ্রু নদীর দক্ষিণাঞ্চলে ফিরোজপুর, ভাতিন্দা, হিসার প্রভৃতি অঞ্চলে সর্বাধিক তুলা জন্মে। এই সকল অঞ্চলে দেশী তুলা এবং লুধিয়ানা, পাতিয়ালা, অমৃতসর, কর্ণাল প্রভৃতি অঞ্চলে আমেরিকান তুলার চাষ হয়। এখানে জলসেচের সাহায্যে তুলার চাষ হয়। **ইক্ষু**ঃ রোটাক ও কর্ণাল জেলায় জলসেচের সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে ইক্ষু উৎপন্ন হয়। ইহার পর গুরদাসপুর, জালন্ধর, গুরগাঁও প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। **বাদাম**ঃ ইহা প্রধানতঃ লুধিয়ানা এবং সংগৌর, কপুরতলা, জালন্ধর, পাতিয়ালা অঞ্চলের ফসল।

জলসেচঃ মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ হইতে বহু দূরে অবস্থিতির দরুন এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই কম। সেইজন্য এখানে নানা প্রকারের সেচ ব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। জালন্ধর ও ঘাঘারা-শতদ্রুর মধ্যবর্তী অঞ্চলে নলকূপের সাহায্যে প্রাচীনকাল হইতে সেচকার্য হইয়া আসিতেছে। ফিরোজপুর, ভাতিন্দা, সংগৌর প্রভৃতি অঞ্চলে খালের দ্বারা জলসেচ হয়। শতদ্রু নদীর ভাকরা ও নাঙ্গাল নামক স্থানে বাঁধ দিয়া জল সঞ্চয় করিয়া এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজনমত সেই জল ব্যবহার করিবার জন্য এই অঞ্চলে ভাকরা-নাঙ্গাল নামক বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। ইহার ফলে সমগ্র সিন্ধুসমভূমি, বিশেষতঃ হিসার জেলা বিশেষ উপকৃত হইয়াছে।

খনিজ সম্পদঃ সমভূমি অঞ্চলে বিশেষ কোন প্রকার খনিজ দ্রব্য নাই। একমাত্র লৌহ, চূণাপাথর ও শ্লেটপাথরই এখানে সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। **লৌহ**ঃ দক্ষিণের আরাবল্লী পর্বত সন্নিহিত অঞ্চলে (ধানাউটা-ধানচোলি) সামান্য পরিমাণে লৌহ-শিলা পাওয়া যায়। **চূণাপাথর**ঃ ইহা আম্বালা ও মহেন্দ্রগড় জেলায় পাওয়া যায় এবং নিকটবর্তী সিমেণ্ট শিল্পে ব্যবহৃত হয়। সঞ্চিত দ্রব্যের পরিমাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **শ্লেটপাথর**ঃ গুরগাঁও ও মহেন্দ্রগড় জেলা এই খনিজে সমৃদ্ধ। স্থানীয় শিল্পে ইহার বিশেষ চাহিদা আছে।

শিল্পজ সম্পদঃ কয়লা ও লৌহের একান্ত অভাব থাকায় এই অঞ্চলে শিল্পের প্রকৃতি কিছুটা ভিন্নধর্মী। দিল্লী অঞ্চলে সর্বাধিক শিল্পসংস্থা প্রতিষ্ঠিত। ইহার

পরে গুরগাঁও, অমৃতসর, লুধিয়ানা, আম্বালা, জালন্ধর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই অঞ্চলের শিল্পগুলি প্রধানতঃ পাঞ্জাবের অমৃতসর-ধারিওয়াল-হোসিয়ারপুর-জালন্ধর-লুধিয়ানা এবং হরিয়ানার হিসার-রোটাক-ফরিদাবাদ-দিল্লী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ।
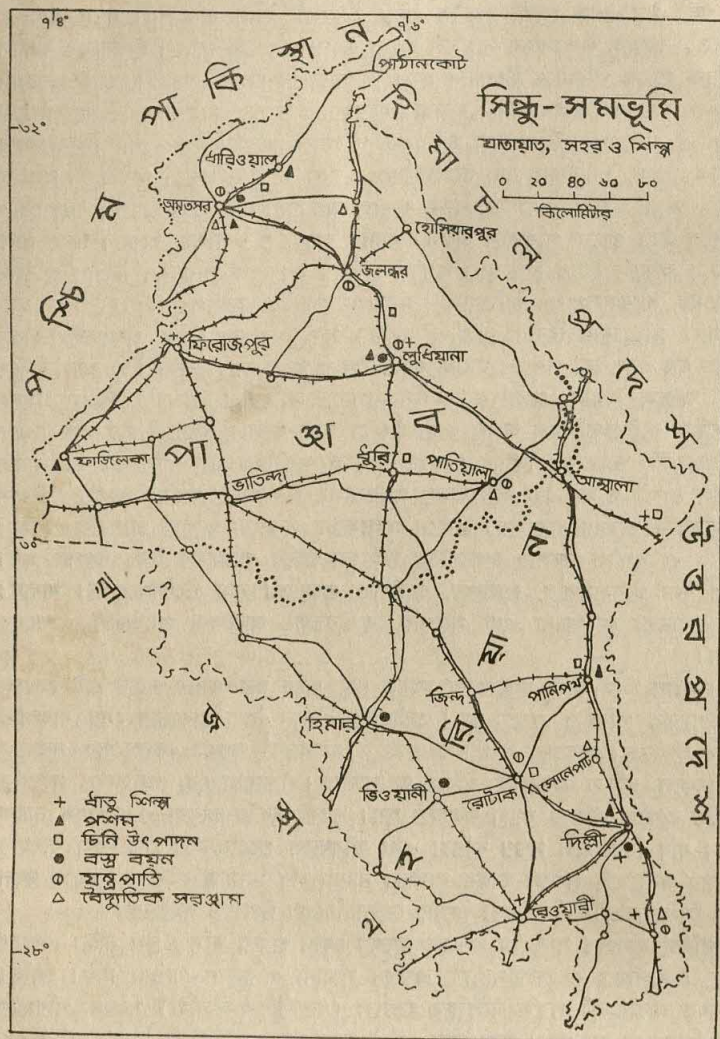
বয়ন শিল্পঃ অমৃতসর, লুধিয়ানা, হিসার, ভিওয়ানী, দিল্লী প্রভৃতি অঞ্চলে কার্পাস বয়ন ; লুধিয়ানা, নীলোখেরী, অমৃতসর, দিল্লী অঞ্চলে রেশম বয়ন ; লুধিয়ানায় হোসিয়ারী, ধারিওয়াল, ফাজিলকা, খরার, পানিপথ অঞ্চলে পশম শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। **কৃষিজ ভিত্তিক শিল্পঃ** হোসিয়ারপুর, ফাগোয়ারা, ধুরি, জগধারী

প্রভৃতি অঞ্চলে চিনি শিল্প ; জালন্ধর, জগধারী প্রভৃতি অঞ্চলে শর্করা শিল্প ; রাজপুর ও পাতিয়ালায় ময়দা শিল্প ; অমৃতসর, যমুনাগড় ও দিল্লী অঞ্চলে তৈল শিল্প ; অমৃতসর ও দিল্লীতে ফলসংরক্ষণ শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **খনিজ-ভিত্তিক শিল্পঃ** সুরজপুর, দাদরি, অঞ্চলে সিমেণ্ট শিল্প, নাঙ্গালে সার উৎপাদন ; লুধিয়ানা, মালেরকোটলা আম্বালা, ফরিদাবাদ, বাহাদুরগড়, দিল্লী অঞ্চলে ধাতুশিল্প ; সোনাপেট অঞ্চলে ইস্পাত শিল্প ; বাহাদুরগড়, পালওয়ান, সোনাপেট অঞ্চলে খনিজ লবণ উৎপাদন ; অমৃতসর, মালেরকোটলা প্রভৃতি স্থানে রসায়ন দ্রব্য উৎপাদিত হইয়া থাকে। **কারিগরী শিল্পঃ** অমৃতসর, সোনাপেট, বাহাদুরগড়, ফরিদাবাদ অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরঞ্জাম ; রোটাক ও বাহাদুরগড় অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ ; অমৃতসর, কপুরতলা, পাতিয়ালা অঞ্চলে কৃষিযন্ত্র ; জালন্ধর, লুধিয়ানা, রোটাক অঞ্চলে সেলাই মেশিন ; ধুরি বাহাদুরগড়, ফরিদাবাদ, অমৃতসরে সাইকেল ও সাইকেল যন্ত্রাংশ নির্মাণ প্রভৃতি শিল্প আছে। **অরণ্য ভিত্তিক শিল্পঃ** জগধারীতে সাধারণ কাগজ শিল্প ; ফরিদাবাদে বিশেষ ধরনের কাগজ ; যমুনানগরে করাত কল ; দিল্লী, ফরিদাবাদ অঞ্চলে রবার দ্রব্য উৎপাদন ; হোসিয়ারপুরে তার্পিন তৈল ও বার্নিশ প্রভৃতি শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ সড়ক ও রেলপথের উন্নতির জন্যই এই অঞ্চলটি নানা সমস্যা সত্ত্বেও এত দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিয়াছে। সীমান্তের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থান হওয়ায় পাঁচটি দিল্লীমুখী জাতীয় সড়ক এই অঞ্চলে প্রসারিত হইয়াছে। জাতীয় সড়ক ১০ ও উত্তরের গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উত্তর রেলপথের প্রধান ও অপ্রধান শাখাপথগুলি আম্বালা-শিরহিন্দ-নাঙ্গাল-জালন্ধর-মাধোপার এবং জালন্ধর-লুধিয়ানা-ধুরি-পানিপথ-জিন্দ-হিসার হইয়া রাজস্থানের দিকে এবং অপর একটি শাখা পাকিস্তানের দিকে গিয়াছে। চণ্ডীগড় ও অমৃতসর বিমানপথের সাহায্যে দিল্লী-শ্রীনগর ও সিমলার সহিত যুক্ত হইয়াছে।

উচ্চ গঙ্গা সমভূমি

৩. সাংস্কৃতিক পরিচয়

জনসংখ্যাঃ এই সমভূমির ১৫০০ বর্গ কিলোমিটার পরিমিত এলাকায় প্রায় ৪৫ মিলিয়ন লোকের বাস হওয়ায় এখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ৩০০ জন। ইহা ভারতের মধ্যে সর্বাধিক জনসংখ্যাযুক্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে অন্যতম। সাধারণভাবে মীরাট, মোরাদাবাদ, বেরিলী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, কানপুর প্রভৃতি অঞ্চলে সর্বাধিক জনসংখ্যা দেখা যায়। উত্তর সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে লোকসংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। অন্যত্র প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ২৫০—৫০০ জন লোক বাস করে।

জনসংস্কৃতিঃ কর্মসংস্থানের সুবিধার জন্য এই অঞ্চলে বহু বহিরাগতের সমাগম হইয়াছে। সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ কৃষি ও কৃষি সংক্রান্ত কাজ, প্রশাসন, শিক্ষা, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদিতে নিযুক্ত আছে। কৃষিকাজই এই অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। স্ত্রী-কর্মীর সংখ্যাও প্রচুর। সমগ্র অধিবাসীর প্রায় ১৮ শতাংশ শিক্ষিত, কোন কোন অঞ্চলে ইহা ৩০ শতাংশ পর্যন্ত

দেখা যায়। কানপুর, লক্ষ্ণৌ, মীরাট, আগ্রা প্রভৃতি অঞ্চলে সর্বাধিক শিক্ষিত লোকের বাস। অধিবাসীদের প্রধান ভাষা হিন্দী ও উর্দু।

গ্রাম ও শহরঃ সমগ্র অধিবাসীর ৮১.৫ শতাংশ জনসংখ্যা সমভূমির ক্ষুদ্র-বৃহৎ ৫২০৩৯টি গ্রামে বাস করে। সাহারানপুর, মথুরা ও মীরাট অঞ্চলের গ্রামগুলিতে সর্বাধিক গ্রামীণ জনবসতি দেখা যায়। অপরপক্ষে রোহিলখন্ড, তরাই, আলিগড়, কানপুর, এলাহাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে গ্রামীণ জনসংখ্যা খুবই কম। অবশিষ্ট জনসংখ্যা এই অঞ্চলের ক্ষুদ্র-বৃহৎ ৬৪টি শহরে বাস করে। তুলনামূলকভাবে গঙ্গা নদীর দক্ষিণাঞ্চলে অধিক শহরবাসী কেন্দ্রীভূত হইয়াছে এবং গঙ্গা-যমুনা দোয়াবের উত্তরপশ্চিমেই সর্বাধিক শহর গড়িয়া উঠিয়াছে।

লক্ষ্ণৌ (৬৫৫৬৭৩) ঃ শহরটি গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত এবং উত্তর-প্রদেশের অন্যতম বাণিজ্য কেন্দ্ররূপে খ্যাত। নানাপ্রকার শৌখীন ধাতুদ্রব্য, কাঠের কাজ, হাতীর দাঁতের কাজ প্রভৃতির জন্যও শহরটি প্রসিদ্ধ। রেলকেন্দ্র ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। **এলাহাবাদ** (৪৩০৭৩০) ঃ গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী নদীর সঙ্গমস্থলে এই শহরটি অবস্থিত। রেল ও বিমান কেন্দ্র এবং হিন্দুদের তীর্থস্থানরূপে প্রসিদ্ধ। এখানে চিনি, তৈল, ময়দা প্রস্তুত হয়। **কানপুর** (৯৭১০৬২) ঃ গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত এই শহরটি শিল্পকেন্দ্র রেলকেন্দ্র ও বিমানকেন্দ্র রূপে খ্যাত। এখানে চর্ম, পশম, রসায়ন, তৈল, পাট, রেশম, বিমান নির্মাণ প্রভৃতি শিল্প আছে। এখানে একটি সেনানিবাসও আছে। **আলিগড়**ঃ দুগ্ধজাত দ্রব্য, ছুরি, তালা, কাঁচি, পিতল-কাঁসার বাসন ইত্যাদির জন্য বিখ্যাত। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে· **মীরাট** (২৮৩৯৯৭) ঃ গঙ্গা-যমুনা দোয়াবে অবস্থিত এই শহরটি বাণিজ্য ও শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে একটি সেনানিবাস ও বিশ্ববিদ্যালয় আছে। **আগ্রা** (৫০৫৬৮০)ঃ যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক শহর। শিক্ষাকেন্দ্র ও সেনানিবাসরূপে খ্যাতি আছে। এখানে তুলা সংক্রান্ত শিল্প, কার্পেট, তৈলকল, ময়দা, লৌহ প্রভৃতি শিল্প আছে। বিশ্ববিখ্যাত তাজমহল এই স্থানেই অবস্থিত। **বেরিলী** (২৭২৮২৮)ঃ রামগঙ্গা নদীর বামতটে অবস্থিত, রোহিলখন্ডের প্রধান শহর। প্রশাসনিক কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধ হইলেও এখানে চিনি, তার্পিন, রবার, দেশলাই ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি নির্মিত হয়। **অন্যান্য শহর**ঃ এতদ্ব্যতীত সমভূমির বিভিন্ন অংশে মোরাদাবাদ, মৈনপুরী, মথুরা, বুলন্দসর, ইটাহ্, সাহারানপুর, এটাওয়া, সীতাপুর, রায় বেরিলী প্রভৃতি শহর বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৪। আর্থিক পরিচয়

কৃষিজ সম্পদঃ কৃষি ও কৃষি সংক্রান্ত কাজ দ্বারাই এই অঞ্চলের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। আগ্রা, মথুরা, আলিগড়, সাহারানপুর, মুজঃফরনগর, এটাহ্, কানপুর প্রভৃতি অঞ্চলগুলি নানাবিধ কৃষিজ উৎপাদনে সমৃদ্ধ। নানাপ্রকার খাদ্য-শস্য ব্যতীত এখানে তৈলবীজ, ইক্ষু, তুলা প্রভৃতি পণ্যশস্যও চাষ হয়। **গম**ঃ প্রধান কৃষিজ দ্রব্য এবং সমগ্র কর্ষিত জমির ১/৫ অংশে ইহার চাষ হয়। সমগ্র অঞ্চলেই ইহা উৎপন্ন হইলেও মোরাদাবাদ, মীরাট, বুদায়ুন প্রভৃতি স্থানে ইহার প্রাধান্য বেশী। **ধান**ঃ গুরুত্ব অনুসারে গমের পরেই ধানের স্থান। ইহা বাহ্‌রাইচ, পিলি-ভিত, ফৈজাবাদ, গোন্ডা, প্রতাপগড় প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। মুজঃ-ফরনগর, বিজনর ও সাহারানপুরে ইহা ইক্ষুর সহিত, এটাওয়ায় গমের সহিত এবং

সাজাহানপুরে ছোলার সহিত উৎপন্ন হয়। **বাজরা** ঃ বুলন্দসর, আলিগড়, মথুরা, আগ্রা, মৈনপুরী, মোরাদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে ইহার চাষ হয়। **ভুট্টা** ঃ গোণ্ডা, বাহ্‌রাইচ, নৈনী, মীরাট, আলিগড়, ফরাক্কাবাদ, এটাহ্‌ প্রভৃতি অঞ্চল ভুট্টা উৎপাদনের জন প্রসিদ্ধ। **জোয়ার** ঃ মথুরা, কানপুর, ফতেপুর, রায়বেরিলী, হার্দোই, সাজাহানপুর, ফরাক্কাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে ইহা উৎপন্ন হয়। **ডাল**ঃ এই সমভূমির সর্বত্র ছোলা, মটর, মুসুর, মুগ, অড়হর প্রভৃতি নানাবিধ ডাল অন্যান্য ফসলের সহিত উৎপন্ন করা হয়। তবে মথুরা, আগ্রা, রামপুর, সুলতানপুর, মীরাট অঞ্চলে ইহার উৎপাদন অধিক। **তৈলবীজ** ঃ মোরাদাবাদ-হার্দোই-সীতাপুর-লক্ষ্ণৌ
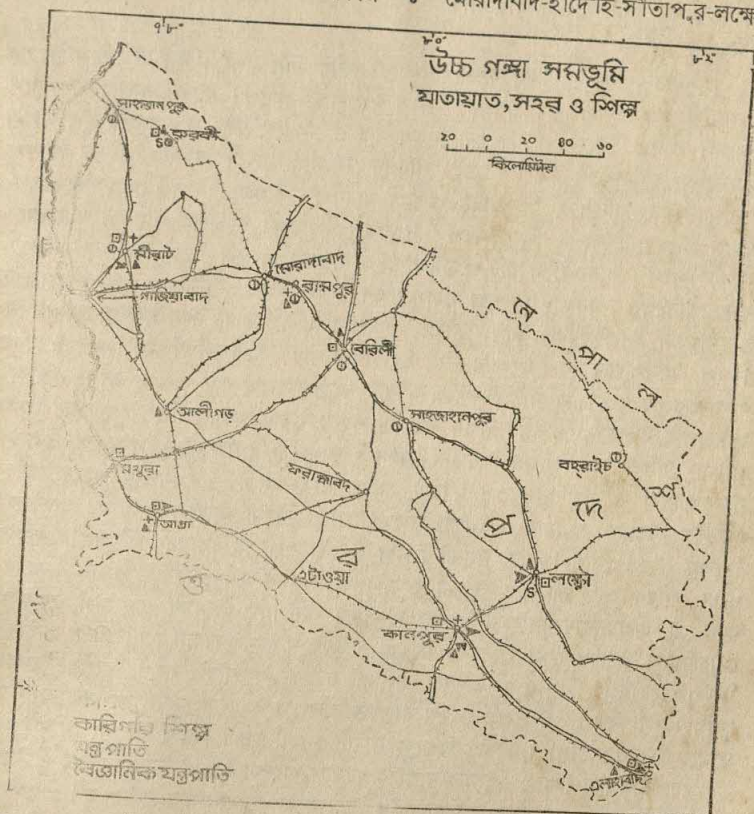
অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বাদাম ; বাহ্‌রাইচ-গোণ্ডা-খেরী এবং মথুরা হইতে কানপুর পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় সরিষার চাষ হয়। **পণ্যশস্য** ঃ সাহারানপুর, মুজঃফরনগর, মীরাট, বুলন্দসর, বিজনর, মোরাদাবাদ অঞ্চলে ইক্ষু ; মুজঃফরনগর হইতে মথুরা পর্যন্ত ভূখণ্ডে প্রচুর তুলা ; তরাই অঞ্চলের খেরী-বাহ্‌রাইচ প্রভৃতি স্থানে পাট চাষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সেচ ব্যবস্থাঃ এই অঞ্চলের সেচব্যবস্থা বিশেষ উন্নত। মুজঃফরনগর, মীরাট, বুলন্দসর অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা উন্নত জলসেচ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। মোরাদাবাদ,

বদায়ুন, বিজনর, এটাওয়া, খেরী, বাহরাইচ, কানপুর, আলিগড় প্রভৃতি অঞ্চলে কূপের সাহায্যে; মীরাট, বুলন্দসর, রামপুর, মুজঃফরনগর অঞ্চলে নলকূপের সাহায্যে; এলাহাবাদ, সাজাহানপুর, বেরিলী, গোণ্ডা প্রভৃতি স্থানে জলাশয়ের মাধ্যমে জলসেচ হয়। এই অঞ্চলের সেচ খালগুলির মধ্যে যমুনা খাল, উচ্চ গঙ্গা খাল, নিম্ন গঙ্গা খাল বিশেষ উল্লেখযোগ। এই সকল খাল দ্বারা সন্নিহিত অঞ্চলগুলি বিশেষভাবে উপকৃত হয়।

খনিজ সম্পদঃ এই অঞ্চলে চূণাপাথর ও কাঁচ প্রস্তুতের বালি ব্যতীত অন্য কোন খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায় না। তরাই অঞ্চলে খনিজ তৈল ও গ্যাস পাইবার সম্ভাবনা আছে।

শিল্পজ সম্পদঃ খনিজ সম্পদের অপ্রতুলতার জন্য এখানে কৃষিজ, বনজ দ্রব্যকে ভিত্তি করিয়া নানাপ্রকার কারিগরী শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এই এলাকার পশ্চিমাংশ শিল্পে যথেষ্ট উন্নত। এখানে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বৃহদায়তন শিল্প না থাকিলেও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে এই স্থানটি বিশেষ উন্নত। **কৃষিজ-ভিত্তিক শিল্প**ঃ সাহারানপুর, কানপুর, বাহরাইচ অঞ্চলে ধানকল; রামপুর, গাজিয়াবাদ, আলিগড়, আগ্রা অঞ্চলে তৈল প্রস্তুত শিল্প; কানপুর, বেরিলী, সাহারানপুর ও আলিগড়ে ময়দা শিল্প; রুরকী, মীরাট, মোরাদাবাদ, বেরিলী অঞ্চলে চিনি শিল্প; গাজিয়াবাদ, আলিগড়, কানপুর অঞ্চলে ফলসংরক্ষণ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বৃহদায়তন শিল্পগুলির মধ্যে মীরাট, রামপুর, এলাহাবাদ, কানপুর অঞ্চলে বয়নশিল্প, কানপুরের পাটশিল্পের নাম উল্লেখযোগ্য। **অরণ্য-ভিত্তিক শিল্প**ঃ বনজ সম্পদকে কেন্দ্র করিয়া সাহারানপুর, মীরাট, আগ্রা, এলাহাবাদ অঞ্চলে কাগজ শিল্প; সীতাপুর, লক্ষ্ণৌ, বেরিলী আগ্রা প্রভৃতি শহরে করাত কল, বেরিলীতে রবার শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। **খনিজ-ভিত্তিক শিল্প**ঃ কানপুর, গাজিয়াবাদ, হাথরাস, এলাহাবাদ অঞ্চলে কাঁচদ্রব্য প্রস্তুত; মীরাট, মোরাদাবাদ, আগ্রা ও কানপুর শহরে লৌহজাতীয় ধাতুদ্রব্য, আলিগড়, আগ্রা, সাহারানপুর, মীরাট অঞ্চলে নানাবিধ ধাতুশিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **কারিগরী শিল্প**ঃ এই অঞ্চলের বিবিধ কারিগরী শিল্পের মধ্যে গাজিয়াবাদ, রামপুর, আগ্রা, আলিগড় অঞ্চলে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম নির্মাণ; কানপুর, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, বেরিলী শহরে যন্ত্রপাতি নির্মাণ; লক্ষ্ণৌ, বেরিলী, মোরাদাবাদ অঞ্চলে রেল সংক্রান্ত শিল্প; কানপুর, গাজিয়াবাদ, আলিগড়ে সাইকেল শিল্প; বেরিলী, কানপুর, অঞ্চলে রাসায়নিক দ্রব্য সংক্রান্ত শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **বিবিধ**ঃ এই সকল শিল্প ব্যতীত কানপুর, আগ্রার চর্মশিল্প, সাহারানপুরে তামাক শিল্প, কানপুর-মীরাট অঞ্চলে নানাবিধ কারিগরী শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

যোগাযোগ-ব্যবস্থাঃ এই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত। উত্তর ও উত্তর-পূর্ব রেলপথের শাখাপথ দ্বারা যাবতীয় উল্লেখযোগ্য স্থান যুক্ত হইয়াছে। তুলনায় সড়কপথ ততখানি উন্নত হয় নাই। মূল সড়কপথটি দিল্লী-মীরাট-রামপুর-বেরিলী-সাজাহানপুর-সীতাপুর-লক্ষ্ণৌ-ফৈজাবাদ-গোরখপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। অপর একটি সড়কপথ বারাণসী -এলাহাবাদ-কানপুর-আগ্রা-মথুরা-দিল্লী অবধি গিয়াছে। লক্ষ্ণৌ হইতে একটি সড়কপথ মধ্যপ্রদেশের দিকে প্রসারিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কানপুর, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, এলাহাবাদ—চারিটি শহরই বিমানপথের উপর অবস্থিত। সম্প্রতি গাজিয়াবাদে একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর স্থাপনের প্রস্তাব চলিতেছে।

মধ্যগঙ্গা সমভূমি

৩। সাংস্কৃতিক পরিচয়

জনসংখ্যা ঃ মধ্যগঙ্গা সমভূমির ১৪৪৯৬১ বর্গকিলোমিটার পরিমিত এলাকায় প্রায় ৫৬ মিলিয়ন লোক বাস করে। সুতরাং এই অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৩৮৪ জন। এই বিপুল জনসংখ্যা এই অঞ্চলের পক্ষে সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। উত্তরের হিমালয় পাদদেশ অঞ্চল ও দক্ষিণে মালভূমি সন্নিহিত অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র অঞ্চলে বসতি গড়িয়া উঠিলেও সামগ্রিক বিচারে সমভূমির পশ্চিমাংশ (উত্তরপ্রদেশের পূর্বাংশ) অপেক্ষা পূর্বাংশেই (বিহার) অর্থাৎ কোশী-মিথিলা সমভূমি ও মগধ-অঙ্গ সমভূমিতে অধিক জনবসতি দেখা যায়।

জনসংস্কৃতি ঃ জীবিকার নানা উপায় থাকায় এই অঞ্চলে প্রচুর বহিরাগতের সমাগম হইয়াছে। সমগ্র জনসংখ্যার ৪০ শতাংশই কর্মে নিযুক্ত আছে। এই অঞ্চলে নানা প্রকার শিল্প সংগঠন থাকিলেও ৮০ শতাংশ কর্মীই কৃষি ও কৃষি সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত। চাকুরী ও ক্ষুদ্রশিল্পে শতকরা ১৩ জন এবং অবশিষ্ট কর্মী ব্যবসা-বাণিজ, যানবাহন প্রভৃতি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। হিন্দী এই অঞ্চলের প্রধান ভাষা হইলেও ভোজপুরী, মৈথিলী প্রভৃতি হিন্দী-জাত শব্দগুলিও এখানে প্রচলিত আছে। শিক্ষার প্রসার তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

গ্রাম ও শহর ঃ সমগ্র জনসংখ্যার ৯৩ শতাংশ সমভূমির ৭৩৫৬২ ক্ষুদ্রবৃহৎ গ্রামে বাস করে। জৌনপুর, মুঙ্গের ও ভাগলপুর ব্যতীত এই অঞ্চলের সমগ্র গ্রামগুলেই

জনসংখ্যা বর্তমানে কমিতেছে। সমগ্র গঙ্গা সমভূমির মধ্যে এই অংশটিই সর্বাপেক্ষা স্বল্প শহরায়িত অঞ্চল। তুলনামূলক গঙ্গার দক্ষিণ অংশে অধিক শহরবাসী দেখা যায়। সমভূমির পশ্চিমাংশে উত্তরপ্রদেশের বারাণসী এবং পূর্বাংশে বিহারের পাটনা ব্যতীত অন্য শহরগুলি নিতান্তই ক্ষুদ্র।

বারাণসী (৪৮৯৮৬৪) **ঃ** গঙ্গার তীরে অবস্থিত হিন্দুদের বিখ্যাত তীর্থস্থান এবং রেশম, পিতল ও অন্যান্য কুটিরশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে তৈল, ময়দা,

চিনি প্রস্তুত শিল্প এবং একটি ডিজেল রেল-ইঞ্জিনের কারখানা আছে। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **গোরক্ষপুর** (১৮০২৫৫) তাপ্তী নদীর তীরে অবস্থিত উত্তর-পূর্ব রেলপথের সদর দপ্তর। এখানে ইক্ষু, চিনি, ময়দা শিল্প আছে। কাঠের জন্য ইহা প্রসিদ্ধ। **মীর্জাপুর** : উত্তরপ্রদেশের গঙ্গা তীরে অবস্থিত একটি কুটিরশিল্পপ্রধান শহর। কার্পেট, মাটির বাসন, পিতল ও তাম্র-বাসন, ছুরি-কাঁচি ইত্যাদির জন্য প্রসিদ্ধ। **পাটনা** (৩৬৪৫৯৪) : গঙ্গার তীরে অবস্থিত বিহারের রাজধানী এবং মধ্যগঙ্গা সমভূমির দ্বিতীয় বৃহৎ শহর। বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তর ও বসতি এলাকা ছাড়াও এই শহরটি খাদ্যশস্য ও কুটিরশিল্পের পাইকারী বাণিজ্য কেন্দ্র রূপে খ্যাত। **ভাগলপুর** (১৪৩৮৫০) : বিহারে অবস্থিত প্রাচীন অঙ্গ রাজ্যের রাজধানী চম্পা, বর্তমানে ভাগলপুর নামে পরিচিত। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, রেশম শিল্প কেন্দ্র, নানাবিধ বাণিজ্য ও হস্তশিল্প কেন্দ্ররূপে এই শহরের খ্যাতি আছে। **মজঃফরপুর** (১০৯০৪৮) বুড়ি গণ্ডক নদীর তীরে উত্তর বিহারের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রশাসনিক শহর। ভূমিকম্পের ফলে

বিভিন্ন সময়ে এই শহরটির নানা ক্ষতি হইলেও কৃষি ও বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে ইহার গুরুত্ব আছে। **মতিহারী** (৩৪৬০২) : বুড়ি গণ্ডক নদীর পরিত্যক্ত প্রবাহের তীরে বিহারের চম্পারন জেলার প্রধান শহর। ইহা মূলতঃ প্রশাসনিক ও বাণিজ্য শহর। অন্যান্য : বিহারের গঙ্গা তীরবর্তী মুঙ্গের দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি বাণিজ্য শহর, তীর্থ শহর গয়া, কৃষি প্রধান শহর ছাপরা এবং উত্তরপ্রদেশের রেলওয়ে শহর মোগলসরাই, কৃষি প্রধান শহর জৌনপুর, শিল্পশহর গাজিপুর প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৪। আর্থিক পরিচয়

কৃষিজ সম্পদ : কৃষি কাজ অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা হইলেও এই অঞ্চলের অর্থনীতি এখনও বিশেষ অনুন্নত। সমভূমির পশ্চিমাংশে কৃষি-জমির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশী। খাদ্যশস্য ব্যতীত সামান্য পণ্যশস্যও উৎপন্ন করা হয়। **ধান** : উত্তরপ্রদেশের উত্তরে ও পূর্বে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। দক্ষিণাংশের সম-

ভূমিতে ইহার উৎপাদন কম। বিহারের গয়া, সাহাবাদ, পূর্ণিয়া, চম্পারন প্রভৃতি অঞ্চলে ইহার চাষ হয়· **গম** ঃ বিহারের গয়া, সাহাবাদ, উত্তর মুঙ্গের, দক্ষিণ দ্বারভাঙ্গা এবং উত্তরপ্রদেশের আজমগড়, সুলতানপুর, বস্তি, গোরখপুর অঞ্চলে অন্য ফসলের সহিত চাষ করা হয়। **ভুট্টা** ঃ বিহারের সারান, চম্পারন, মুজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা, পূর্ণিয়া, মুঙ্গের এবং উত্তরপ্রদেশের বালিয়া, জৌনপুর, গোন্ডা প্রভৃতি অঞ্চলে অন্য ফসলের সহিত চাষ করা হয়। **বার্লি** ঃ বিহারের সারান, চম্পারন, মুজঃফরপুর এবং উত্তরপ্রদেশের বারাণসী, জৌনপুর ও বালিয়া অঞ্চলে ইহা উৎপন্ন হয়। **তৈলবীজ** ঃ বিহারের পূর্ণিয়া, গয়া, সাহাবাদ, চম্পারন এবং উত্তরপ্রদেশের নানা অংশে তৈলবীজ উৎপাদন করা হয়। **ইক্ষু** ঃ বিহারের সাসারাম, বক্সার, ছাপরা প্রভৃতি স্থানে এবং উত্তরপ্রদেশের দেওরিয়া, বালিয়া, মির্জাপুর অঞ্চলে ইক্ষু চাষ হইয়া থাকে। **পাট** ঃ বিহারের পূর্ণিয়া, সহর্স জেলায় এই সমভূমির যাবতীয় পাট উৎপন্ন হয়।

সেচকার্য ঃ এই অঞ্চলের কৃষি কাজের ক্ষেত্রে সেচ ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য। উত্তরপ্রদেশের গঙ্গা-ঘর্ঘরা দোয়াব, বালিয়া, গাজিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে এবং বিহারের গঙ্গার দক্ষিণাংশের সমভূমিতে জলসেচ করা হইয়া থাকে। বিহারের সমগ্র কর্ষিত জমির ৩৩ শতাংশ এবং উত্তরপ্রদেশের সমগ্র কর্ষিত জমির ৩৭ শতাংশ কৃষিকাজ হইয়া থাকে। উত্তর ও দক্ষিণ বিহারের সমভূমিতে খালের মাধ্যমে এবং উত্তরপ্রদেশে কূপ ও নলকূপের সাহায্যে জলসেচ হয়।

খনিজ সম্পদ ঃ সড়ক নির্মাণের উপযোগী কংকর ও মৃৎশিল্পের উপযোগী কর্দম ব্যতীত এই অঞ্চলে অন্য কোন উল্লেখযোগ্য মূল্যবান খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায় না।

শিল্পজ সম্পদঃ কোন প্রকার খনিজ সম্পদ না থাকায় এই অঞ্চলে কৃষি-ভিত্তিক শিল্পের যথেষ্ট প্রসার হইয়াছে। আমদানী করা দ্রব্য লইয়া ধাতু-ভিত্তিক শিল্পগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সমভূমির পশ্চিমাংশ অপেক্ষা পূর্বাংশে অধিক শিল্পোন্নয়ন হইয়াছে।

কৃষি-ভিত্তিক শিল্প ঃ সমগ্র সমভূমির বলরামপুর, পূর্ণিয়া, সীতামারী, ডালমিয়ানগর প্রভৃতি অঞ্চলে চালকল : ফৈজাবাদ, গোরখপুর, ডালমিয়ানগর, দানাপুর অঞ্চলে তৈলশিল্প, কাটিহার, বারাউনি, সমস্তিপুর, গোরখপুর অঞ্চলে পাটশিল্প : জৌনপুর, পাটনা, মোকামা, বারাণসী, গোরখপুর অঞ্চলে বয়ন শিল্প ; পাটনা ও বারাণসী শহরে বয়ন শিল্প ; সমগ্র উত্তরাংশে অসংখ্য চিনি কল আছে। **খনিজ-ভিত্তিক শিল্প**ঃ গোরখপুর বারাণসী অঞ্চলে সার প্রস্তুত, দ্বারভাঙ্গা, পাটনা, বেতিয়া, গোরখপুর, জৌনপুর, বারাণসী অঞ্চলে ধাতু ও ইস্পাত শিল্প ; ডালমিয়ানগরে সিমেণ্ট শিল্প ; বারাউনিতে খনিজ তৈল শোধনাগার এবং অন্যত্র রাসায়নিক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। **অরণ্য-ভিত্তিক শিল্প** ঃ মজঃফরপুর, সমস্তিপুর, ডালমিয়ানগরে কাগজমণ্ড ; গোরখপুর, মজঃফরপুর, হাজিপুর অঞ্চলে প্লাইউড প্রভৃতি ; বারাউনি মজঃফরপুর, বেতিয়া, গয়া অঞ্চলে করাত কল প্রভৃতি শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **কারিগরী শিল্প**ঃ গোরখপুর, পাটনা, ডালমিয়ানগর, পূর্ণিয়া, মুঙ্গের, সমস্তিপুর, জামালপুর, দানাপুর, মোকামা প্রভৃতি অঞ্চলে চর্ম, মোটর, সাইকেল ও নানাবিধ কারিগরী শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

যোগাযোগ-ব্যবস্থা ঃ গঙ্গা সমভূমির এই অংশটি যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক দিয়া বিশেষ উন্নত। উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব-রেলপথের শাখাপথ দ্বারা এই সমভূমির

প্রধান শহরগুলি যুক্ত হইয়াছে বলিয়া আর্থিক সম্পদ পরিবহণের ক্ষেত্রে এই অঞ্চল বিশেষ উন্নতি করিতে পারিয়াছে। কয়েকটি প্রধান জাতীয়-সড়ক (কলিকাতা-বারাণসী-গোরখপুর, পাটনা-মুঙ্গের-খাগারিয়া) ব্যতীত অসংখ্য শাখাপথ দ্বারা এই সমভূমি অঞ্চলের বিভিন্ন অংশ যুক্ত হইয়াছে। কলিকাতা-বারাণসী, কলিকাতা-মুঙ্গের বিমান পথ দুইটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গঙ্গা নদীর কোন কোন অংশ আভ্যন্তরীণ জলপথ রূপে ব্যবহৃত হয়।

নিম্নগঙ্গা সমভূমি

৩। সাংস্কৃতিক পরিচয়

জনসংখ্যাঃ নিম্নগঙ্গা সমভূমির ৮১০০০ বর্গকিলোমিটার পরিমিত এলাকায় ৩৩.৫ মিলিয়ন লোক বাস করে। এখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৪১৪ জন বাস করে বলিয়া ইহাকে ভারতের সর্বাধিক ঘনবসতি এলাকার অন্যতম বলা যাইতে পারে। ব-দ্বীপের প্রধান অংশে (নদীয়া, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি জেলা) সর্বাধিক জনবসতি দেখা যায়, অবশিষ্টাংশ রাঢ় ও উত্তরবঙ্গের অধিবাসী। ইহার অন্তর্গত কলিকাতা জেলায় জনসংখ্যার ঘনত্ব হইল প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ২৮২৫৬ জন।

জনসংস্কৃতি ঃ এই অঞ্চলে বেকারের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী (শতকরা ৬৭ জন)। সমগ্র জনসংখ্যার মাত্র ৩৩ শতাংশ বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত আছে। জীবিকা অর্জনের নানাপ্রকার সুযোগ থাকায় এখানে প্রচুর বহিরাগতের সমাগম হইয়াছে। সমগ্র কর্মীর প্রায় অর্ধাংশ কৃষি ও কৃষি সংক্রান্ত কর্মে লিপ্ত ; অবশিষ্টের ৫ শতাংশ খনি শ্রমিক ; ব্যবসা ও পরিবহণ ইত্যাদিতে ১১ শতাংশ এবং নানাবিধ শিল্পে ও খনি-সংক্রান্ত কাজে ১৮ শতাংশ কর্মী নিযুক্ত আছে। বৃহত্তর কলিকাতা অঞ্চলে কৃষি কর্মীর সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। এই অঞ্চলের শিক্ষিতের হার মাত্র শতকরা ২৯ জন, যদিও এই অঞ্চলে ৭টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। কলিকাতা, হাওড়া, হুগলী, নদীয়া ও বর্ধমানে সর্বাধিক সংখ্যক শিক্ষিত লোকের বাস (মূলতঃ বাঙালী অধ্যুষিত অঞ্চল হইলেও প্রচুর বহিরাগতের আগমনের ফলে এখানে ভাষা, ধর্ম ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক বিচিত্র সংস্কৃতির উদ্ভব হইয়াছে।

গ্রাম ও শহর ঃ সমগ্র জনসংখ্যার ৭৫ শতাংশই সমভূমির রাঢ়-ব-দ্বীপ—উত্তর-বঙ্গের প্রায় ৩০০০০ ক্ষুদ্র-বৃহৎ গ্রামে বসবাস করে। তন্মধ্যে ব-দ্বীপ অঞ্চলের গ্রামীণ জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী। অবশিষ্ট জনসংখ্যা এই অঞ্চলের প্রধানতঃ বৃহত্তর কলিকাতাসহ হুগলী নদীর দুই তটে, আসানসোল দুর্গাপুর অন্ডাল এবং শিলিগুড়ি, দার্জিলিং অঞ্চলে বর্ধিষ্ণু জনপদ গড়িয়া তুলিয়াছে। কলিকাতা, হাওড়া, বর্ধমান, আসানসোল, শিলিগুড়ি শহর ব্যতীত এখানে ক্ষুদ্র-বৃহৎ ১৭৬টি শহর আছে। ইহাদের গুরুত্ব নিম্নরূপঃ

প্রশাসনিক ঃ বর্ধমান, সিউড়ি, চুঁচুড়া, বাঁকুড়া, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর প্রভৃতি। **শিল্পশহর ঃ** বজবজ, টিটাগড়, নৈহাটি, বালী, শ্রীরামপুর, কোন্নগর এবং হুগলী নদীর উভয় তীরস্থ শহরগুলি। **খনি শহর ঃ** রাণীগঞ্জ, আসানসোল, বরাকর প্রভৃতি। **রেলপথ ও রেল-সংক্রান্ত ঃ** রাণাঘাট, খড়্গপুর, কাঁচরাপাড়া, চিত্তরঞ্জন, নৈহাটি প্রভৃতি। **ঐতিহাসিক প্রাচীন শহরঃ** বিষ্ণুপুর, মুর্শিদাবাদ, গৌড়

প্রভৃতি। **ভ্রমণ ও স্বাস্থ্যকর স্থানঃ** দার্জিলিং, কালিম্পং, দীঘার সমুদ্র সৈকত, বকখালি, ডায়মণ্ডহারবার প্রভৃতি। **নদীতীরবর্তী বাণিজ্য শহর ঃ** ডায়মণ্ডহারবার, ক্যানিং, বসিরহাট প্রভৃতি। **ধর্ম-কেন্দ্রিক শহর ঃ** তারকেশ্বর, ত্রিবেণী, নবদ্বীপ প্রভৃতি। **কুটিরশিল্প প্রধান শহরঃ** শান্তিপুর, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, কাটোয়া, বোলপুর প্রভৃতি। **উদ্বাস্তু অধ্যুষিত শহর ঃ** যাদবপুর, বনগ্রাম ও অন্যান্য নানা অঞ্চল। **নব-নির্মিত শহরঃ** দুর্গাপুর, বাটানগর (শিল্পপ্রধান), কল্যাণী (বসতি কেন্দ্র), হলদিয়া (বন্দর) প্রভৃতি।

কলিকাতা (২৯২৭২৮৯)ঃ পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী ও পূর্ব ভারতের প্রাণ-কেন্দ্র। ক্ষুদ্র-বৃহৎ অসংখ্য শিল্প, নানাপ্রকার সরকারী দপ্তর ও বন্দর ও বাণিজ্য কেন্দ্র ; সড়কপথ ও রেলপথের প্রধান কার্যালয়—ইত্যাদি নানাকারণে ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শহরটির আয়তন ৯২ বর্গকিলোমিটার, তবে ইহার আয়তন ক্রমেই বাড়িতেছে। কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উন্নতিসাধনের জন্য উত্তরে ও দক্ষিণে গঙ্গার উভয় তীরের বারুইপুর-উলুবেড়িয়া এবং বাঁশবেড়িয়া-কল্যাণী পর্যন্ত এলাকা লইয়া বৃহত্তর কলিকাতা জেলা (Calcutta Metropolitan District) গঠন করা হইয়াছে। এই সংস্থা শহরের অভ্যন্তরে সড়কপথ পুনর্বিন্যাস, বসতি অঞ্চল পরিকল্পনা, আবর্জনা অপসারণ ব্যবস্থা প্রভৃতি নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজে অগ্রসর হইয়াছে। অনুরূপভাবে উত্তরবঙ্গেও শিলিগুড়ি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য একটি বিশেষ সংস্থা গঠিত হইয়াছে।

৪। আর্থিক পরিচয়

কৃষিজ সম্পদ ঃ এই ব-দ্বীপ অঞ্চল শিল্পাঞ্চল রূপে খ্যাত হইলেও, ইহার আর্থিক কাঠামো কিন্তু এখনও কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল। কারণ দেশের প্রায় ৭০ শতাংশ জমিতেই নানাবিধ চাষ হইয়া থাকে। উত্তরবঙ্গের শিল্পের তেমন প্রসার না হওয়ায় ইহাকে কৃষিপ্রধান বলা চলে। ধান ও পাট ব্যতীত এই অঞ্চলে নানাবিধ পণ্য শস্যও উৎপন্ন হয়।

ধান ঃ রাজ্যের সর্বত্রই ইহার ফলন হইলেও মেদিনীপুর, মালদহ, কুচবিহার, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম অঞ্চলে আমন ধান এবং হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগণা প্রভৃতি অঞ্চলে বোরো ধান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **পাটঃ** ভারতের সমগ্র পাট উৎ-পাদনের একটি বৃহৎ অংশ এই সমভূমিতে উৎপন্ন হয়। চব্বিশ পরগণা, নদীয়া প্রভৃতি অঞ্চলে পাট উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। **ইক্ষু ঃ** নদীয়া, বর্ধমান, বীরভূম হুগলী অঞ্চলে যথেষ্ট ইক্ষু উৎপন্ন হয়। **ডাল ঃ** হাওড়া, বর্ধমান, পশ্চিম দিনাজপুর বাঁকুড়া, মালদহ অঞ্চলে নানাবিধ ডাল উৎপন্ন হয়। **তৈলবীজ ঃ** মালদহ (তিল, সরিষা), মুর্শিদাবাদ (তিসি), নদীয়া (তিসি, তিল, সরিষা) প্রভৃতি অঞ্চলে নানাবিধ তৈলবীজ উৎপন্ন হয়। **তামাক ঃ** বাঁকুড়া, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুরের তামাক উৎপাদন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **গম ঃ** মালদহ, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে গম চাষ করা হয়। **ভুট্টা ঃ** বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে ভুট্টার উৎপাদন হয়। **চা ঃ** দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চা উৎপাদন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **বিবিধ ঃ** এতদ্ব্যতীত এই সমভূমির প্রায় সর্বত্রই নানাবিধ সব্জী, ফল প্রভৃতি উৎপাদন করা হয়। সুন্দরবন অঞ্চলে তুলার চাষ শুরু হইয়াছে।

সেচ-ব্যবস্থা ঃ এই সমভূমির জলসেচ ব্যবস্থা তেমন উন্নত নয়। বর্ষার প্রাচুর্য থাকিলেও তাহা অনিয়মিত এবং শীতকাল শুষ্ক বলিয়াই কৃষি ক্ষেত্রে জলসেচনের একান্ত প্রয়োজন। দামোদর ও ময়ূরাক্ষী নদীতে বাঁধ নির্মাণের ফলে অবশ্য অনেক সুবিধা হইয়াছে। সরকারী খালের দ্বারা বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, হুগলী, মুর্শিদাবাদের অনেক জমিতে জলসেচন করা সম্ভব হইয়াছে। অবশিষ্ট জমিতে বিল, জলাশয় প্রভৃতি দ্বারা জলসেচ করা হয়। নদীয়া, মালদহ ও কুচবিহারে কূপের সাহায্যে জলসেচন হয়। মুর্শিদাবাদ, ২৪ পরগণা, হুগলী, মালদহ অঞ্চলের জমিতে জলসেচের দ্বারা দুইবার ফসল উৎপন্ন করা হয়। উপরোক্ত নদী পরিকল্পনা ব্যতীত বাঁকুড়া জেলার কংসাবতী পরিকল্পনা এবং মুর্শিদাবাদ জেলার গঙ্গা বাঁধ পরিকল্পনার, উত্তরবঙ্গে তিস্তা পরিকল্পনার কথাও বিশেষ উল্লেখযোগ। এই সকল বাঁধ নির্মাণ কার্য শেষ হইলে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ক্ষেত্রের চিত্র আরও উজ্জ্বল হইবে।

প্রাণীজ সম্পদ ঃ মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের বিশেষ গুরুত্ব আছে। ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের নদী হইতে প্রচুর পরিমাণে রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবোস প্রভৃতি মৎস্য পাওয়া যায়। সুন্দরবনে নদী মোহনার খাঁড়ি হইতে চিংড়ি, ভেটকী, ইলিশ, পমফ্রেট ইত্যাদি মৎস্য শিকার করা হয়। সমুদ্র উপকূল হইতে প্রচুর সামুদ্রিক মৎস্য পাওয়া যায়। দীঘা ও জুনপুটে মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। হাসনাবাদ, ইটিন্ডাঘাট, ক্যানিং, কোলাঘাট, লালগোলা প্রভৃতি মৎস্য-বন্দররূপে খ্যাত। এতদ্ব্যতীত সমভূমির প্রায় সর্বত্রই গো-মহিষ ইত্যাদি পালন করা হইয়া থাকে, ইহাদের উৎপাদন তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

অরণ্য সম্পদ ঃ বনজ দ্রব্য উৎপাদন নিম্ন সমভূমি অঞ্চল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুন্দরবন অঞ্চলে সুঁদরি, গরান, গেঁউয়া প্রভৃতি বৃক্ষ এবং মোম, মধু, নারিকেল, গোলপাতা, হোগলা প্রভৃতি সংগৃহীত হয়। উত্তর হিমালয় পাদদেশের অরণ্য হইতে পাইন, ফার প্রভৃতি নরম কাঠযুক্ত বৃক্ষ, তার্পিন তৈল, রজন ইত্যাদি পাওয়া যায়। পশ্চিমাংশের লালমাটি অঞ্চলের অরণ্য শাল, সেগুন, মহুয়া, খয়ের, বাঁশ প্রভৃতি বৃক্ষসম্পদে সমৃদ্ধ। এই অরণ্যের পলাশ, কুল প্রভৃতি বৃক্ষে লাক্ষা কীট প্রতিপালন করা হয়। মালদহ, মুর্শিদাবাদ জেলায় তুঁত বৃক্ষ হইতে রেশম-কীট সংগৃহীত হয়। সম্প্রতি নদীয়া, ২৪ পরগণা প্রভৃতি জেলার নানা স্থানে সংরক্ষিত অরণ্য স্থাপিত হইয়াছে। উত্তরবঙ্গে জলদাপাড়ার সংরক্ষিত অরণ্যে প্রচুর বন্য প্রাণী বাস করে।

খনিজ সম্পদ ঃ সামগ্রিক বিচারে এই অঞ্চল খনিজ সম্পদে তেমন সমৃদ্ধ নয়। যাবতীয় খনিজ সম্পদ উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স, পশ্চিমের রাঢ় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। **কয়লা ঃ** পশ্চিমবঙ্গের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কয়লাখনি বর্ধমান জেলার আসানসোল, রাণীগঞ্জ অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। বাঁকুড়া ও দার্জিলিং জেলাতেও নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা পাওয়া যায়। **লৌহ ঃ** উত্তরে ডুয়ার্স অঞ্চলে সামান্য পরিমাণে, পশ্চিমের রাণীগঞ্জ অঞ্চলে ও অন্যান্য নানাস্থানে বিভিন্ন প্রকৃতির লৌহ-আকরিক পাওয়া যায়। এই সকল খনির লৌহ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। **বিবিধ ঃ** এতদ্ব্যতীত, ডুয়ার্স অঞ্চলে তামা, গৌরাংডি, বরাকর, সিউড়িতে ফায়ার ক্লে, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার নানাস্থানে সোপস্টোন, অভ্র, লৌহ-ম্যাঙ্গানিজ, গন্ধক ইত্যাদি

পাওয়া যায়। সম্প্রতি এই সমভূমির নানাস্থানে খনিজ তৈলের অনুসন্ধান চলিতেছে।

শিল্পজ সম্পদ ঃ উপরোক্ত কৃষিজ, বনজ ও খনিজ সম্পদ ভিত্তি করিয়া এই অঞ্চলের শিল্পসংস্থাগুলি রাজ্যের সর্বত্র স্থাপিত হইলেও ইহারা প্রধানতঃ আসান-সোল-রাণীগঞ্জ-দুর্গাপুর এবং হুগলী নদীর দুই তটে উন্নতি লাভ করিয়াছে।

কৃষিজ ভিত্তিক শিল্প ঃ মুর্শিদাবাদ, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় পাটের উৎপাদন হইলেও হুগলী নদীর উভয় তীরে পাট শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। এই অঞ্চলটি বস্ত্র-শিল্পের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় সকল জেলাতেই খাদ্য সংক্রান্ত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। উত্তরবঙ্গ ও মুর্শিদাবাদে তামাক শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মালদহ ও মুর্শিদাবাদ রেশম বস্ত্র উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। হরিণঘাটার দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **অরণ্যভিত্তিক শিল্প ঃ** চব্বিশ পরগণা (টিটাগড়, কাঁকিনাড়া), বর্ধমান ও কলিকাতায় কাগজ শিল্প, বজবজ এবং অন্যত্র প্লাইউড নির্মাণ, বাঁশবেড়িয়া ও ডানলপে টায়ার শিল্প। এতদ্ব্যতীত দেশলাই, মোমবাতি ইত্যাদি নানাপ্রকার শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। **কারিগরী শিল্প ঃ** কাঁচড়াপাড়া, কোন্নগর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন অঞ্চলে রেল ও মোটর সংক্রান্ত কারখানা, ২৪ পর-গণা ও হাওড়া, কলিকাতা অঞ্চলে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, হাওড়া, নদীয়া ও বর্ধমানে নানাবিধ ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প, ইছাপুর ও কাশীপুরে বন্দুক ও গুলি নির্মাণ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **বিবিধ ঃ** এতদ্ব্যতীত কুটিরশিল্প হিসাবে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প, মেদিনীপুরের মাদুর, বিষ্ণুপুরের শংখ, শান্তিপুর, ফরাস-ডাঙ্গা ধনেখালি অঞ্চলে তাঁতের কাপড় ; মালদহ, বিষ্ণুপুরে রেশমী বস্ত্র ; কাটোয়া, খাগড়ায় পিতল-কাঁসার বাসন, বাটানগরের চর্মশিল্প প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

যোগাযোগ-ব্যবস্থা ঃ আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও এই সমভূমির যাতায়াত ব্যবস্থা তেমন অনুন্নত নয়। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের প্রধান কেন্দ্র কলিকাতায় অবস্থিত। শিয়ালদহ ও হাওড়া ষ্টেশন দিয়া পূর্ব ভারতের সর্বত্র যাতায়াত করা যায়। দক্ষিণপূর্ব রেলপথ হাওড়া, মেদিনীপুর হইয়া উড়িষ্যায় প্রসারিত এবং পূর্ব রেলপথের দুইটি শাখা হুগলী নদীর দুই তীর বরাবর প্রায় সমান্তরাল ভাবে উত্তর-বঙ্গ ও বিহারের নানাস্থান পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। জাতীয় সড়ক ৩৪, গ্র্যান্ড-ট্রাংক রোড, বারাকপুর ট্রাংক রোড, ডায়মণ্ডহারবার রোড, মেদিনীপুরের ৬নং জাতীয় সড়ক (কলকাতা-বোম্বাই রোড) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সড়কপথ ইহাদের সহিত যুক্ত হইয়াছে। আভ্যন্তরীণ জলপথের গঙ্গা ও অন্যান্য নদীগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দমদম বিমানবন্দরের মাধ্যমে ভারতের সর্বত্র যাতায়াত করা যায়।

৪
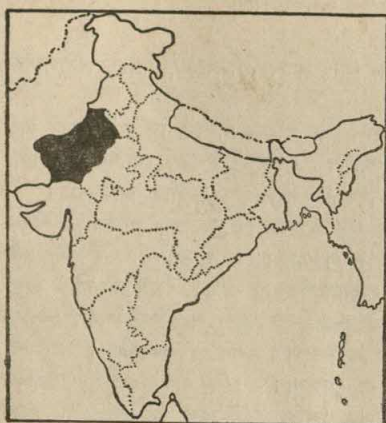
।। মরু ও মরুপ্রায় অঞ্চল ।।

১। সাধারণ পরিচয়

ভূমিকা ঃ ভারতের পশ্চিম সীমান্তে ও পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের (পাকিস্তান) পূর্ব সীমান্তে বিশাল থর মরুভূমি অবস্থিত। এই মরুভূমির পূর্ব অংশ মরুস্থলী নামে (ভারতের অন্তর্ভুক্ত) এবং ইহার পূর্বে আরাবল্লী পর্বতের পশ্চিমের সমগ্র অংশ বাগর নামে খ্যাত। এই দুইটি ভৌগোলিক অঞ্চলই বর্তমান রাজস্থান রাজ্যের পশ্চিমাংশের অন্তর্গত, কিন্তু রাজস্থানের পূর্ব অংশ ভূপ্রকৃতির ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যের জন্য উদয়পুর-গোয়ালিয়র মালভূমির অন্তর্গত ধরা হইয়াছে। মরুস্থলী অঞ্চল বালিয়াড়ী ও স্বল্প বৃষ্টিপাত দ্বারা চিহ্নিত এবং বাগর অঞ্চল ইহার ন্যায় মরু-প্রকৃতির নয় বলিয়া ইহাকে মরুপ্রায় অঞ্চল বলা যাইতে পারে।

অবস্থান ও আয়তন ঃ এই অঞ্চলটি ২৪°৩০′ উত্তর হইতে ৩০°০২′ উত্তর এবং ৬৯°১৫′ পূর্ব হইতে ৭৬°৪৫′ পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহা ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত। সমগ্র অঞ্চলটির আয়তন ১৯৬৭৪৭ বর্গ কিলোমিটার। ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের জন্য রাজস্থান রাজ্যের পশ্চিমের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ অংশ লইয়া এই মরু ও মরুপ্রায় অঞ্চলটি গঠিত হইয়াছে।

সীমা ঃ ইহার ভৌগোলিক সীমা হইল পশ্চিমে থর মরুভূমির পশ্চিমাংশ, দক্ষিণে কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ের অন্তরীপ অঞ্চল, পূর্বে গোয়ালিয়র-উদয়পুর মালভূমি অঞ্চল এবং সমগ্র উত্তরপূর্ব অঞ্চলে গাঙ্গেয় সমভূমি। রাজনৈতিক দিক হইতে এই মরু ও মরুপ্রায় অঞ্চলটি পশ্চিমে পশ্চিম পাকিস্তান, দক্ষিণে গুজরাট, দক্ষিণ-পশ্চিমে রাজস্থানের পূর্ব অংশ এবং সমগ্র উত্তরপূর্ব হরিয়ানা রাজ্য দ্বারা সীমিত।

বর্তমান ইতিহাস ঃ পূর্বে এই অঞ্চলে রাজপুত ও অন্যান্য জাতিগণ রাজত্ব করিলেও স্বাধীনতার পর কয়েকটি পর্যায়ে এই রাজ্য গঠনের কাজ সম্পূর্ণ হয়। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি অঞ্চল লইয়া মৎস্য ইউনিয়ন এবং আরও কতকগুলি অঞ্চল লইয়া রাজস্থান ইউনিয়ন গঠিত হয়। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে রাজস্থান ইউনিয়নের সহিত যোধপুর, জয়পুর ও বিকানীরকে সংযুক্ত করিয়া বৃহত্তর রাজস্থান ইউনিয়ন গঠন করা হয় এবং মৎস্য ইউনিয়ন ইহার সহিত সংযুক্ত হয়। অবশেষে ১৯৫৬

খৃষ্টাব্দে রাজ্য পুনর্গঠনের সময়ে আজমীর, পূর্বতন বোম্বাই রাজ্যের আবুরোড তালুক ও পূর্বতন মধ্যভারত রাজ্যের সুনেল তাপ্পা ইহার সহিত সংযুক্ত করিয়া বর্তমান রাজস্থান রাজ্য গঠন করা হয়। তবে ইতিপূর্বে ইহার অন্তর্গত কোটা জেলা মধ্যপ্রদেশে স্থানান্তরিত করা হয়।

অঞ্চল পরিচয় ঃ বর্তমান রাজস্থান রাজ্যের যে সকল জেলা লইয়া এই মরু ও মরুপ্রায় অঞ্চল গঠন করা হইয়াছে, তাহা হইল, (১) জয়সলমীর, (২) বারমার, (৩) যোধপুর, (৪) বিকানীর, (৫) জালোর, (৬) নাগোর, (৭) গঙ্গানগর, (৮) চুরু, এবং তৎসহ (৯) পালি, (১০) সিকার ও (১১) ঝুনঝুনু জেলার পশ্চিম অংশ। ইহার অবশিষ্ট জেলাগুলিকে (উদয়পুর, জয়পুর প্রভৃতি) ভিন্নতর ভূ-প্রকৃতির জন্য উদয়পুর-গোয়ালিয়র মালভূমির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

২. প্রাকৃতিক পরিচয়

ভূপ্রকৃতিঃ সমগ্র মরু অঞ্চলটি পূর্ব হইতে পশ্চিমে এবং উত্তর হইতে দক্ষিণে ঢালু হইয়া গিয়াছে। সর্বোচ্চ (৩০০—৪৫০ মিটার) অঞ্চলটিতে চুরু, ঝুনঝুনু নাগোর প্রভৃতি শহর অবস্থিত এবং দক্ষিণে লুনি নদী অববাহিকায় সর্বনিম্ন (১৫০ মিটারের কম) অঞ্চল দেখা যায়। ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সমগ্র মরুস্থলী ও বাগর অঞ্চলকে নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ

(১) **বালুময় অঞ্চলঃ** সর্বপশ্চিম প্রান্তটি বালিয়াড়ী দ্বারা আবৃত। ইহা দক্ষিণে কচ্ছের রণ হইতে পশ্চিম পাকিস্তানের সীমানা বরাবর অবস্থিত মরুস্থলী অঞ্চল এখানে তিন প্রকারের বালিয়াড়ী দেখা যায়ঃ (ক) সাহারা বা আরবীয় মরুর ন্যায় গঠিত দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে উত্তর-পূর্ব দিক বরাবর, (খ) গড়ে ১৫০ মিটার প্রস্থ ও ১৫ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট তুর্কীস্থানের মরুভূমির ন্যায় অর্ধচন্দ্রাকারে গঠিত বালিয়াড়ী, (গ) মরুস্থলীর উত্তরে ও পূর্বাংশে বায়ু প্রবাহের গতিপথে প্রায় পূর্ব-পশ্চিম দিক বরাবর গঠিত বালিয়াড়ী। (২) **প্রস্তরময় অঞ্চলঃ** ইহার পূর্ব দিকে আছে অপেক্ষাকৃত বালুকামুক্ত প্রস্তরময় অঞ্চল। জয়সলমীর-বিকানীর-বারমার প্রভৃতি শহর এখানে অবস্থিত। জয়সলমীরের উত্তরে কতকগুলি প্লায়া হ্রদ আছে। এগুলি সারা বৎসরই শুষ্ক থাকে। এই অঞ্চলে গ্রিট, কংগ্লোমারেট, সিষ্ট, নীস প্রভৃতি প্রস্তর দেখা যায়। (৩) **ক্ষুদ্র মরু অঞ্চলঃ** ইহার পূর্বে আছে ক্ষুদ্র মরু অঞ্চল। এই অঞ্চলে পূর্বে আলোচিত বৃহৎ মরুর সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্যই দেখা যায়। বিকানীরের উত্তরে আসিয়া এই ক্ষুদ্র মরু অঞ্চল বাগরের সহিত মিশিয়াছে। (৪) **বাগর অঞ্চল ঃ** রাজস্থান সমভূমির (বা মরুভূমির) পূর্বতম প্রান্তে বাগর অঞ্চল অবস্থিত. ইহা একটি মরুপ্রায় অঞ্চল এবং লুনি নদী ইহার দক্ষিণ-পূর্ব অংশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুর প্রভাবে এখনকার ভূত্বকে বালির আবরণ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। তবে পলির প্রভাব বেশী।

নদ-নদীঃ এই অঞ্চলের একমাত্র নদী লুনি আরাবল্লী পর্বতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণ পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। সুকরী ও জারাই আরাবল্লী হইতে আগত ইহার দুইটি উল্লেখযোগ্য শাখানদী। একমাত্র বর্ষাকালেই এই নদী কচ্ছের রণ অঞ্চলের সহিত মিলিত হইতে পারে। অন্য সময় ইহাতে যথেষ্ট জল থাকে না। এই নদী ছাড়া জয়সলমীরের উত্তরাংশে প্লায়া নামে একপ্রকার হ্রদ দেখা যায়। ইহারা এই নদীর জলেই পুষ্ট হয় তবে সারা বৎসর জল থাকে না।

জলবায়ুঃ সারা বৎসর প্রচুর উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতহীনতাই এই অঞ্চলের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহাই ভারতের সর্বাধিক তাপযুক্ত অঞ্চল। খুব কদাচিৎ তাহা নিম্নগামী হয় এবং শীতে কুয়াশা হওয়া এখানে বিরল ঘটনা। গ্রীষ্মের উত্তাপ ৪০ সে.-এর উপর হয়, মরুস্থলী অঞ্চলে ৫০°সে.ও হইয়া থাকে। মার্চ মাস হইতে উত্তাপ বাড়িতে বাড়িতে মে ও জুন মাসে সর্বোচ্চ হয় এবং প্রায় অক্টোবর পর্যন্ত এই অবস্থা থাকে। এই অঞ্চলের শীতকালীন (ডিসেম্বর-জানুয়ারী) গড় উত্তাপ মাত্র ১৩°সে.

বৃষ্টিপাত ঃ বৃষ্টিপাত খুবই অল্প, ক্ষণস্থায়ী ও অনিয়মিত, বিশেষতঃ মরুস্থলী অঞ্চলে তো বটেই। ভারত-পাকিস্তান সীমান্তবর্তী অঞ্চলে গড় বৃষ্টিপাত ১০ সে. মি. এবং জয়সলমীর ২১ সে. মি. পূর্বাঞ্চলে ৩৫—৪০ সে. মি.। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পূর্ব হইতে পশ্চিমে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে উত্তর-পূর্ব দিকে কমিয়া গিয়াছে। এমন অনেক স্থান আছে যেখানে আদৌ বৃষ্টিপাত হয় না। উদাহরণ-স্বরূপ ১৯৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্বের আট বৎসর জয়সলমীরে বৃষ্টিপাত হয় নাই।

স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জঃ অধিকাংশ অঞ্চলেই ক্ষুদ্রকায় গুল্মজাতীয় কাঁটাগাছ জন্মে। শুষ্ক অঞ্চলে বাবলা ও বিভিন্ন প্রকারের শমীবৃক্ষ জন্মে। বাবলা গাছ সর্বাধিক পরিমাণে জন্মে ও ইহা পশুখাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। এই সকল বৃক্ষ বহুদিন জল না পাইলেও প্রস্তর ও বালুময় অঞ্চলেও অতি সহজে জীবন ধারণ করে।

মৃত্তিকাঃ এই অঞ্চলের মৃত্তিকা গড়ে ৯২ শতাংশ বালি এবং ৮ শতাংশ কাদা দ্বারা গঠিত। মূলতঃ পলি দ্বারা গঠিত হইলেও এখানে নিম্নানুরূপ মৃত্তিকা দেখা যায়ঃ (১) **মরু ও রক্তবর্ণ মরু মৃত্তিকাঃ** ইহা গঙ্গানগর, বিকানীর, যোধপুর, ঝুনঝুনু, চুরু, জালোর প্রভৃতি অঞ্চলে দেখা যায়। মরু মৃত্তিকায় লবণের ভাগ অধিক এবং রক্তবর্ণ মরুমৃত্তিকা জলসেচ হইলে কৃষিকাজের উপযোগী। (২) **বাদামী বালি মৃত্তিকাঃ** এই মৃত্তিকা দ্বারা পালি ও নাগোর জেলা গঠিত। ইহাতে কাদা ও দোঁয়াশের মিশ্রণ আছে, চুনও অল্পবিস্তর পাওয়া যায়। ইহা স্টেপ অঞ্চলের মৃত্তিকার ন্যায় এবং কৃষিকাজের বিশেষ উপযোগী (৩) **পলি মৃত্তিকাঃ** দক্ষিণ গঙ্গানগর, লুনি অববাহিকা প্রভৃতি অঞ্চলে ইহা দেখা যায়, ইহা দেখিতে রক্তবর্ণ, তবে স্বল্প চুন, ফসফরাস ও জৈবপদার্থ, যুক্ত বলিয়া কৃষিকাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। (৪) **লবণাক্ত মৃত্তিকাঃ** বারমার, জয়সলমীর, বিকানীর প্রভৃতির রণ অঞ্চলে এই মৃত্তিকা দেখা যায়। অধিক লবণের জন্য এই মৃত্তিকা কৃষিকাজের অনুপযোগী। এখানে শুধু একপ্রকার ঘাস জন্মে।

৩. সাংস্কৃতিক পরিচয়

জনসংখ্যাঃ রাজস্থান সমভূমির মরুস্থলী ও বাগর অঞ্চলে প্রায় ৬৪,৭১,০৬০ (১৯৬১) লোক বাস করে। সুতরাং এখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৩৩ জন লোকের বাস। আয়তন বিশাল হইলেও জনসংখ্যা পূর্বাংশে মরুপ্রায় বা বাগর অঞ্চলেই বেশী এবং ইহা ক্রমেই পশ্চিমাংশে মরুস্থলী অঞ্চলের দিকে কমিয়া গিয়াছে। মরুস্থলী (বা মরু) অঞ্চলের জনসাধারণ জলাশয় কেন্দ্র করিয়া বিক্ষিপ্ত ভাবে বসবাস করে। বাগর অঞ্চলে বালিয়াড়ী কম ও জলসেচের সুবিধা আছে। এখানে

জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে গড়ে ৯০ জন, কিন্তু মরুস্থলী অঞ্চলে মাত্র ২০ জন।

জনসংস্কৃতিঃ সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় ৫০ শতাংশ বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত আছে। মরুপ্রায় অঞ্চলের অধিবাসীদের শতকরা ৭৫ জনই কৃষিকাজ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। পশ্চিমাংশে মরুস্থলীর অধিবাসীদের একটি বৃহৎ অংশ পশু পালন করিয়া থাকে। শহরাঞ্চলে নানাবিধ বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প থাকিলেও, তাহার মাধ্যমে খুব বেশী লোকের অন্ন সংস্থান হয় না। এই অঞ্চলের শতকরা ২০ জন শিক্ষিত, ইহারা অধিকাংশ চুরু, বিকানীর, গঙ্গানগর, যোধপুর প্রভৃতি শহরে বাস করে।

গ্রাম ও শহরবাসীঃ মরুস্থলী ও বাগর অঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় ৪৮০০ গ্রামে সমগ্র জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ লোক বাস করে। ঝুনঝুনু, পালি, সিকার প্রভৃতি জেলার কোন কোন গ্রামে জনসংখ্যার (গড়ে ৭৫০০ জন) দিক দিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবশিষ্ট ২০ শতাংশ লোক ৬২টি ক্ষুদ্র বৃহৎ শহরে বাস করে। উত্তরাঞ্চলেই শহরগুলি কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, অধিকাংশ শহরই আয়তনে ক্ষুদ্র। যোধপুর (২,২৪,৭৬০) ও বিকানীর (১,৫০,৬৩৪) শহর দুইটি নগর City পর্যায়ভুক্ত। গঙ্গানগর, সিকার প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর শহর। নিম্নে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শহরাঞ্চলের বিবরণ দেওয়া হইলঃ

যোধপুরঃ (২,২৪,৭৬০) লুনি অববাহিকায় অবস্থিত রাও যোধ কর্তৃক ইহা প্রশাসনিক কেন্দ্ররূপে স্থাপিত হয়। তিনদিকের পার্বত্য অঞ্চল শহরটিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইতে রক্ষা করে। ইহা জেলার প্রধান শহর। বর্তমানে এখানে রাসায়নিক ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, কারিগরী শিল্প ও পশম শিল্প প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। যোধপুর হইতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পথ বারমার, পালি, নাগৌর প্রভৃতি শহরের দিকে প্রসারিত হইয়াছে। ইহা জিপসাম খনিজ দ্রব্যের জন্য প্রসিদ্ধ। **বিকানীরঃ** (১৫০৬৩৪) রাও বিকা কর্তৃক ইহা প্রশাসনিক শহররূপে স্থাপিত হয়। বর্তমানে ইহা বিকানীর জেলার প্রধান শহর। এখানে জিপসামের খনি আছে। এতদ্ব্যতীত রবারদ্রব্য, পশম, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, লৌহ ও ইস্পাত সংক্রান্ত শিল্প প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। জাতীয় সড়কের দ্বারা এই শহরটি ফতেপুর, সিকার প্রভৃতি শহরের সহিত যুক্ত। **গঙ্গানগরঃ** (৬৩,৮৫৪) রাজস্থানের উত্তর অংশে গঙ্গানগর জেলার প্রধান শহর। এখানে তুলা সংক্রান্ত শিল্প, চিনি, লৌহ ও ইস্পাত সংক্রান্ত শিল্প আছে। ইহার নিকটবর্তী হনুমানগড়, গজসিংপুর দুইটি উল্লেখযোগ্য শিল্পকেন্দ্র। **সুজানগড়ঃ** (৩০,৭৬১) বিকানীরের নিকটবর্তী আর একটি শিল্প শহর। এখানে রাসায়নিক দ্রব্য, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্রভৃতি নির্মিত হয়। বিদাসার ও ছাপার ইহার নিকটবর্তী দুইটি শিল্পকেন্দ্র। ইহা ফতেপুর, সিকার প্রভৃতি শহরের সহিত সড়কপথে যুক্ত। **বারমারঃ** (২৭,৬০০) রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অবস্থিত এই শহরটি যোধপুরের সহিত রেলপথের দ্বারা যুক্ত। এখানে জিপসাম, বেন্টানিক (Bentonic) ও চীনামাটি প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়। **অন্যান্য শহরঃ** উল্লিখিত শহরগুলি ব্যতীত জনসংখ্যা ও আর্থিক উন্নতির দিক দিয়া চুরু (৪১,৭২৭), সরদারশহর (৩২০৭২), রত্নগড় (২৬৬৩১), নওলগড় (২৪৯১১), ঝুনঝুনু (২৪৬৯২), রামগড় (১৩৯৫৬), নোহার (১৩৭২৮) প্রভৃতি এবং ইহাদের নিকটবর্তী লাড়নু, নাগৌর, কুচমান প্রভৃতি শহর বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৪. আর্থিক পরিচয়

(ক) **কৃষিজ-সম্পদঃ** বাগর অঞ্চলে কৃষি ভূমির পরিমাণ অধিক। এবং মরুস্থলী অঞ্চলে তুলনায় কম। সমগ্র অঞ্চলের খুব অল্প জমিতেই কৃষিকাজ করা চলে, অধিকাংশই পাতত জমিরূপে পড়িয়া থাকে। খাদ্যশস্য উৎপাদনই এখানকার প্রধান কৃষিজ সম্পদ. (১) **জোয়ার ও বাজরাঃ** এই অঞ্চলের প্রধান খাদ্যশস্য। দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলের পালি, জালোর প্রভৃতি জেলায় এবং উত্তর-পূর্ব অংশের গঙ্গানগর, সিকার প্রভৃতি জেলায় ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। (২) **গম ও বার্লিঃ** গঙ্গানগর, পালি, জালোর প্রভৃতি অঞ্চলে ইহার উৎপাদন অধিক। (৩) **ছোলা ও ডালঃ** নাগোর, যোধপুর, বারমার প্রভৃতি অঞ্চলের প্রধান উৎপাদন সামগ্রী। (৪) **ভুট্টাঃ** গঙ্গানগর প্রভৃতি অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। (৫) **তৈলবীজঃ** নাগোর, যোধপুর, পালি, জালোর প্রভৃতি স্থানে কিছু পরিমাণে তৈলবীজের চাষ হয়। (৬) **তুলা ও আখঃ** ইহা গঙ্গানগর অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়।

সেচকার্যঃ বৃষ্টিপাতহীনতা এই অঞ্চলের কৃষিজ-উন্নতির প্রধান সমস্যা। এবং সমগ্র অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থা যথেষ্ট অনুন্নত। গঙ্গানগর জেলায় খাল-সেচ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে বলিয়া এখানে নানাবিধ ফসল উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ-পূর্ব অংশের কোন কোন অঞ্চলেও কূপ ও জলাশয়ের দ্বারা জলসেচ হইয়া থাকে। বারমার, বিকানীর, জয়সলমীর প্রভৃতি অঞ্চলে কোন প্রকার সেচ ব্যবস্থা নাই।

সুরথগড় কৃষিকেন্দ্রঃ ভারত সরকার ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে গঙ্গানগর জেলায় ঘাগর নদী উপত্যকায় ৩০,৭৬০ একর পরিমিত এলাকায় এই কৃষিকেন্দ্রটি স্থাপন করিয়াছেন। এখানকার পলিমাটি অত্যন্ত উর্বর। নানাবিধ সেচ ব্যবস্থার দ্বারা এখানে ধান্য, বাজরা, জোয়ার, ভুট্টা, গম, বার্লি, ছোলা, সরিষা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত আখ, নানাবিধ ডাল, আলু, ও সব্জীও এখানে হইয়া থাকে। বিজ্ঞান-সম্মত প্রথায় আধুনিক যন্ত্রপাতি, সার ও জলসেচ ব্যবস্থার দ্বারা এই আদর্শ কৃষিকেন্দ্রটিতে ক্রমেই উন্নত পদ্ধতিতে কৃষিকাজ করা হইতেছে।

(খ) **পশু সম্পদঃ** এই অঞ্চলের একটি উল্লেখযোগ্য জনসংখ্যা পশু পালনের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। গরু-মহিষ, ভেড়া, ছাগল, উট প্রভৃতি পশু সর্বত্রই প্রতিপালন করা হইলেও বিকানীর, গঙ্গানগর, সিকার, ঝুনঝুনু প্রভৃতি অঞ্চলে গরু বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। মেষ পালনের জন্য জয়সলমীর, চুরু, জালোর, যোধপুর প্রভৃতি অঞ্চল এবং ছাগল পালনের জন্য বারমার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উট ও মহিষ সর্বত্রই প্রতিপালিত হয়। এই অঞ্চল বিশেষ ধরনের গাভী (নাগোরী, রাথী, হরিয়ানা), মেষ (অঙ্গুল, মলপুরা, জয়সলমীর) ও ছাগল (লোহী, মারওয়ারী) প্রভৃতির জন্য প্রসিদ্ধ।

(গ) **খনিজ সম্পদঃ** রাজস্থানের মরুভূমিতে প্রচুর পরিমাণে খনিজ দ্রব্য পাওয়া গেলেও লৌহ ও অন্যান্য ধাতব খনিজ এই অঞ্চলে একেবারেই নাই। শুধুমাত্র, জিপসাম, লিগনাইট ও ফুলার্স আর্থ (Fuller's earth) নামক খনিজ সম্পদে এই অঞ্চল বিশেষরূপে সমৃদ্ধ। (১) **জিপসামঃ** ভারতের প্রায় ৯০ শতাংশ জিপসাম এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। নাগোর, বিকানীর, যোধপুর অঞ্চলে ইহা প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত আছে। উল্লিখিত জেলার জমসর, লুম, কারানসার, ধীরেরা, সুরথগড় প্রভৃতি অঞ্চল উৎকৃষ্ট জিপসামের জন্য প্রসিদ্ধ। এই জিপসাম বিহারের সিন্ধ্রী সার

কারখানায় প্রেরণ করা হয়। এতদ্ব্যতীত নাগোরের পোহাদোসী, খৈরাৎ, ভাদানা প্রভৃতি অঞ্চল, যোধপুরের ফুলসুন্দ অঞ্চল, জয়সলমীরের মোহনগড়, ধানী, হনুরওয়ালী প্রভৃতি অঞ্চল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতের সিমেণ্ট শিল্পের ক্ষেত্রে রাজস্থান একটি উজ্জ্বল নাম। (২) **লিগনাইটঃ** বিকানীরে সর্বাধিক লিগনাইট সংরক্ষিত আছে। এই অঞ্চলের পালানা সর্ববৃহৎ কেন্দ্র এবং দেশনোথ, খারি চান্নেরী, গংগাসরোবর প্রভৃতি অঞ্চল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিককালে গঙ্গানগর ও বিকানীরে এই লিগনাইট বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা হইতে ভবিষ্যতে আলকাতরা, তৈল, বেনজিন প্রভৃতি তৈয়ারী করা যাইতে পারে। ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে ইহার উৎপাদন ছিল ৫৮৬৪০ টন। ১৯৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে ইহার উৎপাদন
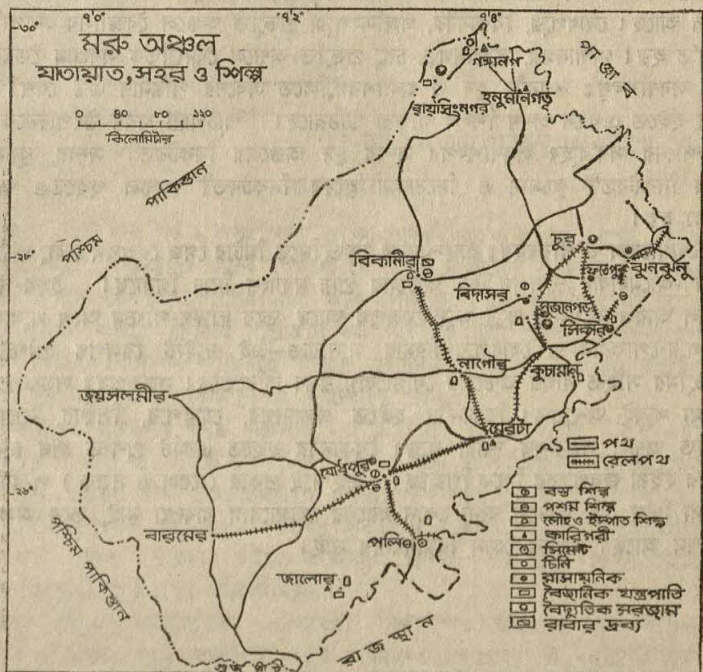
৫০০,০০০ টন পর্যন্ত বর্ধিত হইয়াছে। (৩) **ফুলার্স আর্থ** (Fuller's earth)**ঃ** জাতীয় উন্নতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এই খনিজ দ্রব্যটি বারমার, বিকানীর ও জয়সলমীর অঞ্চলে প্রায় ২০০ মিলিয়ন টন সংরক্ষিত আছে। সমগ্র ভারতের ৮২% ফুলার্স আর্থ এই অঞ্চল হইতেই উত্তোলিত হয়। ইহা বনস্পতি-তৈল শোধন, পেট্রোলিয়াম উৎপাদন প্রভৃতি শিল্পে ব্যবহৃত হয়। ঐ সকল স্থানের মুন্ধ, কপুরদি, আলামারিয়া, সেও মুন্ধা প্রভৃতি অঞ্চল এই খনিজ দ্রব্যে বিশেষ সমৃদ্ধ।

(ঘ) **শিল্পজ সম্পদঃ** কৃষি-সম্পদ প্রধান হইলেও এখানে কৃষিভিত্তিক শিল্প তেমন গড়িয়া উঠে নাই। বৃহদায়তন শিল্পগুলিও উপযুক্ত কাঁচামালের (**বিশেষঃ** লৌহ ইত্যাদি প্রাথমিক কাঁচামালের) অভাবে উন্নতি করিতে পারিতেছে না।

তাপশক্তি অপ্রচুর, যানবাহন সমস্যা প্রকট। শহরগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র ও বিক্ষিপ্ত—এই সকল নানা কারণে এই অঞ্চলের শিল্প-কাঠামো সমস্যাযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। এখানে যে সকল শিল্পসামগ্রী উৎপাদন করা হয় তাহা হইলঃ (১) **কৃষিজ-ভিত্তিকঃ** যোধপুর, নওলগড়, সিকার, বিকানীর, পালি প্রভৃতি স্থানে পশম শিল্প ; বিদাসার, যোধপুর প্রভৃতি স্থানে বস্ত্রবয়ন শিল্প আছে। গঙ্গানগরে চিনি শিল্প এবং বিকানীরে রবার শিল্প বিখ্যাত। (২) **খনিজ-ভিত্তিকঃ** জিপসামের সহজপ্রাপ্যতার জন্য পালি ও অন্যান্য অঞ্চলে সিমেন্ট শিল্প আছে। যোধপুর, বিকানীর, কাডনু, কুচামান প্রভৃতি অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত সংক্রান্ত শিল্প রহিয়াছে। যোধপুর, সুজানগড়, ঝুনঝুনু, ছাপ্পার, বালোত্রা প্রভৃতি অঞ্চলে রাসায়নিক শিল্প, রং ও মুদ্রণ শিল্প উল্লেখযোগ্য। **কারিগরীঃ** জালোর, যোধপুর, গঙ্গানগরে কারিগরী শিল্প আছে। যোধপুর, বিকানীর, গজসিংপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, নির্মিত হয়। গঙ্গানগর, সুজানগড়, চরু প্রভৃতি অঞ্চলে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম তৈয়ারী হয়। **লবণশিল্পঃ** স্থানীয় হ্রদ ও জলাশয়গুলিতে লবণের পরিমাণ এত বেশী যে তাহা হইতে এখানে লবণ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। পাচপাদ্রা লবণ উৎপাদনকেন্দ্র রাজস্থানের সর্ববৃহৎ লবণশিল্প। সম্বর হ্রদ অঞ্চলের নিকটবর্তী সম্বর, কুচমান হ্রদের নিকটবর্তী কুচমান ও দিদোয়ান হ্রদের নিকটবর্তী অঞ্চল হইতেও লবণ উৎপন্ন হয়।

যোগাযোগ ও পরিবহণঃ রাজস্থানের সমভূমিতে মিটার গেজ রেলপথ চালু আছে। দিল্লী-আমেদাবাদ রেলপথ এই অঞ্চলের প্রায় মধ্যাংশ দিয়া গিয়াছে। উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেলপথ আছে, তবে দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ শুধুমাত্র যোধপুর-পোকরান ও যোধপুর-বারমার মুনাবাও—এই দুইটি রেলপথ পশ্চিমের মরুভূমির সহিত বাগর অঞ্চলের যোগাযোগ রক্ষা করিতেছে। **সড়কপথঃ** সড়কপথের অবস্থা খুবই অনুন্নত। বিকানীর হইতে গঙ্গানগর, যোধপুর, সিকার, নাগৌর প্রভৃতি অঞ্চল সড়কপথ দ্বারা যুক্ত। বিকানীর হইতে একটি প্রশস্ত পথ চুরু-সিকার হইয়া জয়পুরের দিকে গিয়াছে। এই দুই প্রকার (রেল ও সড়ক) পরিবহণ ব্যবস্থা ভিন্ন এই অঞ্চলে অন্য কোন ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা নাই, তবে অসংখ্য কাঁচাপথ আছে। এখানে কোন বিমানবন্দর নাই।
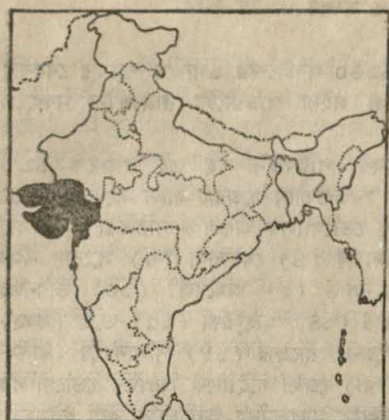
৫

।। কচ্ছ ও কাথিয়াবাড় অন্তরীপ ।।

১. সাধারণ পরিচয়

ভূমিকা: এই অঞ্চলটি মূলতঃ বিন্ধ্য ও আরাবল্লী পর্বত হইতে উৎপন্ন নদীর পলি দ্বারা গঠিত। কচ্ছ ও কাম্বে উপসাগরকে যথাক্রমে উত্তরে ও দক্ষিণে রাখিয়া মধ্যাংশের ভূখন্ড যেন অন্তরীপের ন্যায় আরব সাগরের দিকে প্রসারিত হইয়াছে। সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে হওয়ায় সুপ্রাচীন কাল হইতেই ইহা প্রসিদ্ধ জনপদরূপে পরিচিত। বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তি এই অঞ্চলে তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তন্মধ্যে গ্রীক, মুসলমান, পর্তুগীজ ও বৃটিশগণ প্রধান।

অবস্থান ও আয়তন: সমগ্র অঞ্চলটি ২০°১′ উত্তর হইতে ২৪.৭′ উত্তর এবং ৬৮°৪′ পূর্ব হইতে ৭৪°৪′ পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। কচ্ছ ও কাথিয়াবাড় অন্তরীপের আয়তন ১৭৯১৩২০ বর্গ কিলোমিটার। ইহার পশ্চিমতম প্রান্ত (সির খাঁড়ি) হইতে পূর্বতম প্রান্ত (হাদোল) পর্যন্ত সর্বাধিক বিস্তৃতি ৫৩০ কিলোমিটার এবং উত্তরতম প্রান্ত (দারতা) হইতে দক্ষিণতম প্রান্ত (বুলসর) পর্যন্ত ইহার সর্বাধিক বিস্তৃতি প্রায় ৪১০ কিলোমিটার।

সীমা: ইহার রাজনৈতিক সীমারেখা নিম্নরূপ: উত্তর-পশ্চিমে পশ্চিম পাকিস্তান ও উত্তর পূর্বে রাজস্থান, পূর্ব সীমান্তে মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র এবং সমগ্র পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চল আরব সাগর দ্বারা সীমিত। ভৌগোলিক অঞ্চলরূপে ইহার উত্তর পশ্চিম অংশ ও উত্তর পূর্ব অংশ যথাক্রমে সিন্ধু উপত্যকা ও উদয়পুর গোয়ালিয়র মালভূমি দ্বারা সীমিত। সমগ্র পূর্বাঞ্চলে মালব ভূমি ও দাক্ষিণাত্যের মহারাষ্ট্র অঞ্চল। দক্ষিণের সামান্য অংশ ভারতের পশ্চিম উপকূলের সহ্যাদ্রি পর্বত দ্বারা সীমিত এবং সমগ্র পশ্চিমাংশে রহিয়াছে আরব সাগর।

বর্তমান ইতিহাস: বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজগণ এখানে তাঁহাদের দেশীয় রাজত্ব পত্তন করিয়াছিলেন। ভারত স্বাধীন হইবার পর এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে রাজ্যের পুনর্বিন্যাস কালে গুজরাটের (অর্থাৎ কচ্ছ ও কাথিয়াবাড় অন্তরীপের) সমগ্র অঞ্চলকে ১৬টি জেলায় বিভক্ত করা হয় এবং সন্নিহিত বোম্বাই অঞ্চলকে লইয়া এক

পৃথক দ্বিভাষী রাজ্য গঠন করা হয় (১৯৬০ খৃষ্টাব্দের ১লা মে পূর্বের বোম্বাই রাজ্যের উত্তর অংশ হইতে ১৭টি জেলা লইয়া গুজরাটের রাজ্যসীমা নবরূপে নির্ধারিত হয়।

অঞ্চল পরিচয়ঃ বর্তমানে সামান্য কিছু পরিবর্তন সহ এই রাজ্যকে ১৯টি জেলায় বিভক্ত করা হইয়াছে, তদবধি ইহা স্বতন্ত্রভাবে গুজরাট রাজ্য নামে পরিচিত। গুজরাটের নিম্নলিখিত জেলা লইয়া এই ভৌগোলিক অঞ্চলটি গঠিতঃ(১) নাধরা (পাঁচমহল) (২) কয়রা (৩) আহমেদাবাদ (৪) মেহসানা (৫) সুরেন্দ্র নগর (৬) রাজকোট (৭) জামনগর (৮) জুনাগড় (৯) অমরেলী (১০) ভাবনগর (১১) বরোদা (১২) ব্রোচ (১৩) সুরাট (১৪) আহ্ওয়া (১৫) ভুজ (কচ্ছ) (১৬) দিউ ও (১৭) দাং। বর্তমান গুজরাট রাজ্যের (১৮) পালানপুর (বানস-কন্থা) ও (১৯) হিম্মতনগর (সবরকন্থা) জেলা দুইটিকে ভিন্নতর ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের জন্য পূর্বের উদয়পুর-গোয়ালিয়র মালভূমির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

২. প্রাকৃতিক পরিচয়

ভূ-প্রকৃতি ঃ গুজরাটের সীমান্ত অঞ্চল উচ্চ পর্বত দ্বারা পরিবেষ্টিত। পূর্বদিকে অরসুর পর্বত ১৬০ কিলোমিটার ব্যাপিয়া বিস্তৃত এবং এই অঞ্চলের পাভাবর্ধ (৩২৯ মিটার) পর্বতও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজপিপলা (সাতপুরা) পর্বত খনিজ প্রস্তরের জন্য বিখ্যাত। দক্ষিণের উপকূলাঞ্চলে সহ্যাদ্রি পর্বতমালার অংশটি প্রায় ১৬০ কিলোমিটার ব্যাপিয়া বিস্তৃত। কাথিয়াবাড়ের দক্ষিণাংশে গিরনার পর্বতের সর্বোচ্চ (১১১৭ মিটার) শিখর গোরখনার শৃঙ্গ অবস্থিত। এই অঞ্চলে গাব্রো, ডায়োরাইট সিয়েনাইট প্রভৃতি আগ্নেয়শিলা দেখা যায়।

কচ্ছের রণ ঃ একদা এই অঞ্চলটি সমুদ্র ও উপহ্রদ দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। সেই সময়ে এই স্থানে বিস্তীর্ণ জলমগ্ন ও কর্দমাক্ত অঞ্চলের উদ্ভব হয়। ইহাকে বলা হয় কচ্ছের রণ। অতীতে এই রণ অঞ্চল দ্বারা গুজরাট ভারতের অন্যান্য অংশের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, বর্তমানে নদীবাহিত পলি দ্বারা নিম্নভূমির সৃষ্টি হওয়ায় এই অংশ মূল-ভূখণ্ডের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। বৃষ্টিপাতহীনতা এই অঞ্চলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হওয়ায় এখানে একপ্রকার শুষ্ক ও রুক্ষ ভূ-প্রকৃতি দেখা যায়। সুতরাং উপকূলাঞ্চলের বালুকাস্তূপ, বালুকা সমভূমি, প্রস্তরময় উচ্চ ভূখণ্ড এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই ভূখণ্ড অতি সামান্য উচ্চ বলিয়া প্রায় প্রতি বৎসরই বর্ষার জলে অথবা সমুদ্রের প্লাবনে নিমজ্জিত হয়।

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রণঃ এই অঞ্চলের দক্ষিণ বা দক্ষিণ পূর্ব অংশে অনুরূপ আর একটি লবণাক্ত কর্দমময় অঞ্চল দেখা যায়। ইহাকে ক্ষুদ্র রণ (Little Runn) বলে। এই দুই অঞ্চলের মিলিত আয়তন প্রায় ৭৩৬০০ বর্গ কিলোমিটার। বিস্তীর্ণ রণ অঞ্চলে কয়েকটি উচ্চভূমি দ্বীপের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। যথাঃ লাখপাট (২৭৪ মিটার), (পাদাম ৫৩৪ মিটার), নাখটারানা (৩৮৮ মিটার) প্রভৃতি। বৃহৎ রণ অঞ্চলের দক্ষিণে ও ক্ষুদ্রণ অঞ্চলের পশ্চিমে কচ্ছ ভূখণ্ড অবস্থিত। মূলতঃ বেলে পাথর গঠিত এই অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩১৫—৩৮৫ মিটার পর্যন্ত উচ্চ। কচ্ছের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এ্যাওলিয়ান ও পলি সঞ্চিত মৃত্তিকা দেখা যায়।

কাথিয়াবাড় অন্তরীপ ঃ রণ অঞ্চলের দক্ষিণে কাথিয়াবাড় অন্তরীপ অবস্থিত। ইহা উত্তর-পশ্চিমে কচ্ছ উপসাগর, উত্তরে রণ-অঞ্চল, কাম্বে উপসাগর এবং দক্ষিণে ও পশ্চিমে আরব সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত। মধ্যাংশ অপেক্ষাকৃত উচ্চ ; তথা হইতে

অসংখ্য নদীর উৎপত্তি হইয়া বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। দক্ষিণাংশে গিরনার পর্বত অবস্থিত। এই পার্বত্য অঞ্চলের গহন অরণ্যে ভারত বিখ্যাত গির-সিংহ বাস করে। এই অঞ্চলের বহু পর্বতই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের দ্বারা সৃষ্ট। ইহারা সমুদ্রের দিকে ঢালু এবং উত্তরাংশে অপেক্ষাকৃত খাড়া।

গুজরাটের সমভূমিঃ ইহা কাথিয়াবাড় অন্তরীপের পূর্ব দিকে অবস্থিত এবং দেশের অভ্যন্তর ভাগের দিকে বিস্তৃত। বায়ুবাহিত লোয়েস-মৃত্তিকা দ্বারা এই সমভূমির অধিকাংশ গঠিত। ইহা বায়ুর দ্বারা স্থানচ্যুত হইয়া সমগ্র অঞ্চলটিকে এক শুষ্ক মরুপ্রায় অঞ্চলে পরিণত করিয়াছে।

নদ-নদী ঃ নর্মদা, তাপ্তী, মাহী, সবরমতী প্রভৃতি প্রধান নদীগুলি ছাড়াও এই অঞ্চলে অসংখ্য অপ্রধান নদী (বানাস্, সরস্বতী, অম্বিকা, আউরঙ্গা প্রভৃতি) প্রবাহিত হইয়াছে। প্রায় তিনদিক জলবেষ্টিত থাকায় নদীগুলি কোরি খাড়ি, কচ্ছ উপসাগর, আরব সাগর ও কাম্বে উপসাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে।

কচ্ছের নদীঃ এই অঞ্চলের অধিকাংশ নদী দক্ষিণের ঢাল হইতে উৎপন্ন হইয়া কতকগুলি দক্ষিণ দিকের কচ্ছ উপসাগরে এবং অন্যগুলি পশ্চিম দিকে কোরি খাঁড়িতে পড়িয়াছে। পাছাম দ্বীপপুঞ্জ হইতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইয়াছে।

কাথিয়াবাড়ের নদীঃ এই অঞ্চলের নদীগুলির গতি-প্রকৃতি রাজকোট ও গিরনার পর্বত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উত্তরমুখী নদীগুলি কচ্ছ উপসাগর ও ক্ষুদ্র রণের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং দক্ষিণমুখী নদীগুলি আরব সাগরে পতিত হইয়াছে। সুরাটের সমুদ্র উপকূলে প্রবাহিত হইয়া ভাদর ও ওজাট নদীর পশ্চিমমুখী প্রবাহ দুইটি আরব সাগরে আসিয়া মিলিত হইয়াছে এবং পূর্ববাহিনী নদীগুলি (সতরঞ্জি ইত্যাদি) কাম্বে উপসাগরে পড়িয়াছে। আরাবল্লীর দক্ষিণ-পশ্চিম ঢাল হইতে উৎপন্ন সবরমতী ও মাহী নদী কাথিয়াবাড়ের উত্তর-পূর্ব অংশে প্রবাহিত হইয়া কাম্বে উপসাগরে পড়িয়াছে।

গুজরাটের নদীঃ এই অঞ্চলের প্রধান নদী দুইটি (তাপ্তী ও নর্মদা) পূর্বের পার্বত্য অঞ্চল হইতে উৎপন্ন হইয়া অবশেষে কাম্বে উপসাগরে পড়িয়াছে। নর্মদা নদীর মোহনায় ব্রোচ ও তাপ্তী নদীর মোহনায় সুরাট শহর অবস্থিত। নদী বাহিত বালু দ্বারা দুইটি নদীরই মোহনায় বালুচরের সৃষ্টি হইয়াছে। তাপ্তীর দক্ষিণে প্রবাহিত নদীগুলি আকারে ক্ষুদ্র ও গতিতে তীব্র। ইহারা মূলতঃ সহ্যাদ্রিপর্বতের উত্তরতম অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া কাম্বে উপসাগরে পড়িয়াছে।

জলবায়ুঃ উত্তরে রাজস্থানের মরু অঞ্চল থাকায় উত্তরাংশে তীব্র উত্তাপ এবং দক্ষিণাংশ বিভিন্ন জলভাগের (কচ্ছ ও কাম্বে উপসাগর, আরব সাগর) নিকটবর্তী হওয়ায় অপেক্ষাকৃত কম উত্তাপ পরিলক্ষিত হয়। গ্রীষ্মকালীন গড় তাপমাত্রা প্রায় ৪০° সে. এবং শীতকালীন (নভেম্বর—ফ্রেব্রুয়ারী) গড়মাত্রা প্রায় ১৯° সে. উত্তর ; উত্তর পূর্বাঞ্চলে জলবায়ু কিছুটা উষ্ণ ও রুক্ষ।

বৃষ্টিপাতঃ মৌসুমী বায়ু প্রবাহজনিত বৃষ্টিপাত কাম্বে উপসাগরের উত্তরাংশেই সীমাবদ্ধ থাকে। উত্তরে মরু অঞ্চল থাকায় রাজস্থানের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কচ্ছের রণে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৫০° সে.মি. মাত্র। সৌরাষ্ট্র ও কাম্বে উপসাগরের উপকূলাঞ্চলে ৬৩ সে. মি. বৃষ্টিপাত হয়। গুজরাটের দক্ষিণাংশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশী (৭৬-১৫২ সে. মি.)। সুতরাং সাধারণভাবে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দক্ষিণ হইতে উত্তরে ও পশ্চিমে কমিতেছে।

মৃত্তিকা ঃ এই অঞ্চলের মৃত্তিকা অধিকাংশ স্থলেই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে গঠিত হইয়াছে। কেবলমাত্র সৌরাষ্ট্র অন্তরীপ ও উত্তর গুজরাটের পূর্বাঞ্চলে পলি গঠিত সমভূমি দেখা যায়। এখানে নিম্নবর্ণিত মৃত্তিকা দেখা যায়। যথা ঃ (১) **কৃষ্ণমৃত্তিকাঃ** আগ্নেয় শিলা (ব্যাসাল্ট) হইতে উৎপন্ন এই মৃত্তিকা গুজরাটের দক্ষিণে কাথিয়াবাড়ের মধ্যস্থলে দেখা যায়। ইহা খুব উর্বর মৃত্তিকা। (২) **পলি মৃত্তিকাঃ** সৌরাষ্ট্রের উপকূল অঞ্চল এবং গুজরাটের পশ্চিম উপকূল সন্নিহিত অঞ্চলে এই জাতীয় মৃত্তিকা দেখা যায়। কচ্ছের রণ ও সন্নিহিত অঞ্চলে বালুমিশ্রিত পলি এবং কাম্বে উপসাগরের উত্তরাঞ্চল বালুমিশ্রিত দোঁয়াশ মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। (৩) **বিবিধঃ** কচ্ছের বৃহৎ ও ক্ষুদ্র রণ অঞ্চলে মরুপ্রকৃতির লবণাক্ত মৃত্তিকা এবং কাথিয়াবাড় অন্তরীপের উত্তরাঞ্চলে ও কচ্ছের মধ্যস্থলের উচ্চভূমিতে রক্ত ও পীতবর্ণ মৃত্তিকা দেখা যায়।

স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জঃ বিভিন্ন অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ বা ঝোপ-ঝাড় জাতীয় বৃক্ষের প্রাচুর্য অধিক। কাথিয়াবাড় ও কচ্ছের উত্তর তটে সামান্য তৃণ ও ঝোপ-ঝাড় দেখা যায়। গির এবং গিরনার পর্বত অঞ্চলে শুষ্ক পর্ণমোচী বৃক্ষ জন্মে। গির অরণ্যে গির সিংহ প্রতিপালন করা হয়। ভারতের অন্যান্য অংশে ইহা দুর্লভ। আর্দ্র পর্ণমোচী, কণ্টক জাতীয় বৃক্ষ এবং উপকূলীয় বৃক্ষই সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। এই অঞ্চলের দাং, অমরেলী, জুনাগড়, আহমেদাবাদ, মেহসানা, সুরাট এবং অন্যান্য পূর্বাঞ্চলীয় জেলাতেও সংরক্ষিত অরণ্য আছে।

৩. সাংস্কৃতিক পরিচয়

জনসংখ্যাঃ এই অন্তরীপ অঞ্চলের ১৭৯১৩২০ বর্গ কিলোমিটার পরিমিত এলাকায় ১৯.৮ মিলিয়ন লোক বাস করে। সুতরাং সাধারণভাবে এখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ১১০ জন লোক বাস করে। এই অঞ্চলের জনবসতি মূলতঃ মধ্যভাগের পলিগঠিত সমভূমি ও দক্ষিণের উপকূলাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত এবং তাহা ক্রমাগত পশ্চিম হইতে পূর্বের দিকে কমিয়া গিয়াছে। আহমেদাবাদ, কয়রা, বরোদা প্রভৃতি শহরগুলিতে সর্বাধিক লোক বাস করে।

জনসংস্কৃতিঃ এই অঞ্চলের অধিবাসীরা সাধারণভাবে গুজরাটি নামে পরিচিত হইলেও প্রচুর আদিবাসীও এখানে বাস করে। তন্মধ্যে দাং, সুরাট, পাঁচমহল প্রভৃতি অঞ্চলের ভীল, গমিতো ধানকা, নইকাস, নার্কদাস প্রভৃতি উপজাতিই প্রধান। সমগ্র জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত। শতকরা ৭৫ জন কৃষি ও কৃষি-সংক্রান্ত কার্যে এবং অন্যান্যগণ শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি নানাবিধ উপায়ে জীবিকার্জন করে। সৌরাষ্ট্র, গুজরাটের উত্তরাংশ, মাহী ও তাপ্তী নদী উপত্যকা অঞ্চলে কৃষিই প্রধান জীবিকা হইলেও আমেদাবাদ প্রভৃতি শিল্পোন্নত এলাকায় তাহা একান্তভাবে অপ্রধান জীবিকা। আহমেদাবাদ অঞ্চলের ৫০ শতাংশ ব্যক্তি শিক্ষিত। সুরাট, মেহসানা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর শিক্ষিত ব্যক্তি বাস করে। এই অঞ্চলের দাং জেলায় শিক্ষার হার খুবই কম।

গ্রাম ও শহরঃ সাধারণভাবে সমগ্র জনসংখ্যার ৭৪% এই অঞ্চলের ১৮৬০০ গ্রামে বাস করে। দাং, সবরকন্থা, বানসকন্থা ও সুরাট জেলা সর্বাধিক গ্রাম অধ্যুষিত অঞ্চল। অবশিষ্ট ২৬ শতাংশ ব্যক্তি আহমেদাবাদ, রাজকোট, জামনগর প্রভৃতি শহর অঞ্চলে বসবাস করে। পূর্বের দেশীয় রাজ্যগুলির প্রশাসনিক কেন্দ্রসমূহ (বরোদা,

রাজকোট, জামনগর প্রভৃতি) এবং বৃটিশ যুগের প্রধান শিল্পস্থানগুলিই (আহমেদাবাদ, সুরাট প্রভৃতি) বর্তমানে বৃহৎ শহরে পরিণত হইয়াছে। নিম্নে এই অঞ্চলের কয়েকটি শহরের বিবরণ দেওয়া হইলঃ

(১) **আহমেদাবাদ** (১২,০৬,০০১)ঃ সবরমতী নদীর উভয়তটে এই শহরটি গড়িয়া উঠিয়াছে। শহরের পুরাতন অংশটি ঘনবসতিপূর্ণ ও বাণিজ্য এলাকা। নূতন অংশটি প্রশাসন, শিক্ষা ও বসতি কেন্দ্র। শহরটি বস্ত্রবয়ন শিল্পে অগ্রগণ্য। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। পূর্বে ইহা গুজরাটের রাজধানী ছিল। (২) **গান্ধীনগর**ঃ আহমেদাবাদের উত্তরে সবরমতী নদীর দক্ষিণতটে অবস্থিত গুজরাটের নবগঠিত রাজধানী। আধুনিক জীবনের সর্বপ্রকার সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নগর পরিকল্পনা অনুযায়ী এই নগরটি গড়িয়া উঠিতেছে। সবরমতী নদী হইতে প্রয়োজনীয় জল এবং 'আহমেদাবাদ বিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠান' হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা

হইবে। (৩) **বরোদা** (২৯৮৩৯৮)ঃ শহরটি গুজরাটের একটি অন্যতম বয়ন শিল্প, রসায়ন শিল্প ও কারিগরী শিল্প কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধ। রায়পুর ইহার বাণিজ্যিক কেন্দ্রস্থল। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। জনবৃদ্ধির সংগে সংগে শহরটিও সম্প্রসারিত হইতেছে। (৪) **রাজকোট**ঃ সৌরাষ্ট্রের প্রায় মধ্যস্থলে আজি নদীর উভয় তীরে ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে। শহরটির পশ্চিমাঞ্চল বয়ন ও অন্যান্য শিল্প এবং প্রশাসনিক কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধ। পূর্বাঞ্চল অপেক্ষাকৃত নূতন এবং আধুনিক বসতি ও শিল্প এলাকায় সুসজ্জিত। (৫) **ভুজ** (৪০১৮০)ঃ কচ্ছ জেলার প্রধান কেন্দ্র। বিভিন্ন পথের সংযোগস্থলে অবস্থিত হওয়ায় শহরটির বিশেষ গুরুত্ব বাড়িয়াছে। (৬) **ভাবনগর** (১৭৬৪৭৩)ঃ কাথিয়াবাড়ে অবস্থিত ভাবনগর জেলার প্রধান কেন্দ্র। ইহার পৌর এলাকা রেলওয়ে কলোনী এবং বন্দর এলাকায় প্রচুর লোক বাস করে। ইহা গুজরাটের একটি বন্দর এবং বিমান রেল ও সড়কপথের দ্বারা যুক্ত। (৭)

জামনগরঃ জামনগর জেলার প্রধান কেন্দ্র। ইহা জল, স্থল বিমানপথ দ্বারা অন্যান্য অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত। (৮) **সুরাটঃ** তাপ্তী নদীতটে অবস্থিত। বৃটিশগণ সর্বপ্রথম (১৬০৪-১৩) এখানেই কারখানা স্থাপন করে। বর্তমানে ইহা বস্ত্রবয়ন ও কাগজ শিল্পের জন্য বিখ্যাত। (৯) **ব্রোচঃ** নর্মদা নদীতটে অবস্থিত জেলার প্রধান শহর। এই অঞ্চলের রাজপিপলা (খনিজ প্রস্তর), এ্যাংকলেশ্বর (আধুনিক তৈল শহর) প্রভৃতি বিখ্যাত স্থান। (১০) **দিউঃ** আরব সাগরের উপকূলে অবস্থিত। ইহা পূর্বে পর্তুগালের অধীনে ছিল। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ইহা ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। বর্তমানে ইহা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা শাসিত হয়।

৪. আর্থিক পরিচয়

কৃষিজ সম্পদঃ সমগ্র ভূমি অঞ্চলের প্রায় অর্ধাংশ কৃষিকাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। কচ্ছ অঞ্চলে কৃষিভূমির পরিমাণ খুব কম এবং মেহসানা অঞ্চলের প্রায় ৭৭% জমিতে কৃষি কাজ করা হয়। এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য খাদ্যশস্য হইল জোয়ার, বাজরা, ধান, গম এবং পণ্য শস্যের মধ্যে তুলা, বাদাম, তামাক, তৈলবীজ প্রভৃতি প্রধান।

জোয়ারঃ খাদ্যশস্যের মধ্যে জোয়ারই প্রধান। প্রায় সব জেলাতেই ইহা পশু খাদ্যরূপে উৎপন্ন করা হয়। মেহসানা অঞ্চলে ইহার উৎপাদন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **বাজরাঃ** গুজরাটের শুষ্ক ও অর্ধশুষ্ক অঞ্চলে (মেহসানা, সুরেন্দ্রনগর, ভাবনগর, অমরেলী প্রভৃতি) ইহার চাষ সীমাবদ্ধ। **ধান ও গমঃ** সমগ্র কর্ষিত জমির ১০ শতাংশে ধান ও গম চাষ করা হয়। সুরাট, বরোদা, কয়রা, পাঁচমহল অঞ্চলে ধান এবং আহমেদাবাদ, মেহসানা অঞ্চলে গম উৎপাদন হয়। পাঁচমহল ও সবরকন্থা জেলার ভুট্টা একটি প্রয়োজনীয় ফসল। **তুলাঃ** তুলা উৎপাদনে গুজরাটের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। সুরেন্দ্রনগর, আহমেদাবাদ, বরোদা, ব্রোচ প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে তুলা উৎপন্ন হয়। কয়রায় জলসেচের সাহায্যে তুলা চাষ হয়। **বাদামঃ** এই অঞ্চলে সমগ্র ভারতের ১/৭ অংশ বাদাম উৎপন্ন হয়। কর্ষিত জমির দিক হইতে প্রথম হইলেও বাদাম উৎপাদনের হার অতি অল্প। জুনাগড়, রাজকোট প্রভৃতি অঞ্চলে বাদাম উৎপাদন হয়। তবে কয়রা অঞ্চলে উৎপাদনের হার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **তামাকঃ** এই অঞ্চল সমগ্র ভারতের ১/৬ অংশ তামাক উৎপাদন করে। তামাক উৎপাদনে কয়রা ও বরোদা বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে।

সেচ ব্যবস্থাঃ এখানে কতকগুলি বৃহৎ ও মধ্যমায়তনের সেচ প্রকল্প আছে। তন্মধ্যে উকাই, নর্মদা, কাদানা, সবরমতী, দমনগঙ্গা প্রকল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নর্মদা, তাপ্তী, মাহী ও সবরমতী প্রকল্পের কাজ শেষ হইলে দেশের প্রভূত উপকার হইবে। জলাধার, কূপ, জলোত্তোলন ইত্যাদি পদ্ধতিতে এখানে সেচকাজ হইয়া থাকে। সম্প্রতি পাম্পসেটের প্রচলন হইয়াছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় আরও ৩০০ নলকূপ স্থাপনের পরিকল্পনা আছে। জলাধার ও নলকূপের সাহায্যে প্রায় ৩৬৩০০ একর জমিতে জলসেচ করা যায়।

খনিজ সম্পদঃ এই অঞ্চল খনিজ সম্পদে বিশেষরূপে সমৃদ্ধ। এখানে লিগনাইট, ফ্লোরাইট, বক্সাইট, ক্যালসাইট প্রভৃতি খনিজ ধাতুদ্রব্য এবং খনিজ তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। **লিগনাইটঃ** সম্প্রতি কচ্ছের পানানধ্রো এবং আকিমতী অঞ্চলে এক লিগনাইট কয়লাখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই খনিতে সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রায় ১২৫ মিলিয়ন টন। **ফ্লোরাইটঃ** বরোদার নিকটবর্তী আম্বাদুনগর পৃথিবীর অন্যতম ফ্লোরাইট সমৃদ্ধ স্থান। এই খনির কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইলে ভারতকে আর বিদেশ হইতে ফ্লোরাইট রপ্তানী করিতে হইবে না। **বক্সাইটঃ** কচ্ছ ও জামনগর জেলায় ইহা সর্বোচ্চ পরিমাণে পাওয়া যায়। জুনাগড়, জামনগর, ভাবনগর, বুলসর, কয়রা প্রভৃতি অঞ্চলেও ইহা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আছে। **ক্যালসাইট ঃ** এই খনিজ দ্রব্য উৎপাদনে গুজরাট ভারতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ইহা অমরেলী, ভাবনগর, রাজকোট, জুনাগড় প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়। **লবণঃ** ভারতের ৪০ শতাংশ লবণ এখানে উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ গুজরাটের ধারাসানা ও মগদ অঞ্চল ব্যতীত জামনগরের মিধাপুরও লবণ উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। **ম্যাংগানিজঃ** হালোল তালুক, জম্ব ঘোড়ামহল ও জাবুগাঁও তালুকে সর্ববৃহৎ ম্যাঙ্গানিজ খনিগুলি অবস্থিত। **চায়না ক্লেঃ** মেহসানা ও সবরকন্থা অঞ্চলে উচ্চশ্রেণীর চায়না ক্লে পাওয়া যায়। এই খনিজ দ্রব্য উৎপাদনে গুজরাট ভারতের মধ্যে তৃতীয় স্থানাধিকারী। **বিবিধঃ** ভাবনগর, জুনাগড়, রাজকোট, সুরেন্দ্রনগর প্রভৃতি অঞ্চলে প্ল্যাষ্টিক ফায়ার ক্লে এবং কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র, কয়রা প্রভৃতি অঞ্চলে চুণাপাথর পাওয়া যায়।

খনিজ তৈল ও গ্যাসঃ (১) **কাম্বে অঞ্চলঃ** ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে এখানে সর্বপ্রথম তৈলখনি আবিষ্কৃত হয়। নিকটবর্তী কাথানা তৈলকেন্দ্রে প্রত্যহ ১৫ টন তৈল উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চলে প্রত্যহ ৫ লক্ষ কিউবিক মিটার গ্যাস উৎপন্ন হয়। ধুবারান শক্তি কেন্দ্র হইতে এই গ্যাস সরবরাহ করা হয়। (২) **বরোদা অঞ্চলঃ** নর্মদা নদীতীরে এ্যাংকলেশ্বর এই অঞ্চলের সর্ববৃহৎ তৈল কেন্দ্রটি অবস্থিত। এখানে মোট ২০০ কূপ আছে। তাহা হইতে প্রত্যহ ৮৩০০ টন তৈল এবং ৭.৫ লক্ষ কিউবিক মিটার গ্যাস উৎপন্ন হয়। (৩) **আহমেদাবাদ অঞ্চলঃ** কলোল,, সানান্দ, ওয়ারেল, বাকরোল, নওগাঁ প্রভৃতি অঞ্চল হইতে তৈল উৎপাদন হয়। দৈনিক তৈল উৎপাদন ১২০০ টন পর্যন্ত বাড়ানো হইয়াছে। (৪) **মেহসানা অঞ্চলঃ** উত্তরে থারাজ হইতে দক্ষিণে দেত্রোজ পর্যন্ত এই তৈলখনি অঞ্চল বিস্তৃত। ভাবনগরেও একটি তৈল কেন্দ্র আছে।

শিল্পজ সম্পদঃ পশ্চিমবঙ্গ ও মহারাষ্ট্রের পরেই ইহার স্থান। লবণ উৎপাদনে প্রথম এবং বয়নশিল্পে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেও বিদ্যুৎ শিল্প, বনস্পতি, রসায়ন, বস্ত্র, সিমেণ্ট, চীনামাটি, সার ইত্যাদি উৎপাদনেও এই রাজ্য যথেষ্ট উল্লেখ-যোগ্য। আসামের পর গুজরাটই ভারতের একমাত্র তৈল উৎপাদক অঞ্চল।

(১) **তৈল-শোধনাগারঃ** বরোদার নিকটে কয়ালীতে তৈল শোধনাগার স্থাপিত হইয়াছে। কাম্বে, এ্যাংকলেশ্বর, পাদরা প্রভৃতি অঞ্চলের তৈল এখানে শোধন করা হইবে। (২) **তাপ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনঃ** তাপ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির মধ্যে ধুবরান, শাহপুর, আহমেদাবাদ, কচ্ছ প্রভৃতি স্থানের নাম উল্লেখযোগ্য। তারাপুরের পরমাণু তাপ উৎপাদন কেন্দ্র মহারাষ্ট্রে অবস্থিত হইলেও ইহা এই রাজ্যেও তাপ সরবরাহ করে। বহুমুখী নদী পরিকল্পনার সহিত সংযুক্ত জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির মধ্যে উকাই ও ধুবারান প্রকল্পের নাম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। (৩) **বয়ন শিল্পঃ** ইহা গুজরাটের প্রধান শিল্প এবং মূলতঃ আহমেদাবাদে কেন্দ্রীভূত। অন্যান্য কেন্দ্র-গুলির মধ্যে কাম্বে, সুরাট, ভাবনগর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রেশম সুতা উৎপাদনের জন্য সুরাট এবং পশম উৎপাদনের জন্য জামনগর ও বরোদা উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। (৪) **কারিগরী শিল্পঃ** বৃহদায়তন লৌহ ও ইস্পাত শিল্প না থাকায়

এই অঞ্চল ডিজেল ও তৈল ইঞ্জিন, পাম্প, বয়নযন্ত্রের যন্ত্রাংশ, বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি নির্মাণে দক্ষতা অর্জন করিয়াছে। এই সকল শিল্পে আহমেদাবাদ প্রথম এবং বরোদা, সুরাট, রাজকোট, ভাবনগর প্রভৃতির নাম তাহার পরে উল্লেখযোগ্য। (৫) **রসায়ন শিল্পঃ** মিঠাপুরে টাটা কেমিক্যালস্,, সৌরাষ্ট্রের ওখায় লবণ নিষ্কাশন কেন্দ্র, পোরবন্দরে কষ্টিক সোডা, বরোদায় সার উৎপাদন, বরোদা ও পারনারে ঔষধ নির্মাণ প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক শিল্পে এই অঞ্চল সমৃদ্ধ। (৬) **সিমেণ্ট, চীনামাটি ও মৃৎশিল্পঃ** আহমেদাবাদ, সুরাট ও বরোদায় ইট, টালি ও নল নির্মাণ কেন্দ্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। চীনামাটি শিল্পের জন্য জামনগর, রাজকোট, সুরেন্দ্রনগর প্রভৃতি স্থান উল্লেখযোগ্য। পোরবন্দর, কয়রা প্রভৃতি অঞ্চলে ৫টি সিমেণ্ট শিল্প আছে। (৭) **বিবিধ শিল্পঃ** নানাবিধ শিল্পে গুজরাট বিশেষ উন্নতি
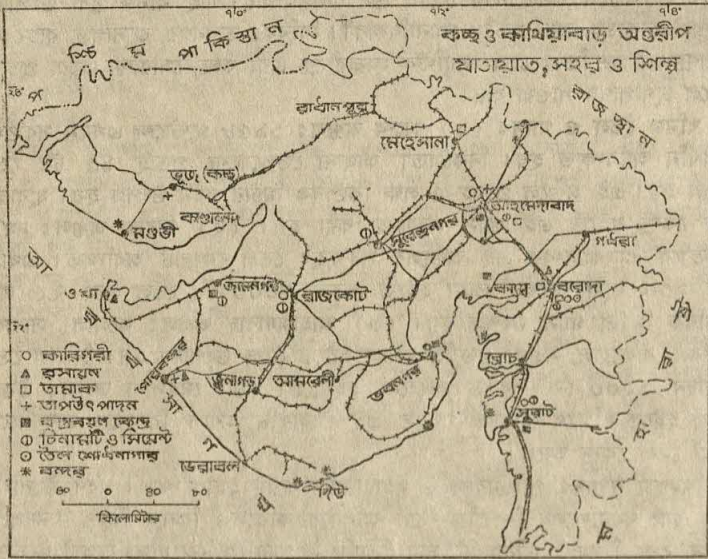
করিয়াছে। তন্মধ্যে সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে বনস্পতি, কোদিনার অঞ্চলে চিনি, কয়রা, মেহসানা, বরোদা প্রভৃতি অঞ্চলে তামাক শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ সমগ্র অঞ্চলে রেলপথ, সড়কপথ, বিমানপথ ইত্যাদি থাকিলেও এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে তাহা যথেষ্ট নয়। **রেলপথঃ** পশ্চিম রেলপথের একটি ক্ষুদ্র অংশ এই অঞ্চলে প্রসারিত হইয়াছে। সমগ্র গুজরাট এবং মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের কিয়দংশ এই রেলপথের অন্তর্গত হওয়ায় সম্পদ পরিবহণে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। **সড়ক পথঃ** তিনটি জাতীয় সড়ক (৮, ৮এ ও ৮ বি) ও আহমেদাবাদ-দিল্লী, আহমেদাবাদ- কান্ডালা, বাঙ্গালোর-রাজকোট, পোরবন্দর প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সড়কপথ এই অঞ্চলে প্রসারিত হইয়াছে। আহমেদাবাদ হইতে বরোদা, রাজকোট, ভাবনগর, জামনগর, ভুজ, কাম্বে প্রভৃতি অঞ্চলে বিলাস-বহুল বাস যাতায়াত করে। চতুর্থ পরিকল্পনায় সড়কপথের আরও উন্নতি হইবে। **বিমানপথ ঃ** অতি সম্প্রতি এই অঞ্চলে বিমানপথের কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

আভ্যন্তরীণ বিমানপথ দ্বারা আহমেদাবাদ, রাজকোট, জামনগর, ভুজ প্রভৃতি অঞ্চল এবং বাহিরের দিল্লী ও বোম্বাই শহর যুক্ত হইয়াছে।

বন্দর ও পোতাশ্রয় ঃ (১) কাণ্ডলা ঃ কচ্ছ অঞ্চলে কাণ্ডলা খাঁড়িতে এই বন্দর অবস্থিত। ইহা একটি স্বাভাবিক পোতাশ্রয়ও বটে। করাচী বন্দর পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এখানে একটি বন্দর স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই বন্দর সর্বপ্রকার আধুনিক সুবিধা যুক্ত। সমগ্র গুজরাট এবং পাঞ্জাব, দিল্লী, রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ ইহার পশ্চাদভূমি। জিপসাম, লিগনাইট, বক্সাইট প্রভৃতি খনিজদ্রব্যে ইহার পশ্চাদভূমি সমৃদ্ধ। কাণ্ডলা হইতে রপ্তানীজাত দ্রব্যের মধ্যে সিমেণ্ট, লবণ, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি প্রধান এবং খনিজ তৈল, বিলাস দ্রব্য, কয়লা, ঔষধ, নানাবিধ যন্ত্রপাতি প্রভৃতি এই বন্দরের মাধ্যমে আমদানী করা হয়। **(২) ওখা ঃ** কাথিয়াবাড় অঞ্চলের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে এই ক্ষুদ্র বন্দরটি অবস্থিত। গুজরাট ও রাজস্থান রাজ্য ইহার পশ্চাদভূমি। ইহা আহমেদাবাদের সহিত রেলপথ দ্বারা যুক্ত। কার্পাস, তৈলবীজ প্রভৃতি দ্রব্য এই বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানী করা হয়। **(৩) অন্যান্য ঃ** এই সকল বন্দর ব্যতীত এই রাজ্যে ১০টি বৃহদায়তন ও ৩৬টি ক্ষুদ্রায়তন সহ মোট ৪৬টি বন্দর ও পোতাশ্রয় আছে। পোরবন্দর একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর।

।। দক্ষিণের মালভূমি অঞ্চল ।।

১. সাধারণ পরিচয়

ভূমিকাঃ ইহা ভারতের সুবৃহৎ ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চল। উত্তরে গঙ্গা-সিন্ধু সমভূমি, পূর্বে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে আরব সাগর দ্বারা বেষ্টিত এই ভূখণ্ড বন্ধুর ভূপ্রকৃতি। স্বল্প বৃষ্টিপাত, হ্রস্ব-আয়তন অনাব্য নদী, অনুর্বর মৃত্তিকা ইত্যাদি নানাবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, শুধুমাত্র ভূ-তাত্ত্বিক গঠন বৈচিত্র্যের জন্যই কৃষিজ, বনজ এবং সর্বোপরি খনিজ দ্রব্যের উৎপাদন এবং তদনুযায়ী শিল্প স্থাপন দ্বারা ভারতের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানচিত্রে এক বিশেষ স্থানের অধিকারী হইয়াছে। মালভূমির মহারাষ্ট্র অঞ্চল সর্বাপেক্ষা উন্নত হইলেও, দণ্ডকারণ্য-ছত্রিশগড়-উড়িষ্যা মালভূমি প্রভৃতি অনুন্নত অঞ্চল আগামী দিনের অর্থনৈতিক বনিয়াদ রচনা করিবে।

অবস্থান ও আয়তনঃ এই মালভূমি অঞ্চল ৮°১০′ উত্তর হইতে ২৬°৪০′ উত্তর পর্যন্ত এবং ৭৪°৩৫′ পূর্ব হইতে ৮৮°০′ পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার আয়তন প্রায় ১৫৭৭০০০ বর্গকিলোমিটার। তুলনামূলক বিচারে ইহার অন্তর্গত দাক্ষিণাত্যের মালভূমিই আয়তনে সর্ববৃহৎ এবং ছত্রিশগড়—দণ্ডকারণ্য আয়তন ও জনসংখ্যা উভয় দিক দিয়াই সর্বক্ষুদ্র বলা যাইতে পারে।

সীমাঃ এই ভূখণ্ডের প্রাকৃতিক সীমা নিম্নরূপঃ ইহার উত্তরে সিন্ধু-গঙ্গার পলি গঠিত সমভূমি, দক্ষিণে পশ্চিমঘাট ও পূর্বঘাট পর্বতের সংযোগস্থল অতিক্রম করিলেই ভারত মহাসাগর, পূর্বে পূর্ব উপকূল অঞ্চল এবং পশ্চিমে পশ্চিম উপকূল অঞ্চল। ইহার রাজনৈতিক সীমারেখা হইলঃ উত্তরে পাঞ্জাব, দিল্লী, উত্তর প্রদেশ, বিহারের উত্তরাংশ এবং পশ্চিমবঙ্গ। দক্ষিণে ভারত মহাসাগর। পূর্বে উড়িষ্যা, অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুর উপকূলসন্নিহিত অংশ এবং পশ্চিমে কেরালা, কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রের উপকূল-সন্নিহিত অংশ।

বর্তমান ইতিহাসঃ স্বাধীনতার পূর্বে এই রাজ্যগুলির অবস্থান ভিন্নরূপ ছিল। মাদ্রাজ (অধুনা তামিলনাড়ু) রাজ্যের আয়তন তখন বৃহৎ ছিল। পূর্বতন মাদ্রাজ রাজ্যের তেলেগুভাষী অঞ্চল, অধুনালুপ্ত হায়দ্রাবাদ রাজ্যের তেলেঙ্গানা

এবং নিজামের রাজ্য যুক্ত করিয়া অন্ধ প্রদেশ গঠিত হয়। পূর্বতন মাদ্রাজ রাজ্যের মালাবার জেলা, কোচিন ও ত্রিবাংকুর দেশীয় রাজ্যগুলি লইয়া পরবর্তীকালে কেরালা রাজ্যের উৎপত্তি। পূর্বতন মাদ্রাজ, বোম্বাই ও হায়দ্রাবাদের কানাড়ীভাষী অঞ্চল এবং পূর্বতন মহীশূরের অন্তর্গত নিজামের দেশীয় রাজ্য লইয়া বর্তমান মহীশূর রাজ্য (অধুনা কর্ণাটক) গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার ফলে মাদ্রাজ রাজ্যের আয়তন বর্তমানে খুবই কম ও উহা সম্প্রতি তামিলনাড়ু নামে পরিচিত হইয়াছে। পূর্বতন দেশীয় রাজ্যগুলিকে জেলারূপে গঠন করিয়া (সম্বলপুর, কেওনঝর, ময়ূরভঞ্জ, ঢেংকানল প্রভৃতি) বর্তমানে উড়িষ্যা রাজ্য গঠন করা হইয়াছে। স্বাধীনতার পর পূর্বতন মালব রাজ্য চারিভাগে বিভক্ত হয়। ইহার পশ্চিমাংশ রাজস্থান, দক্ষিণাংশ মহারাষ্ট্র, মধ্যাংশ মধ্যপ্রদেশের সহিত যুক্ত হয়। ব্রিটিশ যুগের মধ্যভারতের বুন্দেলখণ্ড ও বাঘেলখণ্ডের স্বাধীন রাজ্য দুইটি পরবর্তীকালে মধ্যপ্রদেশের সহিত যুক্ত করা হয়। অনুরূপভাবে পূর্বে গুজরাটী ও মারাঠী ভাষাভাষী বোম্বাই রাজ্যকে পরবর্তীকালে ভাষার ভিত্তিতে বিভাগ করিয়া যথাক্রমে গুজরাট ও মহারাষ্ট্র রাজ্যের পত্তন হয়।

অঞ্চল পরিচয়ঃ এই অঞ্চলটি সাধারণভাবে দক্ষিণের মালভূমি অঞ্চল বলিয়া পরিচিত হইলেও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের অভিন্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আলোচ্য অংশটিকে নিম্নলিখিত অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করা প্রয়োজনঃ

(ক) **উদয়পুর-গোয়ালিয়র-মালব মালভূমিঃ** রাজস্থান রাজ্যের পূর্বাংশ, মধ্য প্রদেশের পশ্চিমাংশ এবং গুজরাটের ও মহারাষ্ট্রের উত্তরের সামান্য অংশ লইয়া এই অঞ্চল গঠিত হইয়াছে।

(খ) **বুন্দেলখণ্ড-বিন্ধ্যাচল-বাঘেলখণ্ড মালভূমি ঃ** পূর্বোক্ত মালভূমির পূর্ব দিকে মধ্যপ্রদেশের মধ্যাংশ, উত্তর প্রদেশের দক্ষিণাংশ এবং বিহারের পশ্চিমের সামান্য অংশ (সাসারাম-ভাবুয়া মহকুমার কিয়দংশ) লইয়া ইহা গঠিত।

(গ) **ছত্রিশগড়-দণ্ডকারণ্য মালভূমিঃ** মধ্যপ্রদেশের সমগ্র দক্ষিণ পূর্বাংশ (রায়গড়, বিলাসপুর, দুর্গ, রায়পুর, বস্তার জেলা), উড়িষ্যার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ (বোলাঙ্গির, কালাহাণ্ডি ও কোরাপুট জেলার অংশ) ও অন্ধ্রের সন্নিহিত অঞ্চল লইয়া ইহা গঠিত।

(ঘ) **ছোটনাগপুর-উড়িষ্যা মালভূমিঃ** সমগ্র দক্ষিণ বিহার, পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলা ও উড়িষ্যার উপকূলাঞ্চল ব্যতীত অবশিষ্ট অংশ লইয়া এই অঞ্চলটি গঠিত।

(ঙ) **দাক্ষিণাত্যের মালভূমিঃ** মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, মহীশূর (অধুনা কর্ণাটক), তামিলনাড়ু ও কেরালা রাজ্যের উপকূল সন্নিহিত অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র অংশ এই মালভূমির অন্তর্গত।

২. প্রাকৃতিক পরিচয়

ভূ-প্রকৃতি ঃ এই মালভূমির মধ্যাংশে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত বিন্ধ্য-সাতপুরা-কাইমুর-মহাকাল-ছোটনাগপুর পার্বত্য অঞ্চল সমগ্র অঞ্চলটিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ইহার উত্তরাংশ উত্তরে সিন্ধু-গঙ্গা সমভূমির দিকে ঢালু হইয়াছে এবং দক্ষিণের অংশ পূর্বদিকে ঢালু বলিয়া নদীগুলি বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে। অপরপক্ষে মধ্যাংশের এই পার্বত্য অঞ্চলটি উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের প্রধান

জলবিভাজিকারূপে কাজ করিতেছে। ক্ষয়ীভূত পর্বত, অনুচ্চ মালভূমি, নদী উপত্যকা দ্বারা গঠিত এই মালভূমি অঞ্চলকে নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করা যাইতে পারেঃ

(ক) **উদয়পুর-গোয়ালিয়র-মালব অঞ্চলঃ** এই মালভূমির পশ্চিমাংশে উত্তর-পূর্ব-দক্ষিণ-পশ্চিম বরাবর আরাবল্লী পর্বত অবস্থিত। আরাবল্লী পর্বতের উত্তরাংশ ধীরে ধীরে পূর্বাংশে গঙ্গা সমভূমির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। এই অংশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ রঘুনাথগড় ১০৫৫ মি. উচ্চ। পর্বতটির মধ্যাংশ বালিয়াড়ী দ্বারা গঠিত বলিয়া বৃষ্টির জল চতুর্দিকের সুউচ্চ বালুকাস্তূপের মধ্যবর্তী অংশে সঞ্চিত হইয়া অনেক নিম্নভূমির (সম্বর হ্রদ) সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার দক্ষিণাংশের মেবার পর্বতে আরাবল্লীর উচ্চতম শৃঙ্গটি (ভোরাট, ১২২৫ মি.) অবস্থিত। আরাবল্লীর পূর্বাঞ্চলের সমভূমিটি, চম্বল, বানস, মাহী প্রভৃতি নদী উপত্যকা দ্বারা গঠিত হইয়াছে। ইহার দক্ষিণে মালব মালভূমির উপর দিয়া নর্মদা নদী প্রবাহিত। নদী উপত্যকার উত্তরাংশ (মাহী-চম্বল-বেতোয়া অববাহিকা) উত্তরের গঙ্গা সমভূমির দিকে মৃদু ঢাল যুক্ত কিন্তু ইহার দক্ষিণাংশ বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতের জন্য অপেক্ষাকৃত খাড়াই ঢাল দেখা যায়।

(খ) **বুন্দেলখণ্ড-বিন্ধ্যাচল-বাঘেলখণ্ড অঞ্চল ঃ** এই মালভূমির উত্তরে যমুনা নদীর দক্ষিণাংশ অপেক্ষাকৃত অল্প উচ্চতাযুক্ত (১৫০—৩০০ মি) ; কিন্তু ইহার দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত হইয়া বুন্দেলখণ্ড ও বাঘেল-খণ্ড মালভূমি অঞ্চল গঠন করিয়াছে। ইহার শাখাগুলি পশ্চিমাংশে (বুন্দেলখণ্ড) প্রায় উত্তর-দক্ষিণ বরাবর বিস্তৃত হইলেও পূর্বাংশে (বাঘেলখণ্ড) ইহার মূল শাখাটি উত্তর-পূর্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক বরাবর বিন্যস্ত হইয়াছে। বাঘেলখণ্ড মালভূমির দক্ষিণে মহাকাল পর্বত ও উত্তরে কাইমুর পর্বত—ইহার মধ্য দিয়া শোন নদী প্রবাহিত হইয়াছে। এই দুই পর্বতের মধ্যবর্তী অংশে অনেকগুলি শাখাপর্বত উত্তর-পশ্চিম-দক্ষিণ পূর্ব বরাবর কয়েকটি সমান্তরাল শ্রেণীতে বিন্যস্ত। বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলের গড় উচ্চতা ৬০০ মি. এবং বাঘেলখণ্ডের সর্বোচ্চ অংশ (প্রতাপপুর ১২২৫ মি) প্রায় ১২০০ মিটার।

(গ) **ছত্রিশগড়-দণ্ডকারণ্য অঞ্চলঃ** মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণ পূর্ব দিকে এই মালভূমি অঞ্চল অবস্থিত। ইহার (ক) পশ্চিমে বাঘেলখণ্ড মালভূমির উচ্চাংশ, মহাকাল পর্বতের পূর্ব ঢাল, অবুঝমার পর্বত, (খ) সমগ্র পূর্বে ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চল এবং (গ) দক্ষিণ পূর্বে পূর্বঘাট পর্বতমালার মহেন্দ্র গিরির অবস্থানের জন্য ইহা একটি পৃথক ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। সমগ্র মালভূমির গড় উচ্চতা ৬০০—৯০০ মি.। মালভূমির উত্তরাংশে মহানদীর প্রধান স্রোতটি প্রবাহিত বলিয়া মধ্যভাগে একটি নিম্ন নদী-অববাহিকার (গড়ে ৪৫০ মি.) সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার দক্ষিণাংশে অর্থাৎ দণ্ডকারণ্য অঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থান পর্বতাকীর্ণ (৪৫০—৯০০ মি.) হওয়ায় ইন্দ্রবতী নদী এবং ইহার শাখা-প্রশাখা (সবরী, সিলেরু, নাগাবতী, বংশধারা প্রভৃতি) উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের ঢালু অংশে নামিয়া গিয়াছে। দণ্ডকারণ্য মালভূমির দক্ষিণ-পূর্ব অংশের (কালাহাণ্ডি উপত্যকা) গড় উচ্চতা ২৫০—৩০০ মি., ইহা আরও পূর্বে গিয়া মহেন্দ্রগিরি পর্বতের সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

(ঘ) **ছোটনাগপুর-উড়িষ্যা অঞ্চলঃ** উপরোক্ত মালভূমির পশ্চিমে এই অঞ্চলটি

অবস্থিত। ছোটনাগপুরের সমগ্র পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাংশে গঙ্গা সমভূমির প্রভাব বর্তমান। এই অংশের উচ্চতা মাত্র ১৫০—৩০০ মি.। কোন কোন ক্ষেত্রে তাহারও কম, শুধুমাত্র উত্তর পূর্বের রাজমহল পর্বত ৩০০—৪৫০ মি. উচ্চ। উত্তরের রাজমহল ও দক্ষিণের মালভূমি অঞ্চল—এই দুইয়ের মধ্য দিয়া দামোদর, বরাকর, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি নদী প্রবাহিত। হাজারীবাগ অঞ্চল এই মালভূমির পশ্চিমাংশের উচ্চ অংশটি (গড় ৬০০ মি.) গঠন করিয়াছে। ইহার দক্ষিণে উড়িষ্যা মালভূমির মধ্যাংশে উত্তর-পূর্ব-দক্ষিণ-পশ্চিম বরাবর পূর্বঘাট পর্বতমালা অবস্থিত হইলেও, ইহার মধ্যবর্তী কয়েক স্থানে উচ্চতা প্রায় সমভূমির ন্যায়, কারণ সেই অংশগুলি ব্রাহ্মণী, বৈতরণী, মহানদী ও তাহাদের অসংখ্য শাখা-প্রশাখার প্রবাহের ফলে গঠিত হইয়াছে। পূর্বঘাট পর্বতমালার গড় উচ্চতা প্রায় ১০০০ মি., মহেন্দ্রগিরি (১৪৯০ মি.), চম্পাঝরণ (১২৫০ মি) প্রভৃতি এই পর্বতাঞ্চলের উল্লেখযোগ্য শৃঙ্গ। এই পর্বতাঞ্চলটি দক্ষিণে বংশধারা, নাগবতী, রুশিকুল্যা নদী এবং উত্তরে মহানদী ও গোদাবরীর শাখানদীর জলবিভাজিকারূপে কাজ করিতেছে।

(৬) **দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলঃ** পশ্চিমে সহ্যাদ্রি (পশ্চিমঘাট) পর্বতমালা পূর্বে পূর্বঘাট পর্বতমালার উচ্চ অংশ, উত্তরে বিন্ধ্য-সাতপুরা-মহাকাল পর্বত ও দক্ষিণে নীলগিরি পর্বতের মধ্যবর্তী স্থান দাক্ষিণাত্যের মালভূমি বলিয়া পরিচিত। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা (মহারাষ্ট্রের সাতমালা, অজন্তা, বালাঘাট এবং মহীশূরের বাবাবুদান পর্বতমালা সহ), পূর্বঘাট পর্বতমালা (অন্ধ্র প্রদেশের এরামালাই, নাল্লা-মালাই, ভেলিকোন্ডা পর্বত সহ) দক্ষিণে প্রসারিত হইয়া তামিলনাড়ুর দক্ষিণাংশে নীলগিরি পর্বতের সহিত মিলিত হইয়াছে। দোদাবেতা (২৬২০ মি.) ইহার উচ্চতম শৃঙ্গ। নীলগিরি হইতে দক্ষিণ দিকে আন্নামালাই, পালনি ও কার্ডামম পর্বত প্রসারিত হইয়াছে। আন্নামালাই পর্বতের আনাইমুদি (২৬৮৪ মি.) দাক্ষিণাত্যের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। এই বন্ধুর ভূ-প্রকৃতির মধ্যে মহারাষ্ট্রে ওয়েন গঙ্গা-ওয়ার্ধা নদী সমভূমি, পেনগঙ্গা-গোদাবরী নদী সমভূমি এবং কর্ণাটকে ভীমা, কৃষ্ণা, তুঙ্গভদ্রা, কাবেরী নদী অববাহিকা অঞ্চলে গঠিত সমভূমি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তামিলনাড়ুর কাবেরী, পান্নিয়ার, ভাইগাই এবং অন্ধ্র প্রদেশের পেন্নার গোদাবরী ও কৃষ্ণা উপত্যকায় সমভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। অবশিষ্ট অংশ উচ্চ ও ক্ষয়ীভূত মালভূমি (৬০০-৯০০ মি.) বলা যায়।

নদ-নদী ঃ এই মালভূমির নদীগুলি অপেক্ষাকৃত নিম্ন পর্বতাঞ্চল ও মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ইহাদের ক্ষয়কার্য কম। শুধুমাত্র বৃষ্টি ধারাপুষ্ট বলিয়া গ্রীষ্মকালে ইহারা প্রায় শুকাইয়া যায়। মালভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় ইহাদের তীব্র স্রোত জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। উত্তর ভারতের নদী-উপত্যকা অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতের নদী উপত্যকায় অপেক্ষাকৃত কম জনবসতি দেখা যায়। (১) আরাবল্লী পর্বতের নদীগুলির কিয়দংশ উত্তরে গঙ্গার শাখানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে এবং কতকগুলি দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া কচ্ছ ও কাম্বে উপসাগরে পড়িয়াছে। (২(বিন্ধ্য পর্বতের উত্তরমুখী নদীগুলি (চম্বল, সিন্দ, বেতোয়া প্রভৃতি) উত্তরে গঙ্গার মূল স্রোতের সহিত যুক্ত হইয়াছে। (৩) মহাকাল পর্বত হইতে উৎপন্ন নর্মদা নদী বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতের মধ্য দিয়া পশ্চিম মুখে প্রবাহিত হইয়া কাম্বে উপসাগরে পড়িয়াছে। এই পর্বতের অপর নদী শোন উত্তরাভিমুখে কাইমুর পর্বত ও বাঘেলখন্ড মালভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া

গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে।(৪) **মহাদেব পর্বত** হইতে উৎপন্ন তাপ্তী নদী উত্তরে সাতপুরা ও দক্ষিণে অজন্তা-সাতমালা পর্বতের মধ্যবর্তী অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত হইয়া পশ্চিমে কাম্বে উপসাগরে পড়িয়াছে। (৫) **ছোটনাগপুর মালভূমির** নদীগুলি (অজয়, দামোদর প্রভৃতি) পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়া গঙ্গা নদীর সহিত যুক্ত হইয়াছে। ইহার দক্ষিণবাহিনী নদীগুলির মধ্যে সুবর্ণরেখা ও ব্রাহ্মণীর (কোয়েল নদীর শাখা সহ) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (৬) **ছত্রিশগড় মালভূমি** হইতে মহানদী ও ইহার শাখানদীগুলি উৎপন্ন হইয়া সম্মিলিত প্রবাহ পূর্বদিকে বঙ্গোপসাগর অভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। (৭) **পশ্চিমঘাট পর্বত** হইতে উৎপন্ন নদীগুলি আয়তনে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ এবং ইহাদের অধিকাংশই পূর্বমুখে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে গোদাবরী (পেনগঙ্গা, মঞ্জরা, ওয়ার্ধা প্রভৃতি শাখা সহ) কৃষ্ণা (ভীমা, তুঙ্গভদ্রা প্রভৃতি শাখাসহ) প্রভৃতি নদী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (৮) **পূর্বঘাট পর্বতের** নদীগুলি আয়তনে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, ইহারা পূর্ব মুখে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। (৯) **তামিলনাড়ুর** দক্ষিণাংশে পশ্চিমঘাট-পূর্বঘাট পর্বতের মিলনস্থল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে পেন্নার, পালার, কাবেরী ও ভাইগাই প্রভৃতি নদী, ইহাদের পূর্বমুখী প্রবাহ বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে।

জলবায়ু ঃ সাধারণভাবে মৌসুমী জলবায়ু অধ্যুষিত অঞ্চলে অবস্থিত হইলেও এই অঞ্চলের জলবায়ুতে (বিশেষতঃ দক্ষিণাঞ্চলে) ভূপ্রকৃতি ও সমুদ্রের প্রভাব এবং কখনও বা মরু অঞ্চলের শুষ্কতার প্রভাব (বিশেষতঃ উত্তর পশ্চিমে) বর্তমান। ইহার ফলে গ্রীষ্মকাল বা শীতকাল কোনটিই উত্তর ভারতের মত তত তীব্র নয়। মৌসুমী বায়ুর আগমন ও প্রত্যাগমনের ফলে দক্ষিণের দেশগুলিতে দুইবার বর্ষাকাল হইলেও সাধারণভাবে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত ৭ মাস (মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশ) হইতে সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত ৩ মাস (তামিলনাড়ু) পর্যন্ত দেখা যায়।

তাপমাত্রা ঃ শীতকালীন তাপমাত্রা উত্তরাংশে ১৫° সে. হইতে দক্ষিণে বাড়িতে বাড়িতে ২৫° সে.-এরও বেশী তাপমাত্রা অনুভূত হয়। এই সময়ে সর্বনিম্ন উত্তাপ মালব, বুন্দেলখণ্ড, বাঘেলখণ্ড এবং ছোটনাগপুর মালভূমিতে পরিলক্ষিত হয়। দণ্ডকারণ্য, উড়িষ্যা, ছত্রিশগড় মালভূমি অঞ্চলে গড় উত্তাপ ১৭.৫° হইতে ২২.৫° সে. পর্যন্ত। ইহার দক্ষিণাংশে মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু ও কর্ণাটক অঞ্চলে গড় উত্তাপ ২২.৫° সে. হইতে ২৫° সে-এরও বেশী। এই অঞ্চলে গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা দক্ষিণ (২৫° সে.) হইতে উত্তরে (৩০° সে.) বৃদ্ধি পায়। মালভূমির উত্তরাংশের গড় তাপমাত্রা ২৭.৫° সে. হইতে ৩২.৫° সে. পর্যন্ত এবং সর্বনিম্ন (২৫°সে.) তাপমাত্রা থাকে মহীশূর সন্নিহিত অঞ্চলে।

বৃষ্টিপাতঃ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মালভূমির উত্তর-পশ্চিম (৪০ সে. মি.) হইতে দক্ষিণ-পূর্বে ১০০ সে. মি.) বাড়িতে থাকে। তবে পশ্চিমঘাট পর্বতের পূর্বাংশের বৃষ্টিপাত রাজস্থানের মরু অঞ্চলের (৬০ সে. মি) মত। ঐ পর্বতের পশ্চিমাংশের বৃষ্টিপাত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার (সর্বোচ্চ ৪০০ সে. মি.) সহিত তুলনীয়। সাধারণভাবে মালভূমির পূর্বাঞ্চলের বৃষ্টিপাত গড়ে ১০০ সে. মি., পশ্চিমাংশে গড়ে ৪০°—১০০° সে. মি. এবং দক্ষিণাংশের উপকূল ব্যতীত সমগ্র অংশে ৬০—১০০ সে. মি.।

মৃত্তিকাঃ এই মালভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকা বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ। দুর্গম বলিয়া

এখনও বহু স্থানের অনুসন্ধান কার্য চলিতেছে। সাধারণভাবে এই মৃত্তিকা তেমন উর্বর না হইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এই সকল মৃত্তিকা তাহাদের নিম্নস্থ ভূতাত্ত্বিক সংগঠনের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া সৃষ্টি হইয়াছে। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে এই অঞ্চলের মৃত্তিকাকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ (ক) **কৃষ্ণ মৃত্তিকাঃ** বিন্ধ্য-সাতপুরা পর্বত এবং পেনগঙ্গা, গোদাবরী, ভীমা, তুঙ্গভদ্রা নদী উপত্যকা মধ্যম কৃষ্ণ মৃত্তিকায় গঠিত। মহাদেব, অজন্তা ও বালাঘাট পর্বতাঞ্চলের মৃত্তিকা ঘন কৃষ্ণবর্ণ (বা রেগুর)। মহাকাল ও মহাদেব পর্বতের মধ্যবর্তী অংশে ওয়ার্ধা নদী উপত্যকায় অগভীর কৃষ্ণ মৃত্তিকা দেখা যায়। এই অংশটিই বিখ্যাত ডেক্যান ট্রাপ' (Deccan Trap) নামে পরিচিত। এই মৃত্তিকা নাইট্রোজেন ও ফসফরাস সমৃদ্ধ না হইলেও ক্যালসিয়াম ও পটাশিয়াম যুক্ত হওয়ায় তুলা চাষের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। এই কারণে এই মৃত্তিকাকে ব্ল্যাক কটন (Black Cotton) মৃত্তিকা বলা হয়। (খ) **রক্তবর্ণ দোঁয়াশ মৃত্তিকা ঃ** উড়িষ্যা মালভূমি এবং সমগ্র তামিলনাড়ু অঞ্চল রক্তবর্ণ দোঁআশ মৃত্তিকায় গঠিত। মধ্য-প্রদেশের পূর্বাংশে বাঘেলখণ্ড, ছত্রিশগড় ও দণ্ডকারণ্য মালভূমি অঞ্চলে ইহা কিছুটা পীতবর্ণের। বিশেষ জৈব পদার্থ সম্পন্ন নয় বলিয়া রাগী প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতীয় শস্য উৎপাদনের জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। (গ) **ল্যাটেরাইটঃ** নিম্ন গঙ্গা সমভূমির পশ্চিমাংশে (পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া ও ছোটনাগপুর অঞ্চল) মহারাষ্ট্রের বালাঘাট পর্বতের দক্ষিণে, মহীশূরের নীলগিরি উপত্যকা এবং অন্ধ্র ও কেরালার উপকূল সন্নিহিত অঞ্চল এই মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। ইহাতে ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ফসফরাস প্রভৃতি খনিজ পদার্থ স্বল্প পরিমাণে থাকায়, ইহার উর্বরা শক্তি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জঃ উপরোক্ত মৃত্তিকা সংগঠনের জন্য এই মালভূমি অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ তেমন সমৃদ্ধশালী নহে। তৎসত্ত্বেও ভারতের সর্ববৃহৎ অরণ্য অঞ্চল এবং সর্বনিম্ন অরণ্য অঞ্চলগুলি এই মালভূমিতেই অবস্থিত। এই সকল অরণ্য হইতে প্রাপ্ত নানাবিধ কাঠ ও বনজ দ্রব্য নানা শিল্পে ব্যবহৃত হয় বলিয়া ভারতের অর্থনীতিতে ইহাদের একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। বৃষ্টিপাতের ভিত্তিতে এই মালভূমি অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জকে প্রধানতঃ (ক) পর্ণমোচী, (খ) স্যাভানা ও শুষ্ক পর্ণমোচী এবং (গ) মরু উদ্ভিদ অঞ্চলে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়।

(ক) **পর্ণমোচী বৃক্ষের বন ঃ** সাধারণতঃ ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা মালভূমি, ছত্রিশগড়-দণ্ডকারণ্য মালভূমি অঞ্চলের ১০০—২০০ সে. মি. বৃষ্টিপাতযুক্ত স্থানে পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়। এই জলাভূমিতে ভারতের বৃহত্তম ও উন্নততম উদ্ভিজ্জ অঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে শাল, সেগুন, আবলুস প্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষ এবং তুঁত, রেশম কীট, লাক্ষা, তার্পিন, হরিতকী, বাঁশ, বেত প্রভৃতি নানাবিধ বনজ দ্রব্য পাওয়া যায়। (খ) **স্যাভানা ও শুষ্ক পর্ণমোচী অঞ্চলঃ** সাধারণতঃ দাক্ষিণাত্যের অন্তরীপ অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানে, বুন্দেলখণ্ড-বাঘেলখণ্ড প্রভৃতি মালভূমির ৫০—১০০ সে. মি. বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চলে স্যাভানা ও শুষ্ক পর্ণমোচী জাতীয় উদ্ভিদের প্রসার দেখা যায়। নানাবিধ তৃণ দ্বারা এই অঞ্চলের ভূপৃষ্ঠ আবৃত। (গ) **মরু জাতীয় কাঁটা ও গুল্ম অঞ্চলঃ** সাধারণতঃ গোয়ালিয়র-উদয়পুর মালব মালভূমি, দাক্ষিণাত্যের উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত মধ্যবর্তী অংশের ৫০ সে. মি. অথবা অপেক্ষাকৃত কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে মরুজাতীয় কাঁটা ও গুল্ম

জন্মিয়া থাকে। এই সকল অঞ্চলে বাবলা, ফনিমনসা প্রভৃতি কাঁটাগাছ জন্মে এবং বৃক্ষজাত ধুনা, গঁদ প্রভৃতি দ্রব্য পাওয়া যায়।

সাংস্কৃতিক ও আর্থিক পরিচয়

এই বিস্তীর্ণ মালভূমি অঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের পটভূমিতে এখানে এক বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক ও আর্থিক জীবনধারা গড়িয়া উঠিয়াছে। উদয়পুর-গোয়ালিয়র মরুপ্রায় অঞ্চলের সহিত ছোটনাগপুর অঞ্চলের ভূপ্রকৃতির সাদৃশ্য থাকিলেও অন্যান্য বিষয়ে অনেক বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। অনুরূপভাবে মহারাষ্ট্র অঞ্চলের শিল্পোন্নয়নের সহিত দণ্ডকারণ্য-ছত্রিশগড় মালভূমির পশ্চাদবর্তিতা সহজেই লক্ষণীয়। সাংস্কৃতিক ও আর্থিক উন্নতির পরিচয় সর্বক্ষেত্রে সমান নয় বলিয়াই পূর্বালোচিত ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি সঙ্গতি রাখিয়া এই মালভূমি অঞ্চলের প্রতিটি অংশের সাংস্কৃতিক ও আর্থিক আলোচনা পৃথকভাবে করা প্রয়োজন।

উদয়পুর-গোয়ালিয়র-মালব মালভূমি

৩. সাংস্কৃতিক পরিচয়

জনসংখ্যাঃ এই মালভূমি অঞ্চলের ৩১৭৮২ বর্গকিলোমিটার এলাকায় প্রায় ২৮ মিলিয়ন লোক বাস করে। সুতরাং এখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ৮৫ জন। এই অঞ্চলের জনসংখ্যার বণ্টনে চম্বল নদী উপত্যকা, আরাবল্লী পর্বত এবং রুক্ষ পার্বত্য অঞ্চলের বিশেষ প্রভাব রহিয়াছে। আরাবল্লীর উত্তরাংশে জয়পুর-আলোয়ার অঞ্চল, দক্ষিণে উদয়পুর-চিতোরগড়-ভিলওয়ারা অঞ্চল এবং মালব মালভূমির চম্বল উপত্যকায় মোরেনা-গোয়ালিয়র-ভিন্দ-বান্সোয়ারা অঞ্চল ও নর্মদা উপত্যকায় ইন্দোর-উজ্জয়িনী-ধার, ভূপাল-সেহোর অঞ্চলে সর্বাধিক জনবসতি দেখা যায়। সাধারণভাবে জনসংখ্যা উত্তর পশ্চিমে আরাবল্লীর মধ্যাঞ্চল হইতে দক্ষিণ-পূর্ব অভিমুখে কমিয়া আসিয়াছে।

জনসংস্কৃতিঃ সমগ্র জনসংখ্যার ৪৩ শতাংশ নানাবিধ কর্মে নিযুক্ত, ইহাদের মধ্যে স্ত্রী-কর্মীর সংখ্যাও প্রচুর। কোন কোন ক্ষেত্রে শিল্পোন্নতি দেখা গেলেও কৃষি ও কৃষি সংক্রান্ত (সমগ্র কর্মীর ৮০ শতাংশ) কাজই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা, অবশিষ্ট জনসংখ্যা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পে নিযুক্ত আছে। বৃহৎ শিল্পগুলি গোয়ালিয়র, উদয়পুর, ভূপাল প্রভৃতি শহরে এবং ক্ষুদ্র কুটির শিল্পগুলি গ্রামাঞ্চলে স্ত্রী-কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত। এই অঞ্চলের শতকরা মাত্র ১৩ জন শিক্ষিত, গোয়ালিয়র শহরে সর্বাধিক সংখ্যক শিক্ষিত লোক বাস করে। হিন্দী ইহাদের ভাষা, তবে স্থানীয় মেবারী, মারোয়াড়ী ভাষাও প্রচলন দেখা যায়।

গ্রাম ও শহরঃ সমগ্র অধিবাসীর ৮২ শতাংশ প্রায় ৬০ হাজারের বেশী ক্ষুদ্র বৃহৎ গ্রামে বাস করে। আরাবল্লী ও চম্বল উপত্যকার তুলনায় মালব মালভূমিতে অধিক সংখ্যক গ্রাম দেখা যায়। সর্বাধিক জনসংখ্যাযুক্ত ঘনবদ্ধ গ্রামগুলি উদয়পুর-চিতোর গড়-দুঙ্গারপুর, আলোয়ার-জয়পুর, উজ্জয়িনী-ধার-মাউ-নরসিংগড় অঞ্চলে দেখা যায়। অবশিষ্ট জনসাধারণ উদয়পুর-গোয়ালিয়র অঞ্চলে ১১০টি ক্ষুদ্র-বৃহৎ শহরে এবং মালব অঞ্চলের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শহরে বাস করে। এই অঞ্চলের অধিকাংশ

শহরই প্রাচীন ঐতিহাসিক গড় বা রাজধানীকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলঃ

উদয়পুরঃ (১১১,১৩৮)ঃ আরাবল্লী পর্বতের পূর্বদিকে অবস্থিত। দিল্লী, আগ্রা, জয়পুর ও আহমেদাবাদের সহিত বিমান পথে যুক্ত। ইহার নিকটবর্তী লৌহ, সীসা, দস্তা, তামা প্রভৃতি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ স্থানগুলির জন্য শহরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সম্প্রতি একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর এখানে বহু পর্যটক সমাগম হয়। **জয়পুর** (৪০৩৪০৪)ঃ রাজস্থানের রাজধানী। আরাবল্লী পর্বতের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়ায় ইহা ব্যবসা, শিল্প ও শিক্ষার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর হইয়া উঠিয়াছে। ইহার নিকটে অভ্রের খনি আছে। স্থানীয়, মৃৎ ও প্রস্তর শিল্পের খ্যাতি আছে। **আজমীরঃ** জেলার প্রধান শহর ও উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য কেন্দ্র। ইহা সড়কপথে দিল্লী, আহমেদাবাদ ও মধ্যপ্রদেশের সহিত যুক্ত। **গোয়ালিয়রঃ** মধ্যপ্রদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে চম্বল উপত্যকায় অবস্থিত। ইহা সড়ক পথে আগ্রা ও ইন্দোরের সহিত যুক্ত। প্রস্তর শিল্প এবং সিগারেট মুদ্রণ ও চিনি শিল্পের জন্য ইহা প্রসিদ্ধ। ইহা একটি রেলকেন্দ্ররূপে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শহর। **কোটাঃ** চম্বল উপত্যকার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য শহর। ইহা রেলপথ ও সড়কপথে দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের অন্যান্য অংশের সহিত যুক্ত। এখানে পশম ও কার্পাস শিল্প কেন্দ্র আছে। **ইন্দোর** (৩৯৪৯৪১)ঃ মধ্য প্রদেশের পুরাতন রাজধানী এবং বর্তমানে বস্ত্র, তুলা, শস্য, সব্জী, করাত কল, কাঠ, পরিবহণ যন্ত্র প্রভৃতির বাণিজ্য কেন্দ্ররূপে খ্যাত। **ভূপাল** ঃ মধ্যপ্রদেশের বর্তমান রাজধানী, সড়কপথে কানপুর ও নাগপুরের সহিত যুক্ত। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, ময়দা ও কাগজ প্রস্তুত শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। **বিবিধঃ** উপরোক্ত শহর ব্যতীত আরাবল্লী অঞ্চলে চিতোরগড়, মাধোপুর, দুঙ্গারপুর, বান্সোয়ারা, চম্বল উপত্যকার ভিন্দ, টংক, ভরতপুর এবং মালব অঞ্চলের উজ্জয়িনী, খরগাঁও, সগর প্রভৃতি শহরও নানা কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৪. আর্থিক পরিচয়

কৃষিজ সম্পদঃ কৃষিকাজ প্রধান জীবিকা হওয়া সত্ত্বেও এই অঞ্চলের ইহা তেমন উন্নত নয়। মূলতঃ খাদ্যশস্য উৎপাদন হইলেও তুলা, তৈলবীজ, তামাক ইত্যাদি পণ্য শস্যও এখানে সামান্য পরিমাণে উৎপাদন করা হয়। **জোয়ারঃ** এই অঞ্চলের প্রধান শস্য। ইহা আরাবল্লীর জয়পুর-টংক; চম্বল উপত্যকার শিবপুরী ও ভিন্দ জেলায় এবং মালব মালভূমির সাজাপুর, উজ্জয়িনী, রাতলাম, ঝালরপত্তন অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। **বাজরা** ঃ মালভূমির উত্তরাংশে ঝুনঝুনু, সিকার প্রভৃতি জেলায়; চম্বল উপত্যকায় মোরেনা, ভরতপুর ও সন্নিহিত অঞ্চলে এবং মালব মালভূমির বান্সোয়ারা অঞ্চলে ইহা উৎপন্ন হয়। **গমঃ** এই অঞ্চলের দ্বিতীয় খাদ্যশস্য। প্রধানতঃ রাজস্থানের আলোয়ার, আজমীর, বুন্দি, কোটা ও মধ্যপ্রদেশের সাগর, বিদিশা, ভূপাল অঞ্চলে উৎপাদন করা হয়। **ভুট্টাঃ** এই মালভূমির প্রায় সর্বত্রই ভুট্টার চাষ হইলেও প্রধানতঃ রাজস্থানের দক্ষিণ-পূর্বে এবং মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। **বার্লিঃ** আরাবল্লীর আলোয়ার, জয়পুর; চম্বল উপত্যকার টংক, ভরতপুর, শিবপুরী অঞ্চলে সামান্য পরিমাণে অন্য শস্যের সহিত চাষ করা হয়। **ডালঃ** চম্বল উপত্যকায় ভিন্দ, মাধোপুর, মোরেনা,

ভরতপুর ; মালব মালভূমির সাগর, সেহোর, বেতুল, গুনা অঞ্চলে ইহার উৎপাদন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **তৈলবীজঃ** চম্বল উপত্যকার ভরতপুর, বুন্দি, কোটা ; মালব মালভূমির হোসাঙ্গাবাদ, খারগাঁও, খান্ডোয়া, মান্ড্য ; প্রভৃতি অঞ্চলে সরিষা, বাদাম, তিল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। **বিবিধঃ** এতদ্ব্যতীত রাজস্থানের দুঙ্গারপুর, বান্সোয়ারা অঞ্চলে ধান ; মালভূমির অন্যান্য অংশে সামান্য পরিমাণে ইক্ষু ও তামাক ; রাজস্থানের দক্ষিণ ও মধ্যপ্রদেশের উত্তর-পূর্বাংশের কৃষ্ণ-মৃত্তিকায় উৎকৃষ্ট তুলা ; চম্বল উপত্যকার নানা স্থানে মেস্তা ও শন উৎপাদন হয়।

সেচ ব্যবস্থা ঃ উন্নত সেচ ব্যবস্থার অভাবে এই অঞ্চলের কৃষিজ উৎপাদন আশানুরূপ নয়। একমাত্র চম্বল উপত্যকা ব্যতীত অন্য কোন স্থানে সেচ
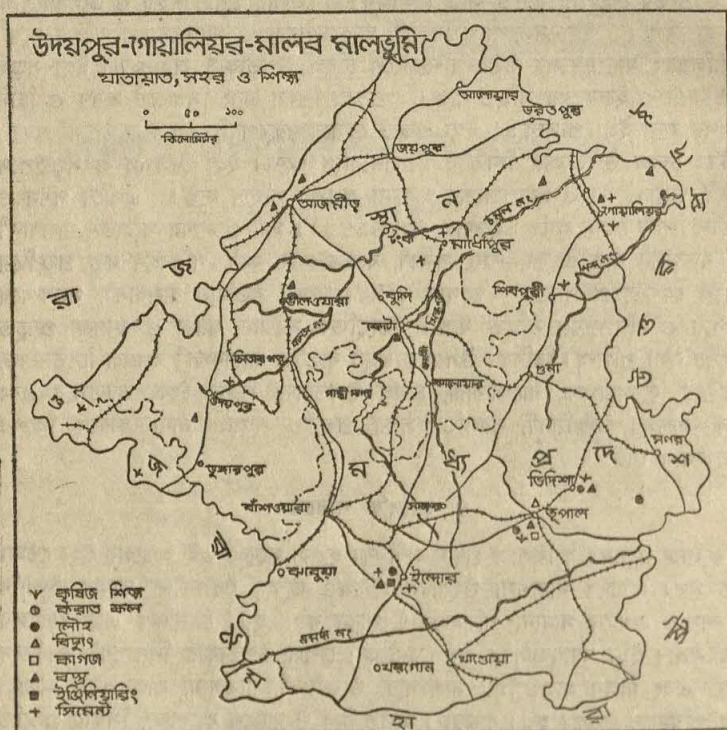
ব্যবস্থা প্রচলিত নাই। গোয়ালিয়র, ভিন্দ, কোটা, বুন্দি অঞ্চলে খালের সাহায্যে শিবপুরী ও মোরেনা অঞ্চলে কূপের মাধ্যমে এবং ভরতপুর, মাধোপুর, টংক প্রভৃতি অঞ্চলে জলাশয়ের মাধ্যমে সেচকার্য হইয়া থাকে। চম্বল নদী পরিকল্পনার কাজ সম্পন্ন হইলে উপত্যকার ৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ করা যাইবে। এই অঞ্চলের পার্বতী নদীতে হারসী বাঁধ (গোয়ালিয়র) ও পগারা বাঁধ (ভিন্দ) নামক ক্ষুদ্র নদী-পরিকল্পনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রাণীজ সম্পদঃ মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর, রাতলাম, উজ্জয়িনী, গুনা প্রভৃতি অঞ্চলে পশুপালন করা হয়। মালোয়ার ও গুনা অঞ্চলে উচ্চ শ্রেণীর মেষ ও

বান্সোয়ারা অঞ্চলে উচ্চ শ্রেণীর ছাগ এবং চম্বল উপত্যকার বিভিন্ন অংশে উট পালিত হয়। গো-সম্পদ ও দুগ্ধ উৎপাদনে মালব মালভূমি অঞ্চল বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন অঞ্চলে যানবাহনরূপে বৃষ, অশ্ব, অশ্বতর প্রভৃতি প্রতিপালন করা হয়।

খনিজ সম্পদঃ এই মালভূমির আরাবল্লী পর্বতাঞ্চল নানাবিধ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। মালব অঞ্চলের খনিজ সম্পদ তুলনায় স্বল্প। **অভ্রঃ** আলোয়ার, সিকার, উদয়পুর, ভিলওয়ারা, ঝাবুয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ইহা পাওয়া যায়। **তামাঃ** মধ্য প্রদেশের সেহোর এবং রাজস্থানের জয়পুর সিকার, গোয়ালিয়র, ভিলওয়ারা, আলোয়ার প্রভৃতি স্থান তামার জন্য প্রসিদ্ধ। **সীসা-দস্তাঃ** রাজস্থানের উদয়পুর, দুঙ্গারপুর, বান্সোয়ারা, আলোয়ার, মাধোপুর অঞ্চল হইতে ভারতের প্রায় সকল সীসা ও দস্তা উৎপন্ন হয়। **লৌহঃ** ঝালরপত্তন, ধার, খাণ্ডোয়া, দেওয়াস, সাগর এবং বুন্দি, চিতোর-গড়, সিরোহী, জয়পুর অঞ্চলে খনি প্রচুর পরিমাণে লৌহ-আকরিক দ্বারা সমৃদ্ধ। **চুনাপাথরঃ** মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র, শিবপুরী, গুনা এবং রাজস্থানের কোটা, বুন্দি প্রভৃতি অঞ্চল চুনাপাথরের জন্য প্রসিদ্ধ। **ম্যাঙ্গানিজঃ** মালব মালভূমির বান্সোয়ারা, ঝাবুয়া এবং আরাবল্লী পর্বতাঞ্চলের উদয়পুর ও অন্যান্য স্থান ম্যাঙ্গানিজ দ্বারা সমৃদ্ধ। **সোপস্টোনঃ** রাজস্থানের বান্সোয়ারা, উদয়পুর, ভিলওয়ারা অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে সোপস্টোন পাওয়া যায়। এই সকল অঞ্চলে ট্যালক নামক খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়। **বিবিধঃ** এতদ্ব্যতীত মধ্যপ্রদেশের বেতুলে গ্রাফাইট, কয়লা ; রাজস্থানের ভরতপুর ও আলোয়ারে ব্যারাইট ; উদয়পুর, দুঙ্গার-পুর, সিরোহী অঞ্চলে এ্যাসবেস্টস, আরাবল্লী পর্বতাঞ্চল হইতে উৎকৃষ্ট মার্বেল ; উদয়পুর হইতে উৎকৃষ্ট পান্না ; দুঙ্গারপুরে ফায়ার ক্লে ; ফুলেরা ও সিকার অঞ্চলে ক্যালসাইট প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শিল্পজ সম্পদ ঃ স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত এই অঞ্চলে তেমন কোন শিল্পোদ্যোগ দেখা দেয় নাই। দেশীয় রাজাদের আমলে এই অঞ্চলে হস্ত ও কুটির শিল্পের প্রসার হইয়াছিল। পরবর্তীকালে ভারত-ভুক্তির পর এই অঞ্চলে স্থানীয় সম্পদের ভিত্তিতে শিল্পোন্নয়ন শুরু হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা, তাপকেন্দ্রের নিকটবর্তিতা, উত্তর ভারতের বাণিজ্যকেন্দ্রগুলির নৈকট্য ইত্যাদি নানা কারণে একমাত্র চম্বল নদী-উপত্যকায়ই উল্লেখযোগ্য শিল্পোন্নয়ন সম্ভব হইয়াছে। **কৃষি-ভিত্তিক শিল্পঃ** জয়পুর, আজমীর, ভিলওয়ারা, কোটা, গোয়ালিয়র, ইন্দোর, উজ্জয়িনী, রাতলাম, খাণ্ডেয়া অঞ্চলে বস্ত্রবয়ন শিল্প ; রাতলাম, উজ্জয়িনী, সেহোর, রাজগড়, উদয়পুর, গোয়ালিয়র অঞ্চলে চিনি প্রস্তুত কেন্দ্র ; ধার সাজাপুর, দেওয়াস, সাগর, পালানপুর, হিম্মতনগর (গুজরাট), অঞ্চলে তৈলশিল্প ; উজ্জয়িনী, ইন্দোর ও সেহোর অঞ্চলে ময়দা শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। **প্রাণী-ভিত্তিক শিল্প ঃ** ইন্দোর ও ভুপাল শহরে ডেয়ারী শিল্প ; ভরতপুর, মাধোপুর টংক অঞ্চলে পশম শিল্প। ইন্দোরে চর্ম, কম্বল ও কার্পেট শিল্প ; ভুপাল, রাতলাম অঞ্চলে অস্থি-চূর্ণ সার বিশেষ উল্লেখযোগ্য শিল্প। **অরণ্য-ভিত্তিক শিল্প ঃ** হোসাঙ্গাবাদ, রাতলাম, ইন্দোর, ভুপাল প্রভৃতি অঞ্চলে কাগজমণ্ড শিল্প ; উদয়পুরে কাঠ, দ্রব্য ও খেলনা ; ঝালোয়ার, হোসাঙ্গাবাদ ও সগর অঞ্চলে করাতকল এবং অন্যত্র দেশলাই নির্মাণ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। **কারিগরী শিল্পঃ** ভুপালে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র (Heavy Electrical Plant) ; ইন্দোর, রাতমাল, উজ্জয়িনী ধার অঞ্চলে তাপ উৎপাদন কেন্দ্র ;

উজ্জয়িনী ও উদয়পুরে রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধ নির্মাণ, গোয়ালিয়র, ভরতপুর অঞ্চলে কৃষিযন্ত্র, রেলওয়ে ওয়াগন এবং গোয়ালিয়রে বয়নশিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **খনিজ-ভিত্তিক শিল্প ঃ** উদয়পুরে দস্তা নিষ্কাশন ; জয়পুরে তাম্র নিষ্কাশন ; গোয়ালিয়রে ইস্পাতের আসবাবপত্র ও বয়নযন্ত্র নির্মাণ ; বুন্দি, মাধোপুর, গোয়ালিয়র অঞ্চলে সিমেণ্ট শিল্প ; কোটা অঞ্চলে কাঁচ শিল্প, গোয়ালিয়র, রাতলাম উজ্জয়িনী ও ইন্দোরে মৃৎ ও চীনামাটি শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। **বিবিধ ঃ** এতদ্ব্যতীত পর্বতসার ও সম্বর হ্রদ হইতে লবণ নিষ্কাশন ; চিতোরগড় ও ভিলওয়ারা অঞ্চলে ভেষজ তৈল প্রস্তুত শিল্প ; চিতোরগড় ও অন্যান্য স্থানে মার্বেল শিল্প ; গোয়ালিয়রের দড়ি ও কার্পেট নির্মাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যোগাযোগ-ব্যবস্থা ঃ এই অঞ্চলের যাতায়াত-ব্যবস্থা তেমন উন্নত নয়। পশ্চিম রেলপথের বিভিন্ন শাখা দ্বারা এই মালভূমির ভূপাল, উজ্জয়িনী, কোটা, শিবপুরী, গোয়ালিয়র এবং আবু, যোধপুর, আজমীর, জয়পুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য শহরগুলি যুক্ত হইয়াছে। এই অঞ্চলে জাতীয় সড়ক ৮ এবং ৩ (উদয়পুর-আজমীর-জয়পুর-আলোয়ার-ভরতপুর হইয়া এবং ইন্দোর-সাজাপুর-গুনা-শিবপুরী-গোয়ালিয়র-মোরেনা হইয়া) উত্তরে দিল্লী এবং দক্ষিণে বোম্বাই শহরের সহিত যুক্ত হইয়াছে। অসংখ্য শাখাপথ দ্বারা এই সকল জাতীয় সড়ক সংযুক্ত। এয়ার-ইণ্ডিয়া বিমান পথের দ্বারা দিল্লী-মোরেনা-গোয়ালিয়র-ভূপাল-ইন্দোর-বোম্বাই, দিল্লী-জয়পুর-উদয়পুর-আহমেদাবাদ প্রভৃতি শহরগুলি যুক্ত হইয়াছে।

বুন্দেলখণ্ড-বিন্ধ্যাচল-বাঘেলখণ্ড অঞ্চল

৩. সাংস্কৃতিক পরিচয়

জনসংখ্যা ঃ এই মালভূমি অঞ্চলের ১৯৪৭৩২ বর্গকিলোমিটার পরিমিত এলাকায় প্রায় ১৫ মিলিয়ন জনসংখ্যা বাস করে। সুতরাং এখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৮৫ জনেরও কম। এই অঞ্চলের ঝাঁসী, বান্দা, ললিতপুর, জব্বলপুর, রেওয়া, সাতনা, বালাঘাট অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব অপেক্ষাকৃত অধিক। তুলনায় বাঘেলখন্ড অঞ্চলের সুরগুজা প্রভৃতি অঞ্চলে জনসংখ্যা অত্যন্ত কম। (প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৪৯ জন মাত্র)। অরণ্য, অনুর্বর ভূমি, প্রতিকূল জলবায়ু ও অনুন্নত যাতায়াত ব্যবস্থার জন্য অন্যান্য অংশে জনবসতি খুবই কম।

জনসংস্কৃতি ঃ সমগ্র অধিবাসীর প্রায় অর্ধাংশ কর্মে নিযুক্ত আছে। শিল্পোন্নতি ও শহর সংস্কৃতি তেমন উন্নত নয় বলিয়া অধিবাসীর প্রায় ৮৫ শতাংশ কৃষি ও কৃষি-সংক্রান্ত কর্মদ্বারা জীবিকার্জন করে। অবশিষ্ট কর্মীরা খনি, অরণ্য, গৃহশিল্প, প্রভৃতি দ্বারা অন্ন সংস্থান করে। পুরুষ কর্মীর সহিত স্ত্রী কর্মীর সংখ্যাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিক্ষার হার এই অঞ্চলে খুবই কম। এই মালভূমির বিন্ধ্যাচল অংশে গোণ্ডা নামে উপজাতীরা অধিক সংখ্যায় বসবাস করে।

গ্রাম ও শহর ঃ সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় ৯০ শতাংশই মালভূমি অঞ্চলের ১০৭৫২৫টি ক্ষুদ্র-বৃহৎ গ্রামে বাস করে। একদিকে উপত্যকা, নদীপ্রবাহ, মালভূমি অপরদিকে খাড়াই ঢাল, পলিভূমির অসম বণ্টন, অনুর্বর মৃত্তিকা, অরণ্য--প্রাচুর্য ইত্যাদি নানা কারণে এই অঞ্চলে ঘনবদ্ধ গ্রামাঞ্চল গড়িয়া উঠে নাই। অবশিষ্ট জনসাধারণ শহরাঞ্চলে বাস করিলেও তাহাদের অর্থনীতিও মূলতঃ কৃষি নির্ভর

বলিয়া সেগুলিকে বর্ধিষ্ণু গ্রাম বলাই সঙ্গত। এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য শহরগুলি হইলঃ

জব্বলপুর ও সন্নিহিত অঞ্চলঃ (৩৬৭০১৪)ঃ নর্মদা নদী হইতে সামান্য দূরে চতুর্দিকে পর্বতবেষ্টিত এই শহরটি এলাহাবাদ-বোম্বাই রেলপথে অবস্থিত। পাইকারী বাণিজ্য-কেন্দ্র, দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়, সেনানিবাস, বন্দুক কারখানা, টেলিকমিউনিকেশন কেন্দ্র প্রভৃতির জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জব্বলপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিবার জন্য এখানে বহু পর্যটক সমাগম হয়। **ঝাঁসী ও সন্নিহিত অঞ্চল** (১৭০,০০০)ঃ বেতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত। এই শহরটি সড়কপথে কানপুর, নাগপুর প্রভৃতি শহরের সহিত যুক্ত। সেনানিবাস, রেলওয়ে কারখানা এবং প্রাচীন ঐতিহাসিক শহররূপে উল্লেখযোগ্য। **মারোয়ারা ও সন্নিহিত অঞ্চল** (৬০৪৭২)ঃ কাট্নী নামে সুপরিচিত, কাটনী ও সুমরার নদীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। প্রধানতঃ কাট্নীর চুন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে খ্যাত। **সাতনা** (৩৮০৪৬)ঃ জব্বলপুর-এলাহাবাদ রেলপথে সাতনা নদীর পূর্বে অবস্থিত। পূর্বে বাঘেলখন্ড দেশীয় রাজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল, বর্তমানে জেলার প্রধান শহর। প্রশাসনিক, ব্যবসা, শিল্প ও শিক্ষাকেন্দ্ররূপে উল্লেখযোগ্য। **চিত্রকূট** (১৫২২০)ঃ স্থানীয় মন্দাকিনী নদী ও এলাহাবাদ-বান্দা সড়কের সংযোগস্থলে অবস্থিত রামায়ণে উল্লিখিত প্রাচীন শহর। নিকটবর্তী কারৈ শহর বর্তমানে ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে। চিত্রকূট মূলতঃ ধর্মীয় ও কারৈ বাণিজ্য শহর। **বিবিধ** ঃ এতদ্ব্যতীত বিন্ধ্যাঞ্চলের খনি শহরে চিরিমিরি (৬৫৬৩) ও উমারিয়া (১১২৭৭), প্রশাসনিক শহর মান্ডালা (১৯৪১৬), বালাঘাট (১৮৯১০), নরসিংপুর (১৭৯৪০), শিল্প-শহর পিম্পরী (১১২৯৬), কাইমুর (১২০১৯) এবং বুন্দেলখণ্ডের প্রশাসনিক শহর ওরাই (২৯৫৮৭), বান্দা (৩৭৪৪১), প্রাচীন ঐতিহাসিক শহর চরুখারী (১৩৩৮৫), রাধ (১৯৪১৯) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৪. আর্থিক পরিচয়

কৃষিজ সম্পদঃ কৃষিকাজ ইহাদের প্রধান জীবিকা হইলেও কৃষিজ উৎপাদন অতি সামান্য। সমগ্র ভূমির মাত্র ৪৩ শতাংশ কৃষি কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। বুন্দেলখণ্ডে জোয়ার ও বাজরা এবং বাঘেলখণ্ডে ধান প্রধান গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য। খাদ্যশস্য ব্যতীত এই অঞ্চলে তিল, সরিষা প্রভৃতি তৈলবীজ এবং ইক্ষু, ডাল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। **জোয়ার-বাজরা** ঃ বুন্দেলখণ্ডের প্রায় সর্বত্রই অল্প-বিস্তর জোয়ার এবং জালাউন অঞ্চলে বাজরা উৎপন্ন হয়। **ধানঃ** বাঘেলখণ্ডের বালাঘাট, মান্ডলা, বুন্দেলখণ্ডের বান্দা ও টিকমগড়ের জলসেচিত অঞ্চলে ইহা উৎপন্ন হয়। **গমঃ** বাঘেলখণ্ডের দামোহ, জব্বলপুর, নরসিংহপুর, সাতনা, রেওয়া এবং বুন্দেলখণ্ডের উত্তরাংশের দোঁয়াশ মৃত্তিকা অঞ্চলে ইহা উৎপন্ন হয়। **বিবিধঃ** এতদ্ব্যতীত বুন্দেলখণ্ডে তৈলবীজ, ডাল, ফল ও সব্জী এবং বাঘেলখন্ড অঞ্চলে ছোলা, জোয়ার, নানাবিধ ডাল, তুলা, ইক্ষু প্রভৃতি এই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ পণ্যশস্য।

সেচ-ব্যবস্থা ঃ দেশীয় রাজাদের আমলে জলসেচের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সেচ-ব্যবস্থার কাজ শুরু হয়। বাঘেলখণ্ডের সাতনা, রেওয়া শাদোল, সিধি, নরসিংহপুর, ছিন্দোয়ারা অঞ্চলে কূপের সাহায্যে এবং ঐ মালভূমির বালাঘাটে ও বুন্দেলখণ্ডের রাঁচী, টিকমগড়, ছাত্রাপুরে জলাশয়ের

মাধ্যমে জলসেচ হয়। বুন্দেলখণ্ডের বেতোয়া, কেন, দশন প্রভৃতি খাল দ্বারা এই অঞ্চলের জালাউন, পান্না, বান্দা, ছাত্রাপুর প্রভৃতি অঞ্চল উপকৃত হয়। এতদ্ব্যতীত বাঁধ ও অন্যান্য পদ্ধতিতে জলসেচ করা হইলেও এই রুক্ষ মালভূমির অতি সামান্য অংশই জলসেচের সুবিধা পায়।

খনিজ সম্পদঃ এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে অধাতব খনিজ পাওয়া যায়। ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য হীরক খনি এই অঞ্চলে অবস্থিত। তুলনামূলকভাবে বুন্দেলখণ্ড অপেক্ষা বাঘেলখণ্ড অঞ্চল খনিজ সম্পদের দিক দিয়া অধিক সমৃদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ। **হীরকঃ** পান্নার হীরকখনি হইতে বর্তমানে বার্ষিক ৩০,০০০ ক্যারেট হীরক পাওয়া যায়। **কয়লাঃ** সিধি, শাদোল, সুরগুজা, মির্জাপুর, ছিন্দোয়ারা প্রভৃতি অঞ্চল কয়লা সম্পদে সমৃদ্ধ। নিকটবর্তী সিমেণ্ট-শিল্প ও তাপ উৎপাদন
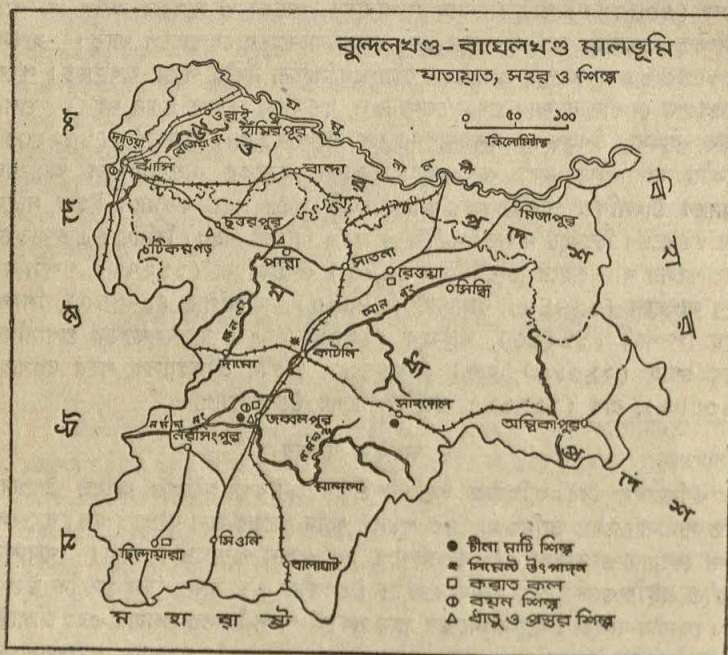
শিল্পে ইহা ব্যবহৃত হয়। **চুনাপাথরঃ** রেওয়া, সাতনা, মির্জাপুর, কাটনী প্রভৃতি অঞ্চলে উৎকৃষ্ট চুন পাওয়া যায়। ইহা সিমেণ্ট শিল্পের কাঁচামালরূপে ব্যবহৃত হয়। **বক্সাইট ঃ** অমরকণ্টক, উমেরগড়, মিরিয়া, হারিয়া অঞ্চলে মধ্যম শ্রেণীর বক্সাইট পাওয়া যায়। এই সকল খনিতে সঞ্চয়ের পরিমাণ খুব অল্প। **নানাবিধ প্রস্তরঃ** গৃহ ও সড়ক নির্মাণের উপযোগী উৎকৃষ্ট কাদাপাথর, বেলেপাথর, গ্রানাইট, ব্যাসাল্ট, মার্বেল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অত্যধিক ভারী বলিয়া ইহা সাধারণতঃ স্থানীয় কাজেই ব্যবহৃত হয়। **নানাবিধ মৃত্তিকাঃ** চীনামাটি ও মৃৎ শিল্পের উপযোগী মাটি, ফায়ার ক্লে, ফুলার্স আর্থ প্রভৃতি নানাবিধ প্রয়োজনীয় মৃত্তিকায় বাঘেলখণ্ড অঞ্চল সমৃদ্ধ। **ম্যাঙ্গানিজঃ** বালাঘাট ও ছিন্দোয়ারা অঞ্চল হইতে মধ্য-

প্রদেশের প্রায় সমগ্র ম্যাঙ্গানিজ সংগৃহীত হয়। **বিবিধঃ** এতদ্ব্যতীত রত্নপ্রস্তর, জিপসাম, কাঁচ প্রস্তুতের বালি, অভ্র, সিলিমেনাইট, তামা, গন্ধক প্রভৃতি বিবিধ খনিজ দ্রব্যে বাঘেলখণ্ড মালভূমি সমৃদ্ধ।

শিল্পজ সম্পদঃ শিল্প সম্পদে এই অঞ্চল বিশেষ অনুন্নত। বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে কাঁচামালের অভাবে কোন বৃহৎ শিল্প গড়িয়া উঠে নাই বলিয়া সেখানে কুটির শিল্পের প্রাধান্য। অপরপক্ষে বাঘেলখণ্ড অঞ্চল যথেষ্ট খনিজ সমৃদ্ধ হওয়ায় সেখানে অপেক্ষাকৃত অধিক শিল্পোন্নয়ন দেখা যায়। **খনি-ভিত্তিক শিল্পঃ** কাট্‌নীর সিমেণ্ট শিল্প, জব্বলপুর ও শাদোলে সেরামিক শিল্প, জব্বলপুরে এ্যাসবেস্টস নির্মাণ, মৃৎশিল্প, কাঁচ নির্মাণ, ক্ষুদ্র কারিগরী শিল্প, রাসায়নিক শিল্প এবং পিম্পরী অঞ্চলে বাঘেলখণ্ড মালভূমির বৃহত্তম এ্যালুমিনিয়াম কারখানা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। **অরণ্য-ভিত্তিক শিল্পঃ** জব্বলপুর, ছিন্দোয়ারা রেওয়া অঞ্চলে করাতকল, সুরগুজায় লাক্ষা শিল্প এবং সর্বত্রই কুটিরশিল্পরূপে তামাক (বিড়ি উৎপাদন) শিল্প প্রচলিত আছে। বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে করাতকল ও কাষ্ঠ শিল্পও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে।

কৃষি-ভিত্তিক শিল্পঃ সমগ্র মালভূমির নানাস্থানে বস্ত্রবয়ন শিল্প, ধানকল, তৈল প্রস্তুত কেন্দ্র, ময়দা প্রস্তুত কেন্দ্র প্রভৃতি কুটির শিল্পরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। হস্তচালিত তাঁত শিল্পের জন্য বুন্দেলখণ্ড অঞ্চল (**ঝাঁসী**) বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। এই অঞ্চলের চান্দেরী, মহেশ্বরী শাড়ী, কোসা রেশম শাড়ী প্রভৃতির বিদেশেও কদর আছে। **বিবিধঃ** এতদ্ব্যতীত বুন্দেলখণ্ডের নানাস্থানে লাক্ষা শিল্প, জুতা নির্মাণ ; ছাত্রাপুরে প্রস্তর ও তামা শিল্প, পান্নার হীরক-কাটার শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যোগাযোগ-ব্যবস্থাঃ যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই অনুন্নত বলিয়া প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও এই অঞ্চলটি তেমন উন্নতি করিতে পারে নাই। জাতীয় সড়ক ৭ (বারানসী-কাট্‌নী-জব্বলপুর-সেওনি-নাগপুর) জাতীয় সড়ক ২৭ (রেওয়া-এলাহাবাদ) জাতীয় সড়ক ২৬ (সাগর-ঝাঁসী-দিল্লী) প্রভৃতি প্রধান সড়ক পথ ছাড়া অন্যান্য অনেক শাখাপথ এই অঞ্চলে প্রসারিত হইয়াছে। মালভূমির মধ্য ও পূর্বাংশে সড়কপথ একেবারে নাই বলিলেই চলে। এই মালভূমিতে কেন্দ্রীয় ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের এলাহাবাদ-কাট্‌নী-জব্বলপুর হইয়া বোম্বাই, ঝাঁসী-বীনা-কাট্‌নী হইয়া বিলাসপুর, জব্বলপুর-বালাঘাট প্রভৃতি শাখা পথগুলি প্রসারিত হইয়াছে। এখানে বিমান পথের কোন শাখা বিস্তৃত হয় নাই।

ছত্রিশগড়-দণ্ডকারণ্য অঞ্চল

৩. সাংস্কৃতিক পরিচয়

জনসংখ্যাঃ বাঘেলখণ্ড মালভূমির দক্ষিণে অবস্থিত এই মালভূমির ১৬২০২৮ বর্গকিলোমিটার পরিমিত এলাকায় প্রায় ১১.১৫ মিলিয়ন লোক বাস করে বলিয়া এখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ৭১ জন। ভারতের মালভূমি অঞ্চলের মধ্যে এই অংশে সর্বনিম্ন জনবসতি দেখা যায়। তুলনামূলকভাবে দণ্ডকারণ্য অপেক্ষা ছত্রিশগড়ের জনসংখ্যা দ্বিগুণের কিছু বেশী। সাধারণভাবে ছত্রিশগড়ে মহানদী এবং দণ্ডকারণ্যে মহানদীর প্রধান শাখা তেল ও ইন্দ্রবতী নদী অববাহিকা

অঞ্চলেই সর্বাধিক জনবসতি দেখা যায়। অন্যান্য অংশে জনসংখ্যা বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করে।

জনসংস্কৃতিঃ সমগ্র কর্মীর প্রায় ৮০ শতাংশই কৃষি ও কৃষিসংক্রান্ত কর্ম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। স্থানীয় খনিজ সম্পদ ভিত্তি করিয়া যে সকল শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, সেখানেও বেশ কিছু কর্মী নিযুক্ত আছে। ভিলাই ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হওয়ায় ছত্রিশগড় অঞ্চলে বহু বহিরাগতের সমাগম হইয়াছে। শিক্ষার হার এই অঞ্চলে খুবই নিম্ন। অধিবাসীদের মধ্যে আদিবাসীদের (গোণ্ডা, বোণ্ডা, কয়া, পরোজা প্রভৃতি) সংখ্যাই বেশী। ইহাদের সমাজজীবনে এখনও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে নাই।

গ্রাম ও শহরঃ সমগ্র অধিবাসীর প্রায় ৮৫ শতাংশই ছত্রিশগড় অঞ্চলের ১৩৫৬৬ এবং দণ্ডকারণ্যের অসংখ্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ গ্রামে বাস করে। এই সকল গ্রাম মহানদী, তেল, ইন্দ্রবতী নদী অববাহিকার দূরবর্তী স্থানে সমগ্র মালভূমি জুড়িয়া গড়িয়া উঠিয়াছে তবে উত্তরাংশের বাঘেলখণ্ড সন্নিহিত ভূমিতে ইহাদের সংখ্যা তুলনায় কম। অবশিষ্ট জনসংখ্যা ছত্রিশগড়-দণ্ডকারণ্যের ৪৪টি ক্ষুদ্র-বৃহৎ শহরে বাস করে। অধিকাংশ শহরই পুরাতন দেশীয় রাজাদের গড়, খনি-অঞ্চল, বর্ধিষ্ণু গ্রাম অথবা বর্তমানের প্রশাসনিক স্থান কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। **বিলাসপুরঃ** মহানদী অববাহিকায় অবস্থিত ৫০ হাজারের বেশী লোকসংখ্যা যুক্ত শহর। বস্ত্রশিল্প, খাদ্যশস্য, গালা-শিল্প, করাতকল, তামা শিল্পের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সড়ক ও রেলপথে নিকটবর্তী বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির সহিত যুক্ত। **রায়পুরঃ** জেলার প্রধান শহর ও নব-নির্মিত ভিলাই শহরের পূর্বে অবস্থিত। খাদ্যশস্যের বাণিজ্যকেন্দ্র অরণ্যজাত শিল্পের জন্য খ্যাত। **ভিলাই ঃ** মহানদী উপত্যকার দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে অবস্থিত নবনির্মিত ইস্পাতনগর। দুর্গ অঞ্চলের লৌহ, কয়লা, রায়পুর ও বিলাসপুরের চুনাপাথর, বালাঘাট অঞ্চলের ম্যাঙ্গানীজ দ্বারা এই শিল্পটি গড়িয়া উঠিয়াছে। **রায়গড়ঃ** জেলার প্রধান শহর এবং হীরাকুদ বাঁধের অতি নিকটে মহানদীর তীরে অবস্থিত। খাদ্য-শস্য ও অরণ্যজাত দ্রব্যের বাণিজ্যকেন্দ্র রূপে খ্যাত। **দুর্গঃ** সড়কপথে নাগপুর ও সম্বলপুর হইয়া কলিকাতার সহিত যুক্ত মহানদী অববাহিকায় অবস্থিত। এখানে লৌহখনি আছে, ইহা ভিলাইয়ের ইস্পাতকেন্দ্রে ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় তামাক শিল্প ও করাত কল শিল্পও উল্লেখযোগ্য। **জগদলপুরঃ** দণ্ডকারণ্য অঞ্চলের মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলার প্রধান শহর। প্রশাসনিক কেন্দ্র হইলেও, এই শহরটি খাদ্যশস্য, অরণ্য দ্রব্য সংক্রান্ত ব্যবসায়ে গুরুত্বপূর্ণ। **বিবিধঃ** এতদ্ব্যতীত, উড়িষ্যা-অন্ধ্র সীমান্তের শ্রীকাকুলাম জেলার প্রধান শহর সালুর (২৬১১১), পার্বতীপুর (২৫২৮১), দণ্ডকারণ্যের অন্তর্গত উড়িষ্যার কোরাপুট জেলার যেপুর (২৫২৯১) ও কালাহাণ্ডি জেলার প্রধান শহর ভবানী পাটনা (১৪৩০০) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৪. আর্থিক পরিচয়

কৃষিজ সম্পদঃ গভীর খাদ, অরণ্য ও মৃত্তিকাস্তর ক্ষীণ হওয়ায়, মাত্র ৩৪ শতাংশ জমিতে কৃষিকাজ হয়। তন্মধ্যে ছত্রিশগড় অঞ্চলের কৃষিজমি তুলনায় বেশী। ধান এই অঞ্চলের প্রধান উৎপাদন। সমগ্র কৃষি জমির ৮০ শতাংশেই মধ্য প্রদেশের অধিকাংশ ধান্য উৎপন্ন হয়। ছত্রিশগড় মালভূমির মধ্যাংশের সমভূমিতে ধান্যের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য। অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও অনুর্বর ভূখণ্ডে তিসি, তিল, বাদাম,

সরিষা প্রভৃতি তৈলবীজ এবং রায়গড় অঞ্চলে তুলা ও শন জন্মে। দণ্ডকারণ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে তৈলবীজ, ভুট্টা, জোয়ার, ডাল, প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। ইহাদের উৎপাদন তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

সেচ ব্যবস্থাঃ এই অঞ্চলে কৃষি ব্যবস্থা সেচ-নির্ভর। ছত্রিশগড় অঞ্চলের প্রায় সর্বত্রই (গড়ে ১১.৬%) সেচ-ব্যবস্থা আছে, তবে রায়পুর অঞ্চলে ইহার সুবিধা বেশী। রায়গড়ে কোন প্রকার সেচ-ব্যবস্থা নাই। দণ্ডকারণ্য অঞ্চলে বাঁধ, জলাশয়, কূপ ও নলকূপের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত উন্নত সেচ-ব্যবস্থা দেখা যায়। এখানে বর্তমানে উমেরকোট, পালানজোড়, পারালকোট বাঁধ পরিকল্পনার মাধ্যমে ৪৭৫৫০ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছে, তবে ইহারা সমগ্রভাবে ৫৭০৬০ একর জমিতে জলসেচ করিতে পারিবে। এই সকল বাঁধ হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা আছে।

বনজ সম্পদঃ সমগ্র ভূমির প্রায় ৪০ শতাংশই অরণ্যাবৃত হওয়ায় এই অঞ্চল নানাবিধ বনজ সম্পদে পূর্ণ। তন্মধ্যে আসবাব তৈয়ারীর কাঠ, কেন্দুপাতা, জ্বালানী কাঠ, মহুয়া, লাক্ষা, খয়ের, কাগজ শিল্পের উপযোগী ঘাস, তসর প্রস্তুতের কীট, বাঁশ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

খনিজ সম্পদঃ মধ্যপ্রদেশের এই অঞ্চলটি চুনাপাথর, বক্সাইট, লৌহ প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যে সমৃদ্ধ। স্থানীয় চাহিদা বিশেষ না থাকায় এই সকল মূল্যবান দ্রব্য বাহিরে চালান যায়। **চুনাপাথরঃ** ছত্রিশগড়ে রায়পুর শহরের চতুষ্পার্শ্বে বিলাসপুরে (আকাল তারা, জয়রামনগর), দণ্ডকারণ্যের বস্তারে ও উড়িষ্যার কোরাপুটে প্রচুর পরিমাণে চুনাপাথর পাওয়া যায়। উড়িষ্যার কালাহাণ্ডি জেলার চুন কিছুটা নিম্নমানের। **লৌহঃ** ছত্রিশগড় মালভূমির দক্ষিণাংশে, দুর্গ ও রায়পুর জেলার কয়েকটি স্থানে এবং দণ্ডকারণ্যের বস্তারে সর্বাধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। উড়িষ্যার কোরাপুট ও কালাহাণ্ডিতে ইহার পরিমাণ নিতান্তই অল্প। **বক্সাইটঃ** ছত্রিশগড়ের বিলাসপুর (কোরবা), দুর্গ (রাজনন্দগাঁও) এবং দণ্ডকারণ্যেও বক্সাইট পাওয়া যায়। **ডলোমাইটঃ** চুনাপাথরের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় ইহা ছত্রিশগড়ের মধ্যাংশের সমভূমিতে, রায়পুর, বিলাসপুর এবং দণ্ডকারণ্যের কোন কোন অঞ্চলে পাওয়া যায়। **কয়লাঃ** ছত্রিশগড়ে ব্রাহ্মণী ও মহানদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে (বিলাসপুরের কোরবা), নিম্ন ব্রাহ্মণী উপত্যকা (রায়গড়) প্রভৃতি কয়লা সম্পদে সমৃদ্ধ। **কোয়ার্টজঃ** ছত্রিশগড়ের রায়পুর, বিলাসপুর অঞ্চলে এবং দণ্ডকারণ্যের বস্তার (জিরাম), কোরাপুট (ফলোপুর) অঞ্চলে ইহা পাওয়া যায়। **বিবিধঃ** এতদ্ব্যতীত ছত্রিশগড়ের বিলাসপুর, দুর্গ, রায়পুরে কাদাপাথর; বিলাসপুরে স্বল্প পরিমাণে ম্যাঙ্গানীজ; দুর্গ (খয়রাগড়) ও রায়পুরে স্বর্ণ, দুর্গ (চাঁদনী ডোঙ্গরী) জেলায় সীসা; দণ্ডকারণ্যের কোরাপুট ও বস্তারে চীনামাটি এবং সমগ্র মালভূমির নানা-স্থানেই নানাবিধ মূল্যবান প্রস্তর পাওয়া যায়।

শিল্পজ সম্পদঃ বহুবিধ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ হইলেও এই অঞ্চলের ৫০ শতাংশ শিল্পভিত্তিক, ২৫ শতাংশ অরণ্য-ভিত্তিক এবং অবশিষ্টাংশ খনিজ, প্রাণীজ ও অন্যান্য প্রকৃতির। তুলনামূলকভাবে ছত্রিশগড় অঞ্চলে অধিক শিল্পোন্নয়ন হইয়াছে। **কৃষি-ভিত্তিক শিল্পঃ** ছত্রিশগড়ে রায়পুর, বিলাসপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ২৫৮টি এবং দণ্ডকারণ্যের জগদলপুর, নওরংপুর অঞ্চলে ১৫০টি ধানকল; ছত্রিশগড়ের ভাটপাড়া, বিলাসপুর, খারাসিয়া এবং দণ্ডকারণ্যের কোন কোন স্থানে

খাদ্য সংক্রান্ত শিল্প ; বিলাসপুর, দুর্গ, রায়গড় এবং দণ্ডকারণ্যের বস্তারে তৈল প্রস্তুত শিল্প ; ছত্রিশগড়ে সর্বত্রই হস্তচালিত তাঁত ; বিলাসপুর ও দুর্গে বস্ত্রবয়ন কেন্দ্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **প্রাণী-ভিত্তিক শিল্প :** ছত্রিশগড় অপেক্ষা দণ্ডকারণ্য অঞ্চলে প্রচুর পশুপালন হইলেও, এখানে তেমন প্রাণীভিত্তিক শিল্প দেখা যায় না। তন্মধ্যে বস্তারে চর্মশিল্প ; কালাহাণ্ডিতে চর্ম প্রস্তুত কেন্দ্র ; স্থানীয় আদিবাসী-দের ঢোল নির্মাণ ; বস্তারে মৌমাছি পালন ও রেশমকীট উৎপাদন প্রভৃতি শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। **অরণ্য-ভিত্তিক শিল্প:** ছত্রিশগড় (রায়পুর, দুর্গ) এবং দণ্ডকারণ্যের ১০০টি করাতকল এই অঞ্চলের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় কাঠের ভিত্তিতে আসবাব নির্মাণ, রেলওয়ে স্লিপার নির্মাণ, কেন্দুপাতা হইতে বিড়ি শিল্প, মধু-লাক্ষা প্রভৃতি কুটির শিল্প, তসরকীট সংগ্রহ দ্বারা তসর প্রস্তুত প্রভৃতি নানা শিল্প রায়পুর, বিলাসপুর, দুর্গ, জগদলপুর, কালাহাণ্ডি ও কোরাপুট অঞ্চলে উন্নতি করিতেছে। **খনি-ভিত্তিক শিল্প :** ছত্রিশগড় অঞ্চলে ভিলাই নগরে স্থানীয় কাঁচামালের ভিত্তিতে একটি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা এবং রায়পুর, দুর্গ ও বিলাসপুরেও নানাবিধ লৌহজাত শিল্প আছে। ভিলাই ইস্পাত কেন্দ্রের উপ-উৎপাদনরূপে এখানে আলকাতরা, সালফিউরিক এ্যাসিড, বেনজল, এ্যামোনিয়াম-সালফেট ইত্যাদি রাসায়নিক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ভিলাইয়ে একটি সিমেণ্ট কারখানাও আছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা: এই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত। মালভূমির প্রায় মধ্যাংশ দিয়া পূর্ব-পশ্চিম বরাবর কলিকাতা-রায়পুর-নাগপুর এবং রায়পুর-বিশাখাপত্তন, সড়কপথ দুইটি ভিন্ন অন্য কোন উল্লেখযোগ্য সড়কপথ নাই। সমগ্র দণ্ডকারণ্যে রেলপথ একেবারেই নাই। শুধুমাত্র দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের কাটনী-বিলাসপুর-রায়পুর-বিশাখাপত্তন-রাউরকেল্লা-বিলাসপুর-রায়পুর-নাগপুর রেলপথ দুইটি ছত্রিশগড় অঞ্চলকে যুক্ত করিতেছে। বিমানপথের ব্যবস্থাও নিতান্ত অনুল্লেখ্য, যদিও ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের একটি শাখা ছত্রিশগড় অঞ্চলের রায়পুর ও দুর্গ অঞ্চলে সাময়িকভাবে অবতারণ করে।

ছোটনাগপুর-উড়িষ্যা মালভূমি

৩. সাংস্কৃতিক পরিচয়

জনসংখ্যা: মধ্য-গঙ্গা সমভূমির দক্ষিণে অবস্থিত এই অঞ্চলের ১৬৩২৩৯ বর্গকিলোমিটার পরিমিত এলাকায় প্রায় ২০ মিলিয়ন জনসংখ্যা বাস করে বলিয়া এখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ১২০ জন। সমগ্র মালভূমি অঞ্চলের মধ্যে এই অঞ্চলটিতেই গড়ে সর্বাধিক জনবসতি গড়িয়া উঠিলেও উড়িষ্যা মালভূমিতে ইহা অনেক কম। ছোটনাগপুর অঞ্চলের দামোদর, ময়ূরাক্ষী, সুবর্ণরেখা, উত্তর কোয়েল এবং উড়িষ্যার মালভূমিতে মহানদী ও শংখনদীর বিভিন্ন অববাহিকা অঞ্চলে সর্বাধিক জনবসতি গড়িয়া উঠিয়াছে।

জনসংস্কৃতি: প্রচুর খনিজ দ্রব্য দ্বারা সমৃদ্ধ হইলেও এই অঞ্চলের অর্থনীতি একান্তভাবেই কৃষি নির্ভর। ছোটনাগপুর মালভূমির গড়ে ৭৭ জন কৃষিজীবি, কেবলমাত্র ধানবাদ ও সিংভূম জেলায় খনি সংক্রান্ত ও অন্যান্য কর্ম দ্বারা প্রায় অর্ধাংশ লোক জীবিকার্জন করে। এই অঞ্চলের জনসংখ্যায় আদিবাসীর সংখ্যা

বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হাজারীবাগ, পালামৌ, ধানবাদ, সাঁওতাল পরগনা এবং সম্বলপুর প্রভৃতি অঞ্চলে মুণ্ডা, ওঁরাও, বিরহোর, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসী বাস করে। একমাত্র ধানবাদ ও জামসেদপুর ব্যতীত সমগ্র অঞ্চলে শিক্ষার হার বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

গ্রাম ও শহরঃ সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় ৮৬ শতাংশ ছোটনাগপুর-উড়িষ্যা মালভূমির গ্রামাঞ্চলে বাস করে। নদী অববাহিকার গ্রামগুলি ঘনবসতি হইলেও কেওনঝর, ময়ূরভঞ্জ, ফুলবনী প্রভৃতি অঞ্চলে ভৌগোলিক পরিবেশের জন্য ইহারা বিক্ষিপ্ত হইয়া বাস করে। সমগ্র মালভূমির শহরবাসীরা ক্ষুদ্র-বৃহৎ ৯৮টি শহরের অধিবাসী, তন্মধ্যে ছোটনাগপুর অঞ্চলেই শহরের (৭০) সংখ্যা বেশী। এই অঞ্চলের জামসেদপুর ও রাঁচী শহর (city) পর্যায়ের, অন্যান্যগুলি (বারিপদা, কেওনঝর, সম্বলপুর, ফুলবনী, চাইবাসা, ডালটনগঞ্জ, হাজারীবাগ প্রভৃতি) অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র।

জামসেদপুর (৩২৮০০০)ঃ সুবর্ণরেখা নদীর তীরে অবস্থিত বিহারের তথা ভারতের একটি বৃহৎ লৌহ ও ইস্পাতকেন্দ্র। বিখ্যাত টিসকো (TISCO) শিল্প কারখানায় ইঞ্জিন, মালগাড়ী, টিনপ্লেট, কাঁটাতার প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের দ্বারা বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত যুক্ত। **রাচী** (১২০,০০০)ঃ চাইবাসা-হাজারীবাগ-ডালটনগঞ্জ সড়কের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, বিহার রাজ্যপালের গ্রীষ্মাবাস, রেশম ও লাক্ষা গবেষণাগার, বিশ্ববিদ্যালয় নিকটবর্তী উন্মাদাশ্রম ও নানাবিধ শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। **ধানবাদঃ** পশ্চিমবঙ্গ-বিহার সীমান্তে ঝরিয়া কয়লাখনির নিকটে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ খনিশহর। সড়কপথ ও রেলপথ দ্বারা কলিকাতা ও উত্তর ভারতের সহিত সংযুক্ত। রেলপথের কেন্দ্র, খনিবিদ্যালয় ও বাণিজ্য শহর-রূপে খ্যাত। **বোকারো** ঃ দামোদর উপত্যকায় অবস্থিত খনি অঞ্চল। এখানে একটি তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও ভারত-রাশিয়া সহযোগিতায় স্থাপিত একটি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা আছে। **সিন্ধ্রিঃ** ধানবাদের নিকটবর্তী শহর, রাসায়নিক সার প্রস্তুতের জন্য শহরটি উল্লেখযোগ্য। **রাউরকেল্লা** (৯০২৮৭)ঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে কোয়েল ও ব্রাহ্মণী নদীর মিলনস্থলে অবস্থিত ইস্পাত নগরী। ভারত-জার্মান সহযোগিতায় এখানে একটি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। শিল্প ও বসতি নগরী রূপে খ্যাত। **সম্বলপুরঃ** মহানদীর তীরে অবস্থিত এই শহরটি কার্পাস বস্ত্র ও রেলওয়ে সরঞ্জাম নির্মাণের জন্য খ্যাত। ইহার নিকটে মহানদীর উপর হীরাকুঁদ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সাহায্যে একটি এ্যালুমিনিয়াম কারখানা চলিতেছে। **বিবিধ** ঃ এতদ্ব্যতীত বিহারের নোয়ামুণ্ডি-ঘাটশিলা মোসোবানি লৌহ ও তাম্র খনি শহর। ঝুমরি-তিলাইয়া-গিরিডি অভ্র খনিশহর, হাজারীবাগ-ডালটনগঞ্জ-চাইবাসা-পুরুলিয়া প্রভৃতি প্রশাসনিক শহর এবং উড়িষ্যা মালভূমির কেওনঝর খনিশহর ও ময়ূরভঞ্জ-বোলাঙ্গীর-ফুলবনী প্রভৃতি প্রশাসনিক শহর বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৩. আর্থিক পরিচয়

কৃষিজ সম্পদঃ ধান এই অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য বলিয়া ইহার উৎপাদন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত এখানে গম, ভুট্টা,, তৈলবীজ ইত্যাদির চাষ করা হয়। **ধানঃ** উড়িষ্যার মহানদী, ব্রাহ্মণী, বৈতরণী, রুশিকুল্যা নদী উপত্যকায় এবং ছোটনাগপুরের সাঁওতাল পরগনা, ধানবাদ, সিংভূম, পালামৌ, হাজারীবাগ

অঞ্চলে ইহার উৎপাদন উল্লেখযোগ্য। **ভুট্টাঃ** ছোটনাগপুরের সাঁওতাল পরগনা, হাজারীবাগ, রাঁচী প্রভৃতি অঞ্চলে ইহা উৎপন্ন হয়। উড়িষ্যায় ইহার উৎপাদন খুবই সামান্য। **গমঃ** উড়িষ্যার সম্বলপুর, বোলাঙ্গীর, সুন্দরগড়, ফুলবনী প্রভৃতি জেলার পার্বত্য অংশে ইহার উৎপাদন সীমিত এবং ছোটনাগপুর অঞ্চলেও ইহা তেমন গুরুত্বপূর্ণ ফসল নয়। **বিবিধঃ** হাজারীবাগ ও রাঁচীতে রাগী ; পালামৌ, সাঁওতাল পরগনায় ছোলা ; ধানবাদ ও রাঁচীতে সব্জী ; উড়িষ্যার বোলাঙ্গীর, সুন্দরগড়,ঢেংকানলে বাজরা-জোয়ার ; ফুলবনী, সুন্দরগড়, কেওনঝর অঞ্চলের পর্বত-পাদদেশে নানাবিধ ডাল ও তৈলবীজ ; নদীপার্শ্ববর্তী এলাকায় সামান্য পাট ; গঞ্জাম সম্বলপুর, বোলাঙ্গীর অঞ্চলে ইক্ষু ; কটক, সুন্দরগড়, বোলাঙ্গীর ও সম্বলপুরে কলা, কমলা, পেয়ারা, আম ইত্যাদি নানাবিধ অম্ল ফল উৎপন্ন হয়।

সেচ-ব্যবস্থাঃ ছোটনাগপুর মালভূমির দামোদর নদীর বিভিন্ন অংশে (তিলাইয়া, কোনার, মাইথন, পাঞ্চেৎ) বাঁধ দিয়া হাজারীবাগ, বোকারো, গিরিডি, বরাকর, তিলাইয়া ধানবাদ অঞ্চলে জলসেচ করা সম্ভব হইয়াছে। উড়িষ্যার মহানদী প্রকল্প (হীরাকুদ বাঁধ) দ্বারা সম্বলপুর ও বোলাঙ্গীর জেলা, গঞ্জামে জোরো ও হাডাবঙ্গু বাঁধ প্রকল্প, ঢেংকানলে, দরজাং বাঁধ প্রকল্প, কেওনঝরে সালান্ডি প্রকল্প ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে খাল-সেঁচিত অঞ্চলগুলিকে দ্বিগুণ করিবার প্রয়াস চলিতেছে। উপরোক্ত প্রকল্প দ্বারা সম্বলপুর, ঢেংকানল, গঞ্জাম অঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থা বিশেষ উপকৃত হইতেছে।

প্রাণীজ সম্পদঃ মালভূমির বিভিন্ন অঞ্চলে গরু, মহিষ, মেষ প্রভৃতি প্রতিপালন করা হয়। তবে সর্বত্রই ইহাদের শ্রেণী নিম্নমানের বলিয়া দুগ্ধের উৎপাদন অত্যন্ত কম। এবং ইহা কখনই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে প্রতিপালন করা হয় না। পশু খাদ্য এই অঞ্চলের পশু পালনের একটি প্রধান সমস্যা। আদিবাসীরা শূকর পালন করে। এই অঞ্চলের দ্রুত শিল্পায়নের সহিত ডিম, মাংস, দুধ, ইত্যাদির চাহিদা বাড়িতেছে বলিয়া সরকারী উদ্যোগে সম্বলপুর, রাউরকেল্লা, ভঞ্জনগর, অঙ্গুল ও অন্যান্য নানা শহরে পশুপালন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। সম্প্রতি আভ্যন্তরীণ নদী হইতে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য শিকার হইতেছে। হীরাকুন্দ জলাধার হইতে প্রত্যহ ১০০০ মণ মৎস্য নিকটবর্তী ভিলাই, রাউরকেল্লা ও অন্যান্য শহরে প্রেরণ করা হয়।

বনজ-সম্পদঃ এই মালভূমির অরণ্য অঞ্চল নানাবিধ বনজ সম্পদে পূর্ণ। তন্মধ্যে হাজারীবাগ-পালামৌ-সিংভূম অরণ্যের বাঁশ, সাবাই ঘাস, শাল, মূল্যবান কাঠ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উড়িষ্যার ফুলবনী, সুন্দরগড়, সম্বলপুর জেলার অরণ্য হইতে বাঁশ, কেন্দুপাতা, তসরকীট, লাক্ষা, বেত, মহুয়া, আঠা, রজন, খয়ের প্রভৃতি সংগৃহীত হয়।

খনিজ সম্পদঃ এই মালভূমি অঞ্চলে ভারতের নানাবিধ খনিজ দ্রব্য ৪০—১০০ শতাংশই সঞ্চিত আছে। কোন কোন খনিজ পদার্থ উৎপাদনে ইহাই শ্রেষ্ঠ অঞ্চল। এই সকল খনিজ কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট এলাকায় (Belt) সীমাবদ্ধ। তন্মধ্যে কয়লা, লৌহ, চুনাপাথর, তামা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **কয়লাঃ** দামোদর নদী-উপত্যকার বরাকর, ঝরিয়া হইতে ডালটনগঞ্জ বিস্তীর্ণ অঞ্চলটি উৎকৃষ্ট বিটুমিনাস কয়লা খনির উৎস। উড়িষ্যায় কয়লা প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও বর্তমানে কেবলমাত্র সম্বলপুর ও তালচের (ঢেংকানল) হইতে কয়লা উৎপন্ন হয়। **লৌহঃ** ছোটনাগপুর অঞ্চলে উৎকৃষ্ট হেমাটাইট কয়লা পাওয়া যায়। এখানে প্রায় ১০৪৭ মিলিয়ন টন

লৌহ আকরিক সঞ্চিত আছে। উড়িষ্যা মালভূমির কেওনঝর, সুন্দরগড়, ময়ূরভঞ্জ, সম্বলপুর অঞ্চলে ভারতের ১/৩ অংশ লৌহ সঞ্চিত আছে। **তাম্রঃ** ছোটনাগপুরের চক্রধরপুর, সিংভূম, মোসাবানি অঞ্চল এবং উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ ও বোলাঙ্গীর অঞ্চল উৎকৃষ্ট তাম্র আকরিক সমৃদ্ধ। **চুনাপাথরঃ** ছোটনাগপুরের পালামৌ, হাজারীবাগ, রাঁচী, সিংভূম অঞ্চলে, উড়িষ্যার সুন্দরগড়, সম্বলপুর অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে চুনা-

পাথর সঞ্চিত আছে। ইহা জামসেদপুর, রাউরকেল্লা প্রভৃতির লৌহ ও ইস্পাত কেন্দ্রে ব্যবহৃত হয়। **বক্সাইটঃ** ছোটনাগপুরের রাঁচী, পালামৌ প্রভৃতি অঞ্চল এবং উড়িষ্যার বোলাঙ্গীর সম্বলপুর অঞ্চল প্রচুর বক্সাইট খনিজে সমৃদ্ধ। **ক্রোমাইটঃ** ছোটনাগপুরের সিংভূম এবং উড়িষ্যার কেওনঝর ও ঢেংকানল ক্রোমাইট খনিজের
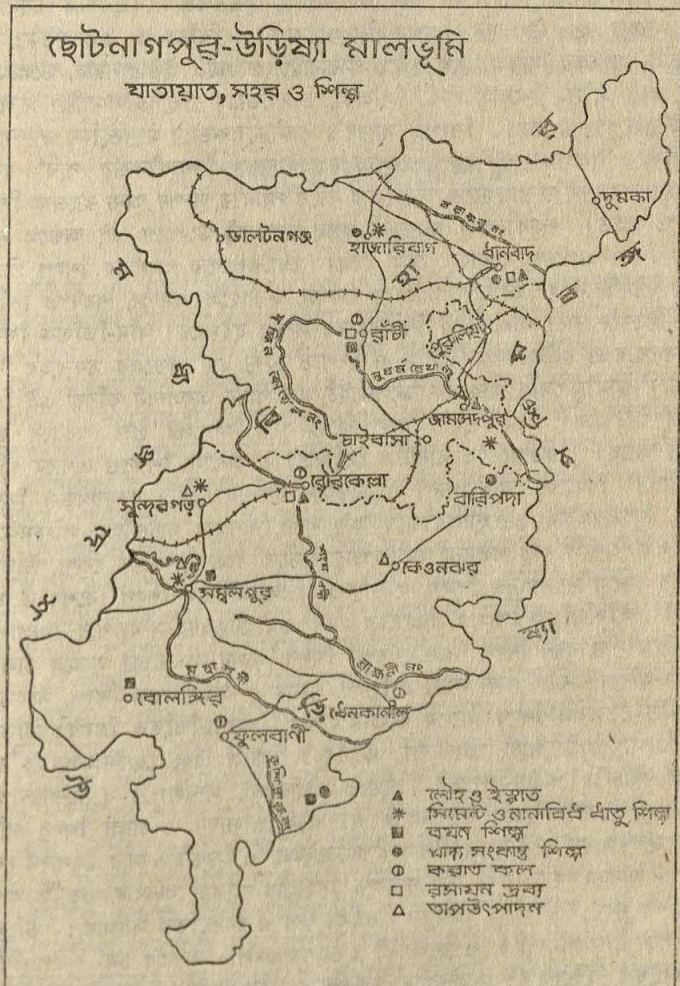
জন্য উল্লেখযোগ্য। **এসবেস্টস**ঃ সিংভূম অঞ্চলে সর্বাধিক পরিমাণে এবং উড়িষ্যার সুন্দরগড়, ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলে সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। **ম্যাঙ্গানীজ**ঃ ছোটনাগপুরের দুমকা, ঝরিয়া, হাজারীবাগ এবং উড়িষ্যার কেওনঝর, সুন্দরগড়, বোলাঙ্গীর জেলায় প্রচুর পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। **নানাবিধ মৃত্তিকা**ঃ ছোটনাগপুরের দুমকা, পুরুলিয়া অঞ্চলে চীনামাটি ; চাইবাসা, খুন্ডী অঞ্চলে ফায়ার ক্লে পাওয়া যায়। উড়িষ্যার সম্বলপুর, ময়ূরভঞ্জ, কেওনঝরে চীনামাটি এবং ফায়ার ক্লে উৎপাদন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **বিবিধ** ঃ এতদ্ব্যতীত এই মালভূমি অঞ্চলের বিভিন্ন অংশ হইতে কায়ানাইট, গ্রাফাইট, ইউরেনিয়াম, ডলোমাইট, দস্তা, অভ্র, সীসা, নিকেল, স্বর্ণ, সিলিকা, ভ্যানাডিয়াম প্রভৃতি নানাবিধ মূল্যবান খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়। **শিল্পজ সম্পদ** ঃ তুলনামূলকভাবে মালভূমির দক্ষিণাংশে (উড়িষ্যা) অপেক্ষাকৃত কম শিল্পোন্নয়ন হইয়াছে। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত এই অঞ্চলের দেশীয় রাজগণের অবহেলার দরুণ স্থানীয় সম্পদ অন্য রাজ্যের শিল্পে ব্যবহৃত হইত। স্বাধীনতার পরবর্তী কালে সরকারী উদ্যোগে এই অঞ্চলে নানাপ্রকার শিল্পস্থাপনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। ছোটনাগপুর অঞ্চলের শিল্প প্রচেষ্টা অবশ্য দীর্ঘদিনের। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, জনবহুল এলাকা, পর্যাপ্ত শিক্ষিত ব্যক্তি—ইত্যাদি নানা কারণে এই শিল্পোন্নয়ন সম্ভব হইয়াছে। **খনি-ভিত্তিক শিল্প**ঃ জামসেদপুর ও রাউরকেল্লার লৌহ ও ইস্পাত কেন্দ্র এই অঞ্চলের সর্ববৃহৎ শিল্প প্রচেষ্টা। স্থানীয় লৌহ আকরিক, ডলোমাইট, চুনাপাথর অবলম্বন করিয়া এই শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এই দুইটি শিল্পকেন্দ্রে সমগ্র অঞ্চলের প্রায় অর্ধাংশ কর্মী নিযুক্ত আছে। এতদ্ব্যতীত নানাবিধ মেরামতী ও অন্যান্য শিল্পও এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে। বিহারের ঝিনিকপানী ও উড়িষ্যার রাজগাংপুরে (সুন্দরগড়) সিমেন্ট শিল্প, বিহারের রামগড় ও হাজারীবাগে কাঁচ শিল্প, বিহারের ঘাটশীলা, পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া অঞ্চলে ধাতু গলানো, মৌভান্ডার অঞ্চলে তামা নিষ্কাশন কেন্দ্র, উড়িষ্যায় জোডায় ফেরো ম্যাঙ্গানিজ শিল্প, হীরাকুঁদে এ্যালুমিনিয়াম শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **কৃষিভিত্তিক শিল্প**ঃ বিহারের রাঁচী এবং উড়িষ্যার সম্বলপুর, বোলাঙ্গীর ও গঞ্জামে বস্ত্র বয়ন শিল্প, গঞ্জামে পশম শিল্প, গঞ্জাম, ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলে চালকল, ধানবাদ-ঝরিয়া অঞ্চলে খাদ্য সংক্রান্ত শিল্প, গঞ্জাম ও অন্যত্র ময়দা শিল্প, সম্বলপুর ও অন্যত্র তৈলকল শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **অরণ্য-ভিত্তিক শিল্প**ঃ উড়িষ্যার রাউরকেল্লা, ঝাড়সুগুদা, ঢেংকানল,, ফুলবনী অঞ্চলে এবং ছোটনাগপুরের রাঁচী অঞ্চলে স্থানীয় অরণ্য-সম্পদের ভিত্তিতে করাতকল, সম্বলপুর (ব্রজরাজনগর) কাগজকল, ছোটনাগপুরের ডালটনগঞ্জ, হাজারীবাগে লাক্ষা ও গালা শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। **রসায়ন ও কারিগরী শিল্প**ঃ রাউরকেল্লা ও সিন্দ্রীতে সার উৎপাদন কেন্দ্র, রাঁচী ও অন্যান্য স্থানে ঔষধ নির্মাণ কেন্দ্র, বিহারের গুমিয়া, ধানবাদ, প্রভৃতি অঞ্চলে রাসায়নিক দ্রব্য ; রাঁচী ও ধানবাদে নানাবিধ যন্ত্র ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ; উড়িষ্যার টিটলাগড় (বোলাঙ্গীর) ও ফুলবনী (বৌধখন্ডমল) অঞ্চলে চর্ম শিল্প বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। হীরাকুঁদ, সুন্দরগড়, কেওনঝর, রাজগাংপুর, তালচের, বোকারো, তিলাইয়া প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান হইতে যে জলবিদ্যুৎ ও তাপ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তাহা দ্বারা এই মালভূমির যাবতীয় শিল্প সংস্থা বিশেষ উপকৃত হইতেছে। **যোগাযোগের ব্যবস্থা**ঃ মালভূমির উত্তরাংশে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হইলেও দক্ষিণাংশে তাহা নিতান্ত অপ্রচুর। উড়িষ্যার কেওনঝর, সুন্দরগড়, ঢেংকানল,

বোলাঙ্গীর অঞ্চলে রেলপথের প্রসার এখনও হয় নাই। মূলতঃ দক্ষিণ পূর্ব রেলপথের দ্বারা সমগ্র অংশটি যুক্ত হইলেও, উত্তরাংশে সামান্য অঞ্চল পূর্ব রেলপথ দ্বারা যুক্ত। এই সকল রেলপথ কলিকাতা-টাটানগর, কলিকাতা-পুরুলিয়া-রাঁচী, টাটানগর-রাউরকেল্লা-সম্বলপুর প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান যুক্ত করিতেছে। অপরপক্ষে গ্রান্ড ট্রাংক রোড হাজারীবাগ জেলার মধ্য দিয়া ছোটনাগপুরের উত্তরাংশে এবং উড়িষ্যার বারিপদা-কেওনঝর-সম্বলপুর কেওনঝর-রাঁচী-পাটনা প্রভৃতি সড়কপথগুলি উল্লেখযোগ্য, খনি ও প্রসাশনিক শহরকে যুক্ত করিতেছে। নানা কারণে এখানে আভ্যন্তরীণ জলপথের প্রসার হয় নাই। তবে নাগপুর—কলিকাতা বিমান রাউরকেল্লায় সপ্তাহে দুইবার অবতরণ করে।

দাক্ষিণাত্যের মালভূমি

৩। সাংস্কৃতিক পরিচয়

জনসংখ্যাঃ এই মালভূমির ৭৩৯২৫৯ বর্গ কিলোমিটার পরিমিত এলাকায় প্রায় ৯২ মিলিয়ন লোক বাস করে বলিয়া এখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ১৩৭জন। পৃথকভাবে ধরিলে তামিলনাড়ু অঞ্চলের ঘনত্ব সর্বাধিক (২১২) এবং অন্ধ্র মালভূমিতে সর্বনিম্ন (১০২) ঘনত্ব। মহারাষ্ট্রের কৃষ্ণা-ভীমা অববাহিকায় পুণা-সোলাপুর-কোলাপুর অঞ্চল, কর্ণাটকের কাবেরী অববাহিকায় ব্যাংগালোর-কোলার, শিমোগা-ভদ্রাবতী-বেলগাঁও অঞ্চল, অন্ধ্রে তেলেংগানা সমভূমি অঞ্চল, তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর-মাদুরাই উচ্চভূমি অঞ্চলে সর্বাধিক জনবসতি দেখা যায়। **জনসংস্কৃতিঃ** এই অঞ্চলটি ভারতের অন্যতম শিল্প প্রধান স্থান হইলেও কৃষিকার্যই এখনও পর্যন্ত অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। সমগ্র অধিবাসীর প্রায় অর্ধাংশ কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য ইত্যাদি কর্মে নিযুক্ত আছে। তন্মধ্যে কৃষি সংক্রান্ত কর্মীর সংখ্যা গড়ে প্রায় ৬০ শতাংশ। অবশিষ্ট কর্মীগণ ক্ষুদ্রবৃহৎ শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য, পরিবহণ, চাকুরি ইত্যাদিতে নিযুক্ত। শহরাঞ্চলেই কর্মীর সংখ্যা বেশী। এই অঞ্চলের ভাষা মোটামুটি নিম্নরূপ : মহারাষ্ট্রে মারাঠী, তামিলনাড়ুতে তামিল, কেরলে মালয়ালাম, কর্ণাটকে কানাড়ী এবং অন্ধ্রে তেলেগু। প্রধানতঃ হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য হইলেও শহরাঞ্চলে অন্যান্য ধর্মের সমাবেশ দেখা যায়। শিক্ষার হার এই অঞ্চলে তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তবে অন্ধ্রপ্রদেশের (২২°৫ শতাংশ) হায়দ্রাবাদ কর্ণাটকের ৩২ (শতাংশ) দুর্গ অঞ্চলে সর্বাধিক শিক্ষিত লোক দেখা যায়। **গ্রাম ও শহরঃ** এই মালভূমি অঞ্চলের প্রায় ২০ শতাংশ বিভিন্ন নদী উপত্যকা ও সমভূমি অঞ্চলের ক্ষুদ্র বৃহৎ গ্রামে বাস করে। তবে তুলনামূলক বিচারে কর্ণাটক অঞ্চলে গ্রামীণ অধিবাসীর সংখ্যা সর্বনিম্ন এবং অন্ধ্র অঞ্চলে সর্বাধিক। অবশিষ্ট জনসংখ্যা এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রায় ৬০০ শহরে বাস করে। তুলনামূলক বিচারে কর্ণাটক অঞ্চলের কাবেরী অববাহিকায় ব্যাংগালোর মহীশূর। শিমোগা-ভদ্রাবতী-বেলগাঁও ও অন্যান্য অঞ্চলে সর্বাধিক (২০০) শহরবাসী থাকে। তামিলনাড়ুতে শহরের সংখ্যা (৯৯) কম হইলেও অন্ধ্র প্রদেশের তুলনায় ইহার হার বেশী। **পুণাঃ** মহারাষ্ট্রে পশ্চিমঘাট পর্বতগাত্রে

মুলামুথা নদীর সংযোগ স্থলে অবস্থিত। এই শহরটি মহারাষ্ট্রের সংস্কৃতির কেন্দ্র। এখানে সৈন্যাবাস, বিশ্ববিদ্যালয়, নানাবিধ শিল্পকেন্দ্র, ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় আবহাওয়া অফিস প্রভৃতি অবস্থিত। সড়কপথ দ্বারা ইহা বোম্বাই, নাসিক, বেলগাঁও, সোলাপুর প্রভৃতি শহরের সহিত যুক্ত। **নাগপুর** (৬৪৩৬৫৯)ঃ মহারাষ্ট্রের ওয়েন গঙ্গা নদীতটে অবস্থিত মহারাষ্ট্রের একটি প্রধান রেলকেন্দ্র। বাণিজ্যকেন্দ্র ও বিমান বন্দর। স্থানীয় কার্পাসকে কেন্দ্র করিয়া এখানে বস্ত্রবয়ন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ম্যাঙ্গানীজ ও কমলালেবুর জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। **সোলাপুর** (৩৩৭৫৮৩)ঃ মহারাষ্ট্রের সীনা নদী-তটে অবস্থিত জেলার প্রধান শহর। বস্ত্র শিল্পের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। সড়কপথে বোম্বাই ও মহীশূরের সহিত এবং রেলপথে বোম্বাই ও অন্ধ্রপ্রদেশের সহিত যুক্ত। **নাসিক**ঃ মহারাষ্ট্রের গোদাবরী নদীতটে অবস্থিত জেলার প্রধান কেন্দ্র। ভারত সরকারের নিজস্ব মুদ্রণালয়, ধর্মীয় স্থান ইত্যাদির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সড়কপথে বোম্বাই ও ইন্দোরের সহিত যুক্ত। **বাঙ্গালোর** (১২০৬৯৬১)ঃ কাবেরী উপত্যকায় অবস্থিত কর্ণাটক (মহীশূর) রাজ্যের রাজধানী। ইহা বিমান পোত নির্মাণ, টেলিফোন, রেডিও, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, পশম ও কার্পাস বস্ত্র ইত্যাদির জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে একটি বিজ্ঞান পরিষদ আছে। **মহীশূর** (২৪৩৮৬৫)ঃ কাবেরী নদীর অববাহিকায় অবস্থিত কর্ণাটকের পূর্ব রাজধানী। কিন্তু তৎসত্ত্বেও শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র রূপে ইহার গুরুত্ব বর্তমানে কিছুমাত্র কমে নাই। **ভদ্রাবতী**ঃ কর্ণাটকের ভদ্রানদীর তীরে অবস্থিত ভারতের একটি প্রধান লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্র। এখানে কাগজের কল ও সিমেন্টের কারখানা আছে। ইহা সড়কপথে বাঙ্গালোর ও মহীশূরের সহিত যুক্ত। **হায়দ্রাবাদ** (১২৫১১১৯)ঃ মুছি নদীর তীরে অবস্থিত অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী। পূর্বের নিজাম আমলের বহু প্রাচীন মুসলমান শিল্পের নিদর্শন আছে। কার্পাস শিল্পের কেন্দ্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। রেলপথ, জলপথ ও বিমানপথ দ্বারা ভারতের অন্যান্য স্থানের সহিত যুক্ত। **বরঙ্গল**ঃ কেন্দ্রীয় রেলপথে অবস্থিত অন্ধ্রপ্রদেশের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য শহর। রেলপথে ইহা হায়দ্রাবাদ, নাগপুর, মুসলিপত্তনের সহিত যুক্ত। তুলাশিল্প, ধানকল ও তৈল কল আছে। মেডিক্যাল কলেজ, দশ সহস্র স্তম্ভ বিশিষ্ট মন্দির ও অন্যান্য স্থাপত্যকলার জন্য প্রসিদ্ধ। **কুর্নুল**ঃ পেন্নার নদীর উত্তর তটের এক শাখা নদীর তীরে অবস্থিত এই শহরটি সড়কপথে হায়দ্রাবাদ ও বাঙ্গালোরের সহিত যুক্ত। ইহার নিকটে কয়লাখনি আছে। বর্তমানে ইহা তুলা সংক্রান্ত ও তৈল প্রস্তুত শিল্পের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। **কোয়েম্বাটুর** (২৮৬৩০৫)ঃ তামিলনাড়ুতে নীলগিরি পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত একটি বিশিষ্ট বাণিজ্য শহর ও শিল্পকেন্দ্র। পাইকারা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র হইতে এখানে শক্তি সরবরাহ করা হয়। ইক্ষু সংক্রান্ত গবেষণা এবং সুপারী, বাদাম ও কার্পাস ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ। **সালেম** (২৪৯১৪৫)ঃ জেলার প্রধান শহর এবং বাঙ্গালোর, কোয়েম্বাটুর প্রভৃতি শহরের সহিত সড়কপথে যুক্ত। ছুরি, কাঁচি, লৌহ ও ইস্পাতের কারখানার জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে অনেকগুলি বস্ত্রবয়ন ও তৈল প্রস্তুত কেন্দ্র আছে। **তিরুচিরাপল্লী**ঃ কাবেরী নদীতটে অবস্থিত একটি তীর্থস্থান। শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র। কার্পাস শিল্প ও চাউল ব্যবসায়ে উন্নত। ইহার নিকটে ডিণ্ডিগালে চুরুট কারখানা আছে।

৪. আর্থিক পরিচয়

কৃষিজ সম্পদঃ সমগ্র ভূমির প্রায় অর্ধাংশ পরিমিত এলাকায় কৃষিকাজ করা হয়। মহারাষ্ট্র অঞ্চলে ইহার পরিমাণ সর্বাধিক হইলেও অন্ধ্র অঞ্চলে অরণ্য, রুক্ষতা, পর্বত প্রভৃতি নানা কারণে সেখানে সমগ্র জমির মাত্র ৪০ শতাংশে কৃষিকাজ করা হয়। এই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু ও ভূমির উর্বরা শক্তি কৃষিকাজের পক্ষে তেমন অনুকূল নয় বলিয়া উৎপাদন অপেক্ষাকৃত কম। বর্তমানে জলসেচের দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়াস চলিতেছে। **জোয়ারঃ** মহারাষ্ট্রের গোদাবরী, সিনা, কৃষ্ণা, ভীমা নদী উপত্যকায়; কর্ণাটকের বিদর, গুলবর্গা, বিজাপুর, মহীশূর, মান্ড; অন্ধ্রপ্রদেশের উত্তরাংশে, কুর্নুল অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জোয়ার উৎপন্ন হয়। **বাজরাঃ** মহারাষ্ট্রের জোয়ার উৎপাদক অঞ্চলগুলিতে, কর্ণাটকের বেলগাঁও, বিজাপুর, ধারওয়ার; অন্ধ্রপ্রদেশে সামান্য পরিমাণে; তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর, সালেমে যথেষ্ট পরিমাণে বাজরা উৎপাদন হয়। **ধানঃ** মহারাষ্ট্রের ওয়েনগঙ্গা উপত্যকায় সর্বাধিক পরিমাণে, কর্ণাটকের মহীশূর, মান্ড্য, অন্ধ্রপ্রদেশের নিজামাবাদ, করিমনগর, এলুরু, গুন্টুর অঞ্চলে; তামিলনাড়ুর উত্তর আর্কট, দক্ষিণ আর্কট জেলায় প্রচুর পরিমাণে ধান জন্মে। **তুলাঃ** মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ, খান্দেশ, জালগাঁও অঞ্চলে; কর্ণাটকের গুলবর্গা, বিজাপুরে, বেলগাঁও অঞ্চলে; অন্ধ্রের আদিলাবাদ, কুর্নুল অঞ্চলের কৃষ্ণ মৃত্তিকায়; তামিলনাড়ুর রামনাথপুরম, তিরুণভেলী, মাদুরাই অঞ্চল তুলা উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। **বাদামঃ** মহারাষ্ট্রের শুষ্ক এবং অনুর্বর অঞ্চলে; কর্ণাটকের বেলগাঁও, হাসান, চিত্তুর কুডাপ্পা, অনন্তপুর অঞ্চলে; তামিলনাড়ুর উত্তর আর্কট, দক্ষিণ আর্কট, কোয়েম্বাটুর, মাদুরাই অঞ্চলে নানাবিধ বাদাম উৎপন্ন হয়। **ইক্ষুঃ** মহারাষ্ট্রের আহমদনগর, পুণা, কোলাপুর, সাংলি, কর্ণাটকের মান্ড্য, তামিলনাড়ুর উত্তর আর্কট, দক্ষিণ আর্কট, ত্রিচিনাপল্লী অঞ্চলে ইক্ষু উৎপাদন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **বিবিধঃ** কর্ণাটকে তামাক, তেলেঙ্গানায় রেড়ি বীজ, মালভূমির বিভিন্ন অংশে রাগী, নানাবিধ ডাল, সামান্য পরিমাণে গম; কর্ণাটকের হাসান, মহীশূর, শ্রীঙ্গেরী, নীলগিরি অঞ্চলে। চা, কফি, কাজুবাদাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জলসেচঃ এই অঞ্চলের জলসেচের প্রয়োজনীয়তার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে এই মালভূমিতে কোন প্রকার সেচ ব্যবস্থাই প্রায় ছিল না। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে যে সকল প্রচেষ্টার মাধ্যমে এখানে কৃষি জমিতে জলসেচ করা হয় তাহা হইল—(১) খালের সাহায্যে মহারাষ্ট্রের পশ্চিমাংশে, কর্ণাটকের মান্ড্য, অন্ধ্রের কুনুর্ল, নাজিমাবাদ, নলগোন্ডা আদিলাবাদ এবং তামিল-নাড়ুর দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে জলসেচ করা হয়। (২) মহারাষ্ট্রের প্রায় সর্বত্রই, কর্ণাটকের বিজাপুর, অন্ধ্রের কুডাপ্পা, চিত্তুর, অনন্তপুর অঞ্চলে, তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর, ডিন্ডিগাল, পাল্নি অঞ্চলে কূপের দ্বারা সেচ কার্য করা হইয়া থাকে, (৩) মহারাষ্ট্রের তান্ডা, ভান্ডারা, কর্ণাটকের শিমোগা, অন্ধ্রপ্রদেশের বরঙ্গল, আদিলাবাদ, মেদক অঞ্চলে, তামিলনাড়ুর দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে জলাশয়ের সাহায্যে জলসেচ করা হয়। **সেচ-প্রকল্পঃ** কর্ণাটকের তুঙ্গভদ্রা সেচ প্রকল্পের ফলে রায়চুর ও বেলারী অঞ্চল, কৃষ্ণা-প্রকল্পের দ্বারা বিজাপুর, গুলবর্গা অঞ্চল; অন্ধ্রের নাগার্জুন সাগর প্রকল্প দ্বারা উপকূলীয় অঞ্চল, কদম প্রকল্প দ্বারা আদিলাবাদ,

পোচাম্পদ প্রকল্প দ্বারা নিজামাবাদ ও করিমপুর অঞ্চল এবং তামিলনাড়ুর পেরিয়ার প্রকল্প দ্বারা মাদুরা ও সন্নিহিত অঞ্চল উপকৃত হইতেছে।

প্রাণীজ সম্পদঃ একমাত্র অন্ধ্রপ্রদেশ ব্যতীত এই মালভূমির কোন অঞ্চলে উল্লেখযোগ্যভাবে পশুপালন হয় না। এখানে গরু, মহিষ, ছাগল, মেষ প্রভৃতি দুগ্ধের জন্য, বলদ মহিষ কৃষিকাজের জন্য, গাধা, ঘোড়া, টাট্টু, খচ্চর, উট প্রভৃতি ভার বহনের জন্য প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

বনজ সম্পদঃ এই মালভূমির বনজ সম্পদ নানা কারণেই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পার্বত্য অঞ্চল ও নদী অববাহিকা অঞ্চলে বাঁশ, বেত, চন্দন, নারিকেল, ঘাস, মাদুর, কাঠি, মূল্যবান কাঠ, বন্য-রবার, রেশম-কীট ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। এই সকল দ্রব্য স্থানীয় শিল্পে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়।

খনিজ সম্পদঃ খনিজ সম্পদগুলি কয়েকটি বিশিষ্ট স্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। এই অঞ্চল সর্বপ্রকার ধাতব ও অধাতব খনিজ দ্রব্যে সমৃদ্ধ হইলেও কয়লা, লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনের জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **লৌহ**ঃ মহারাষ্ট্রের চান্দা অঞ্চলে উচ্চ শ্রেণীর লৌহ পাওয়া যায়। কর্ণাটকের বাবাবুদান পর্বতে প্রচুর পরিমাণে এবং শিমোগা ও বেলারী জেলায়; অন্ধ্রের দক্ষিণপূর্ব তেলেঙ্গানা ও অনন্তপুর অঞ্চলে; তামিলনাড়ুর সালেম, ত্রিচুরাপল্লী, দক্ষিণ আর্কট ও নীলগিরি অঞ্চল লৌহ আকরিকে সমৃদ্ধ। **ক্রোমাইট**ঃ মহারাষ্ট্রের ভাণ্ডারা জেলায় ওয়েনগঙ্গা নদী-উপত্যকায়; কর্ণাটকের হাসান অঞ্চলে স্বল্প পরিমাণে এবং শিমোগা চিত্রদুর্গ ও সন্নিহিত অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে; অন্ধ্রপ্রদেশের খাম্মাম অঞ্চলে স্বল্প পরিমাণে; তামিলনাড়ুর সালেম ও সন্নিহিত অঞ্চলে ইহা পাওয়া যায়। **চুনাপাথর**ঃ মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধা-ওয়েনগঙ্গা অববাহিকায়; অন্ধ্রপ্রদেশের আদিলাবাদ, করিমনগর, হায়দ্রাবাদ, নলগোণ্ডা গুণ্টুর অঞ্চলে সিমেণ্ট শিল্পের উপযোগী উৎকৃষ্ট সিমেণ্ট পাওয়া যায়। তামিলনাড়ুর সালেম ও সন্নিহিত অঞ্চলেও ইহা পাওয়া যায়।

বক্সাইটঃ মহারাষ্ট্রের সাতারা ও কোলাপুর জেলায় সহ্যাদ্রি পর্বতাঞ্চলে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর এবং তামিলনাড়ুর শেভারা পর্বতে; কর্ণাটকের বেলগাঁও, ধারওয়ার অঞ্চল এই সম্পদে সমৃদ্ধ। **কয়লা**ঃ মহারাষ্ট্রের ভাণ্ডারা, উমরের, ওয়ার্ধা নদী-উপত্যকা, নাগপুর অঞ্চলে; অন্ধ্রপ্রদেশের গোদাবরী উপত্যকার আদিলাবাদ, করিমনগর, বরঙ্গল প্রভৃতি অঞ্চলে কয়লা পাওয়া যায়। **ম্যাঙ্গানিজ**ঃ মহারাষ্ট্রের নাগপুর ভাণ্ডারা হইতে ভারতের সর্বাধিক ম্যাঙ্গানিজ সংগৃহীত হয়। এতদ্ব্যতীত কর্ণাটকের বেলগাঁও, শিমোগা, টুমকুর, চিত্রদুর্গ অঞ্চলে ইহা পাওয়া যায়। **অভ্র**ঃ কর্ণাটকের বেলারী, শিমোগা অঞ্চলে; তামিলনাড়ুর মেতুর ডিণ্ডিগাল, গুড্ডালোর অঞ্চলে; অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোর খাম্মাম্ অঞ্চলে এই খনিজ দ্রব্য সমৃদ্ধ। **স্বর্ণ**ঃ কর্ণাটকের কোলার অঞ্চলে মিশ্রিত অবস্থায় সর্বাধিক পরিমাণে এবং তামিলনাড়ুর সতমঙ্গলম ও গুড্ডালোর অঞ্চলেও সামান্য পাওয়া যায়। **এ্যাসবেস্টস**ঃ অন্ধ্রপ্রদেশের কুডাপ্পায় প্রচুর পরিমাণে; কর্ণাটকের বিজাপুর, চিত্রদুর্গ ও হাসান অঞ্চলে ইহার পরিমাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **গ্রাফাইট**ঃ অন্ধ্রপ্রদেশের খাম্মাম্ ও তামিলনাড়ুর দম্বা সমুদ্রম নামক অঞ্চল গ্রাফাইট দ্বারা সমৃদ্ধ। **বিবিধ**ঃ এতদ্ব্যতীত অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্ণুল অঞ্চলে শ্লেট পাথর, হায়দ্রাবাদ অনন্তপুর, কুর্ণুল অঞ্চলে উচ্চ শ্রেণীর কোয়ার্টজ; অনন্তপুর, করিমনগর, মাভুনগর অঞ্চলে উৎকৃষ্ট ট্যাল্ক; অনন্তপুর ও মভুনগর অঞ্চলে সামান্য পরিমাণে হীরক; কুডাপ্পা, কুর্ণুল, নলগোণ্ডা, নেলোর

আদিলাবাদ অঞ্চলে সেরামিক শিল্পের উপযোগী উৎকৃষ্ট কাদাপাথর এবং তামিলনাড়ুর নীলগিরি, কোয়েম্বাটুর, মাদুরাই অঞ্চলে দস্তা ও অন্যান্য নানা স্থানে বহু মূল্যবান খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়।

শিল্পজ সম্পদঃ এই অঞ্চলের শিল্প মানচিত্রে মূলতঃ বস্ত্রবয়ন শিল্পের প্রাধান্য দেখা যায়। দাক্ষিণাত্যের মালভূমির অন্তর্গত চারিটি রাজ্যের মধ্যে একমাত্র তামিলনাড়ুতেই সুপরিকল্পিতভাবে শিল্পোন্নয়ন হইয়াছে। অন্যত্র দেশীয় রাজগণের বা স্বাধীনতা উত্তরকালের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত। তুলনায় অন্ধ্রপ্রদেশ শিল্পক্ষেত্রে অনুন্নত। **কৃষি-ভিত্তিক শিল্পঃ** (১) মহারাষ্ট্রের নাগপুর, ওয়ার্ধা, শোলাপুর, জালগাঁও ; কর্ণাটকের রায়চুর, বিজাপুর, গুলবর্গা, ব্যাঙ্গালোর, মহীশূর ; অন্ধ্রপ্রদেশের হায়দ্রাবাদ, কুর্ণুল চিত্তুর, কুডাপ্পা ; তামিলনাড়ুর ভেলোর, কোয়েম্বাটুর, সালেম অঞ্চলে নানাবিধ বস্ত্রবয়ন কেন্দ্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (২) মহারাষ্ট্রের আহমদ্‌নগর, সাতারা, পুণা, কোলাপুর ; কর্ণাটকের মান্ড্য, বেলগাঁও, রায়চুর ; অন্ধ্রপ্রদেশের নিজামাবাদ ও চিত্তুর অঞ্চলে চিনি প্রস্তুত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। (৩) মহারাষ্ট্রের তাপ্তী ও ওয়ার্ধা অববাহিকার নানা অঞ্চলে বাদাম তৈল ; কর্ণাটকের ব্যাঙ্গালোর, মহীশূর, রায়চুর অঞ্চলে ; অন্ধ্রপ্রদেশের সেকেন্দ্রাবাদ, গুণ্টাকল, আদোনি অঞ্চলে তুলা ও অন্যান্য উদ্ভিজ্জ তৈল উৎপন্ন হয়। (৪) তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর, নীলগিরি, সালেম, কর্ণাটকের মহীশূর, কুর্গ অঞ্চলে কফি শিল্প বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। (৫) অন্ধ্রপ্রদেশের হায়দ্রাবাদে দুইটি সিগারেট উৎপাদন কেন্দ্র ; তামিলনাড়ুর ভেলোর, কোয়েম্বাটুর, পালনি অঞ্চল ; কর্ণাটকের ইয়াদগির অঞ্চলে তামাক সংক্রান্ত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। (৬) কর্ণাটকের রায়চুর, গুলবর্গা অঞ্চলে ধানকল ; দাভনগেরে অঞ্চলে কম্বল শিল্প ; তামিলনাড়ুর নীলগিরি অঞ্চলে চা ; অন্ধ্রপ্রদেশে ময়দা সংক্রান্ত শিল্প, শর্করা ও নানাবিধ খাদ্যশিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অরণ্য-ভিত্তিক শিল্পঃ (১) মহারাষ্ট্রের বল্লারপুরে (চান্দা) কাগজ মণ্ড প্রস্তুত ; অন্ধ্রপ্রদেশের শিবপুরে পেপার মিল (আদিলাবাদ) ; (২) কর্ণাটকের উত্তর আর্কটে দড়ি ; অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্ণুল ও খাম্‌মাম্‌ অঞ্চলে দড়ি ও মাদুর ; সহ্যাদ্রি পর্বতের পশ্চিমাংশের গ্রামগুলিতে দড়ি ও দড়িজাত শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (৩) তামিলনাড়ুর তারামঙ্গলম, সুরমঙ্গলম শহরে ও অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্ণুল, খাম্‌মাম্‌ অঞ্চলে বাঁশ ও বেতের শিল্প ; (৪) এতদ্ব্যতীত কর্ণাটকের চিত্রদুর্গ ও শিমোগা অঞ্চলে চন্দন, সাবান, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর নানাস্থানে পিচবোর্ড নির্মাণ ও রবার শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। **তাপ-উৎপাদন কেন্দ্রঃ** কয়লার পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম হওয়ায় এই অঞ্চলটি প্রাচীনকাল হইতে জলবিদ্যুতের মাধ্যমে শিল্প প্রসার করিতেছে। এই মালভূমি অঞ্চলের শিল্পসমূহে নিম্নরূপ উপায়ে তাপ সংগৃহীত হয় (১) মহারাষ্ট্র অঞ্চলে কয়লা এবং কয়লা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, খোপালি, ভীরা, রাধানগরী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প (২) কর্ণাটক অঞ্চলে কাবেরী নদীতে শিবসমুদ্রম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, তুঙ্গভদ্রা নদীর সারাবতী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ; (৩) অন্ধ্রপ্রদেশে জলবিদ্যুৎ ও সিঙ্গারেনী কয়লা খনি এবং (৪) তামিলনাড়ু অঞ্চলে পাইকরা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র সমগ্র রাজ্যের শিল্প সংস্থায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। এই সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্র হইতে শহর ও গ্রাম সুবিধা পাইয়া থাকে।

দাক্ষিনাত্যের মালভূমি
যাতায়াত, সহর ও শিল্প
ধুলিয়া
অজন্তা
নাগপুর
ভাণ্ডারা
ঔরঙ্গাবাদ
চান্দা
পুনা
শোলাপুর
হায়দ্রাবাদ
বরঙ্গল
কোলাপুর
বিজাপুর
কৃষ্ণা নং
রাইচুর
কুর্নুল
ধারওয়ার
হুবলী
গুন্টকল
কুডাপনা
শিমোগা
ভদ্রাবতী
বাঙ্গালোর
ভেলোর
মহীশুর
কাবেরী নং
সালেম
কোয়েম্বাটুর
ডিণ্ডিগুল
+ বস্ত্র বয়ন শিল্প
□ উদ্ভিজ্জ তৈল
× চিনি
▲ তামাক সংক্রান্ত শিল্প
△ লৌহ শিল্প
● সিমেন্ট
■ রসায়ন দ্রব্য
১০০ ৫০ ০ ১০০
মাইল
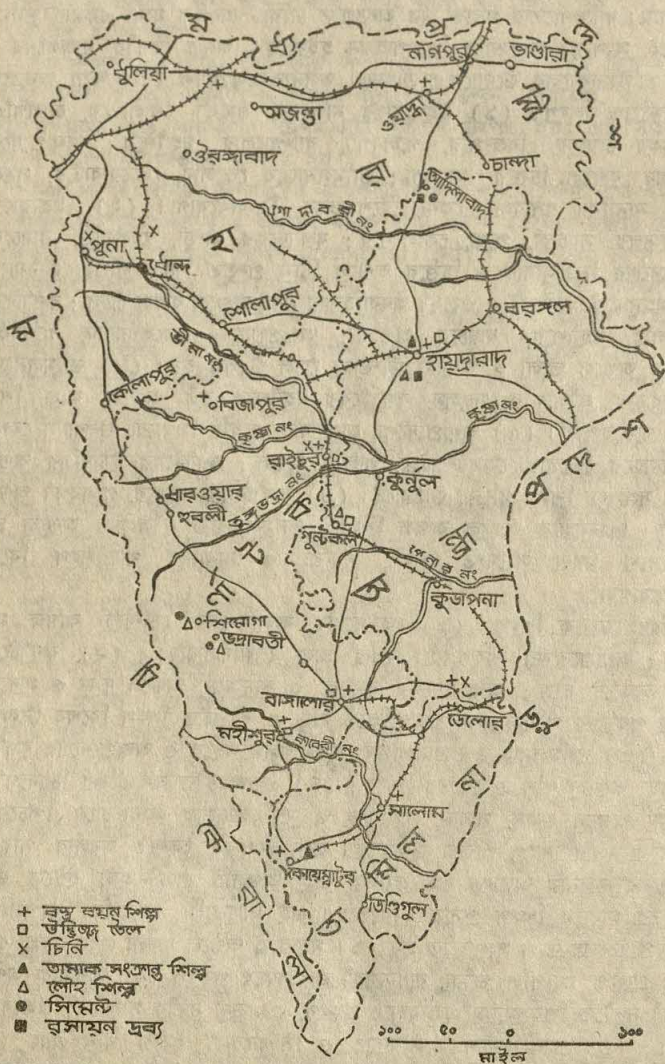
কারিগরী শিল্পঃ মহারাষ্ট্রের নাগপুর ও পুণা অঞ্চলে ইলেকট্রিক মোটর, অন্ধ্রপ্রদেশের হায়দ্রাবাদে বিদ্যুৎ সরঞ্জাম (ভারত হেভী ইলেকট্রিক্যালস), কর্ণাটকের ব্যাঙ্গালোরে ও অন্ধ্রের হায়দ্রাবাদে ঘড়ি, সাইকেল প্রভৃতি নির্মাণ ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্র উৎপাদন। মহারাষ্ট্রের পুণা ও নাগপুর, কর্ণাটকের দাভনগেরে, অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষিযন্ত্র ও যন্ত্রাংশ, ডেয়ারী শিল্পের সরঞ্জাম, কর্ণাটকের কুর্গ অঞ্চলে রেলওয়ে মেরামত কেন্দ্র প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর, ডিন্ডিগাল ও সালেমে নানাবিধ কারিগরী শিল্প আছে। **খনি-ভিত্তিক শিল্পঃ** অন্ধ্রের হায়দ্রাবাদ ও গুন্টাকল অঞ্চলে ইস্পাত ও সংকরধাতু শিল্প ; কর্ণাটকের শিমোগা-ভদ্রাবতী অঞ্চলে দক্ষিণ ভারতের সর্ববৃহৎ লৌহ-ইস্পাত কেন্দ্র অবস্থিত। সম্প্রতি তামিলনাড়ুর সালেমে একটি লৌহ ইস্পাত কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ চলিতেছে। মহারাষ্ট্রের পুণা, নাগপুর এবং তামিলনাড়ুর সালেমে কাঁচ শিল্প ; কর্ণাটকের বেলগাঁও অঞ্চলে এ্যালুমিনিয়াম শিল্প ; উত্তর কানাড়ায় কষ্টিক সোডা ও পলিফাইবার ; অন্ধ্রপ্রদেশের হায়দ্রাবাদ, খাম্মাম্ আদিলাবাদ এবং তামিলনাড়ুর মেতুর অঞ্চলে সার ও নানাবিধ রসায়ন শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কর্ণাটকের শিমোগা-ভদ্রাবতী, অন্ধ্রপ্রদেশের করিমনগর, কুর্ণুল, আদিলাবাদ এবং তামিলনাড়ুর মাদুক্কারি অঞ্চলে সিমেণ্ট শিল্প ; অন্ধ্রপ্রদেশের হায়দ্রাবাদ ও সন্নিহিত গ্রামাঞ্চলে দক্ষিণ সহ্যাদ্রি (কেরালা) অঞ্চলে মৃৎ-শিল্প (ইট-টালি প্রভৃতি) গড়িয়া উঠিয়াছে। **বিবিধঃ** এতদ্ব্যতীত কর্ণাটকের চিত্রদুর্গ ও টুংকুর অঞ্চলে পশমশিল্প, বাঙ্গালোর, মহীশূর শহরে উৎকৃষ্ট রেশম শিল্প ; অন্ধ্রপ্রদেশের আদিলাবাদ, চিত্তুর, নেলোর অঞ্চলের মৎস্য সংক্রান্ত শিল্প, হায়দ্রাবাদে ঔষধ নির্মাণ কেন্দ্র ; মহারাষ্ট্রে করাত কল ও সম-জাত তৈল শিল্প, তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকের নানা স্থানে চর্ম শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ এই অঞ্চলটির সামগ্রিক উন্নতির মূলে নানাবিধ সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার যথেষ্ট অবদান আছে। ভারতের অনেকগুলি বৃহৎ রাজ্য ও শহর এই অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া এখানে সড়কপথ, রেলপথ ও বিমানপথের যোগাযোগ ব্যবস্থা দেখা যায়। ভারতের দক্ষিণতম প্রান্ত (কন্যাকুমারিকা) হইতে প্রধান সড়ক পথটি মাদুরা-বাঙ্গালোর হায়দ্রাবাদ হইয়া মধ্যপ্রদেশের দিকে গিয়াছে। অন্যান্য সড়কপথগুলি বোম্বাই-আকোলা-নাগপুর, বোম্বাই-পুণা-হায়দ্রাবাদ-বিজয়বাড়া, বোম্বাই-ধারওয়ার-বাঙ্গালোর-মাদ্রাজ ও অন্যান্য অসংখ্য শাখাপথ ইহাদিগকে অন্যান্য শহরের সহিত যুক্ত করিয়াছে। এই অঞ্চলটিতে কেন্দ্রীয় ও দক্ষিণ রেলপথের প্রধান শাখাগুলি সমস্ত উল্লেখযোগ্য শিল্প-বাণিজ্য-প্রশাসনিক শহরকে যুক্ত করিলেও তামিলনাড়ু ও কর্ণাটক অঞ্চলেই ইহার ঘনত্ব বেশী। বাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ, কোয়েম্বাটুর, মাদুরা, নাগপুর অঞ্চলে বিমান কেন্দ্র আছে। ইহার ফলে সমগ্র দাক্ষিণাত্যের মালভূমি বোম্বাই-মাদ্রাজ দিল্লী-কলিকাতা ও ভারতের অন্যান্য সকল গুরুত্বপূর্ণ শহরের সহিত যুক্ত হইয়াছে।

৭
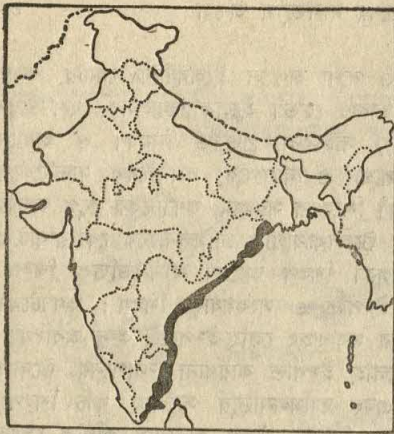
।। পূর্ব উপকূল অঞ্চল ।।

১. সাধারণ পরিচয়

ভূমিকা: এই দীর্ঘ উপকূলবর্তী অঞ্চল নদীমোহনায় সঞ্চিত পলিদ্বারা গঠিত। ভারতের বৃহৎ ব-দ্বীপ অঞ্চলগুলি এই উপকূলেই অবস্থিত। সমুদ্রপথের সহিত বাণিজ্যের জন্য এই অঞ্চল শুধু বর্তমানেই নয় প্রাচীনকাল হইতেই গুরুত্ব-পূর্ণ, যদিও স্বাভাবিক পোতাশ্রয় উপকূলাঞ্চলে খুবই সীমিত। উপকূলীয় ও বহির্সমুদ্রের ব্যবসা ও বাণিজ্যে স্থানীয় অধিবাসীরা বিশেষ ভাবে যুক্ত। এই অঞ্চলে অতি প্রাচীনকালেই সভ্যতার উন্মেষ হইয়াছিল।

অবস্থান ও সীমা: পূর্ব উপকূল অঞ্চল ৮°০′ উত্তর হইতে ২২′১০′ উত্তর এবং ৭৭°৩০′ পূর্ব হইতে ৮৭°২০ পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বিস্তীর্ণ উপকূল অঞ্চলের উত্তরসীমায় গাঙ্গেয় সমভূমির ব-দ্বীপ অঞ্চল ও সমগ্র পূর্বদিক বঙ্গোপসাগর দ্বারা বেষ্টিত। উত্তর-পশ্চিম অংশে উড়িষ্যার উচ্চভূমি ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমি দ্বারা চিহ্নিত। তবে সাধারণভাবে, উড়িষ্যার উপকূলাঞ্চল হইতে অভ্যন্তর-ভাগে পূর্বঘাট পর্বতের পাদদেশের ৭৫ মিটার সমোন্নতি রেখা পর্যন্ত, অন্ধ্রের উপকূলাঞ্চল হইতে অভ্যন্তর ভাগে সহ্যাদ্রি পর্বতের ১০০ মিটার সমোন্নতি রেখা এবং তামিলনাড়ুর উপকূলাঞ্চল হইতে অভ্যন্তরভাগে সহ্যাদ্রি পর্বতের ১৫০ মিটার সমোন্নতি রেখা দ্বারা সীমিত। ইহার রাজনৈতিক সীমা উড়িষ্যা, অন্ধ্র, তামিলনাড়ুর উপরোক্ত ভূখন্ড লইয়াই বিস্তৃত।

আয়তন: তিনটি রাজ্যের উপকূলভাগের মোট আয়তন ১০২৮৪২ বর্গ কিলোমিটার লইয়া এই ভৌগোলিক অঞ্চল গঠিত হইয়াছে। আয়তনের দিক হইতে উড়িষ্যার উপকূল সর্বাপেক্ষা স্বল্প দৈর্ঘ্যের। তামিলনাড়ুর উপকূল সর্বাধিক প্রশস্ত এবং অন্ধ্রের উপকূল অংশ সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ। ইহার উত্তরাংশ অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত হইলেও দক্ষিণাংশ মধ্যম প্রস্থ যুক্ত বলা যায়।

বর্তমান ইতিহাস: বৃটিশদের রাজত্বকালে এই উপকূলাঞ্চল যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করে। তখনই সর্বপ্রথম এই অঞ্চলের সহিত সমগ্র মালভূমি অঞ্চলের উন্নততর যোগসূত্র স্থাপিত হয়। পূর্বে এই অঞ্চল শুধু উড়িষ্যা ও মাদ্রাজের উপকূল লইয়া

গঠিত ছিল। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে অন্ধ্র রাজ্য গঠনের পর এবং ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য-পুনর্গঠনের-পর সমগ্র পূর্ব উপকূল অঞ্চলে তিনটি রাজ্য দেখা যায়ঃ তামিলনাড়ু (মাদ্রাজ), অন্ধ্র, ও উড়িষ্যা। তামিলনাড়ুর অন্তর্গত ফরাসী অধিকৃত পণ্ডিচেরী, কারিকল নগর ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে ভারতের অন্তভু্ক্ত হইয়াছে।

অঞ্চল পরিচয়ঃ নিম্নলিখিত জেলাগুলি লইয়া আলোচ্য ভৌগোলিক অঞ্চলটি গঠিত হইয়াছেঃ (ক) উড়িষ্যার (উৎকল) উপকূলবর্তী অঞ্চল, (১) ময়ূরভঞ্জ, (২) বালেশ্বর, (৩) কটক, (৪) পুরী, (৫) গঞ্জাম জেলার অংশ বিশেষ লইয়া গঠিত। (খ) অন্ধ্রের উপকূলবর্তী অঞ্চল (৬) শ্রীকাকুলাম, (৭) বিশাখাপত্তন, (৮) পূর্ব গোদাবরী, (৯) পশ্চিম গোদাবরী, (১০) কৃষ্ণা, (১১) নেলোর জেলার অংশ বিশেষ লইয়া গঠিত। (গ) তামিলনাড়ুর উপকূলবর্তী অঞ্চল (১২) চিঙ্গেলপুট, (১৩) মাদ্রাজ, (১৪) পণ্ডিচেরী, (১৫) তাঞ্জাবর, (১৬) কারিকল প্রভৃতি জেলার সমগ্র অংশ এবং (১৭) উত্তর আর্কট, (১৮) দক্ষিণ আর্কট, (১৯) তিরুচিরাপল্লী, (২০) মাদুরাই, (২১) রামনাথপুরম, (২২) তিরুনাভেলী প্রভৃতি জেলার অংশবিশেষ লইয়া গঠিত।

২. প্রাকৃতিক পরিচয়

ভূপ্রকৃতি ঃ মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীবাহিত পলি দ্বারা এই ভূখণ্ড গঠিত। উত্তরে সুবর্ণরেখা নদী ও দক্ষিণে কন্যাকুমারী—ইহার মধ্যবর্তী অঞ্চল বঙ্গোপসাগরের তীর হইতে ধাপে ধাপে উচ্চ হইয়া পূর্বঘাট পর্বতের সহিত মিলিত হইয়াছে। ব-দ্বীপ অংশে উপকূল ভাগ অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত এবং দুই ব-দ্বীপের মধ্যবর্তী অঞ্চল নাতিপ্রশস্ত। সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই বিস্তীর্ণ তট অঞ্চলকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়ঃ কাবেরী ব-দ্বীপ যুক্ত তামিলনাড়ুর উপকূল ভূমি, কৃষ্ণা ও গোদাবরীর ব-দ্বীপ যুক্ত অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূল ভূমি এবং মহানদীর ব-দ্বীপ যুক্ত উড়িষ্যার উপকূল ভূমি। মহানদী, গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর ব-দ্বীপ সন্নিহিত অঞ্চল নর্দার্ণ সার্কাস (Northern Circus) উপকূল এবং কৃষ্ণা নদীর মোহনা হইতে কন্যাকুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত ভূভাগ করমণ্ডল বা কর্ণাট উপকূল নামে পরিচিত।

বালুকাবেলা ঃ পূর্ব উপকূলের তটভাগ প্রশস্ত বালুকাবেলা দ্বারা গঠিত। তামিলনাড়ুর 'মেরিনা বীচ' (Marina Beach) এ সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উড়িষ্যা তীরবর্তী উপকূলভাগ সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া বালুকাবেলার উচ্চ অংশ গঠন করিয়াছে। অপরপক্ষে মহাবলীপুরম, রয়াপুরম প্রভৃতি অঞ্চলের বালুকাবেলা একদা সমুদ্রগর্ভে ছিল—এরূপ প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে।

বালুচর ও প্রবাল প্রাচীর ঃ এই বিস্তীর্ণ তটভূমির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে নদীমোহনার বালুচরের সৃষ্টি। আন্দার, গোদাবরী, মহানদী প্রভৃতি নদী মোহনার দ্বীপ এবং দক্ষিণে রামেশ্বরম দ্বীপ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দক্ষিণাঞ্চলে মূল ভূখণ্ড হইতে মান্নার উপসাগর ও পক-প্রণালীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে সমুদ্রগর্ভে বেলেপাথরের উপর প্রবাল সঞ্চিত হইয়া প্রবাল দ্বীপ গঠিত হইয়াছে।

বালিয়াড়ীঃ সমুদ্রে ভাটার সময়ে বায়ুর দ্বারা তাড়িত হইয়া সমুদ্র হইতে তটভূমির ১০ কিলোমিটার অভ্যন্তরে অসংখ্য বালিয়াড়ীর সৃষ্টি হইয়াছে। উড়িষ্যা সমভূমিতে সমান্তরাল শ্রেণীতে বিন্যস্ত এই বালিয়াড়ীগুলি গড়ে প্রায় ২।৩ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ১৬—২৭ মিটার উচ্চ। আরও দক্ষিণে কৃষ্ণা-গোদাবরী ব-দ্বীপের নিকট

এই বালুকাস্তুপ ১০—১৬ মিটার উচ্চ। তামিলনাড়ু অঞ্চলে ইহা ৩০—৬৫ মিটার পর্যন্ত স্তূপীকৃত হইয়া তিরুনাভেলী, মহাবলীপুরম প্রভৃতি অঞ্চলে এক বিশেষ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

উপহ্রদ ঃ ভূ-আন্দোলনের জন্য এই সকল বালিয়াড়ীর অতি নিকটেই উপ-হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছে। উড়িষ্যার তটভাগে চিল্কাহ্রদ এবং অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুর সীমান্তবর্তী অঞ্চলে পুলিকট হ্রদ ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সামাং ও সুর এই অঞ্চলে দুইটি সুপেয় জলের হ্রদ। আরও দক্ষিণে মহাবলীপুরম ও নন্নোরে এই জাতীয় উপহ্রদ দেখা যায়।

পর্বত ঃ এই সকল বালিয়াড়ী উপহ্রদ প্রভৃতির মাঝে মাঝে নাতিউচ্চ পর্বত দেখা যায়। তামিলনাড়ুর আন্দার ও পালার নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে উত্তরপূর্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রসারিত পর্বতটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহানদীর ব-দ্বীপের পাহাড়টি পূর্বঘাট পর্বতেরই শাখা বলিয়া মনে হয়। এই সকল পর্বতের মধ্যে বড়াদিহি (২৮০ মি.), উদয়গিরি (১৮৮ মি.), কর্লাসিরি (২১৬ মি.) বিশেষ প্রসিদ্ধ।

নদনদী ঃ এই অঞ্চলের প্রধান নদীগুলি পশ্চিমঘাট পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া পূর্বমুখে প্রবাহিত হইয়াছে ও অবশেষে বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। এই সকল নদীর উপকূলীয় অংশ ভূমিতল পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে এবং ইহাদের উপত্যকা বেশ প্রশস্ত। বর্ষার জলে পুষ্ট বলিয়া এগুলি সারা বৎসর নাব্য থাকে না।

উড়িষ্যা উপকূলের নদী ঃ মহানদীর সহিত ব্রাহ্মণী ও বৈতরণী সম্মিলিত হইয়া উত্তরে ভদ্রক হইতে দক্ষিণে চিল্কা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পলিভূমি গঠন করিয়াছে। এই তিনটি নদীর সম্মিলিত জলপ্রবাহ একটি মোহনা দ্বারা সমুদ্রে পড়িতেছে বলিয়া প্রায় প্রতি বৎসরই এই নদী উপত্যকা অঞ্চলে বন্যা দেখা দেয়। সম্প্রতি হীরাকুঁদ বাঁধ নির্মিত হওয়ায় এই বন্যার প্রকোপ কিছুটা কমিয়াছে। এই অঞ্চলের দ্বিতীয় নদী রুশিকুল্যা তাহার বিস্তীর্ণ তটভাগের জন্য উল্লেখযোগ্য।

অন্ধ্র উপকূলের নদী ঃ গোদাবরী নদী পূর্বঘাট পর্বতের পাপি গিরিখাতের মধ্য দিয়া সবেগে প্রবাহিত হইয়া উপকূলাঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছে। রাজমুন্দ্রীর দক্ষিণে গৌতমী, বশিষ্ঠ ও বৈনতেয়—নামে বিভক্ত হইয়া ব-দ্বীপ গঠন করিয়াছে। কৃষ্ণা জেলায় প্রবাহিত কৃষ্ণা নদী পালগুড়ার নিকটে দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে এবং মোহনা হইতে খুবই নিকটে তিনটি ভাগে বিভক্ত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িতেছে। শ্রীকাকুলাম জেলার দুইটি প্রধান নদী হইল বংশধারা ও নাগবতী।

তামিলনাড়ু উপকূলের নদী ঃ কাবেরী নদী তিরুচিরাপল্লীর পশ্চিমে দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া উত্তর ভাগ কলেরুন এবং দক্ষিণ ভাগ কাবেরী নামে প্রবাহিত হইতেছে। কাবেরী পত্তন নামক স্থানে ইহা সমুদ্রের সহিত মিলিয়াছে। ইহার অসংখ্য শাখা নদীর মধ্যে আসাশলাই, কেদানুতিয়্যার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আদাপার, কোরিয়ার নদীর অংশবিশেষ নৌবহন যোগ্য। এই অঞ্চলের পন্নিয়ার, পাম্বান, কোরতাই লাইয়্যার প্রভৃতি অন্যান্য নদীগুলিও পূর্বমুখে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে।

জলবায়ু ঃ সমগ্র উপকূলভাগে উষ্ণ ক্রান্তীয় জলবায়ু দেখা যায়। উত্তপ্ত গ্রীষ্ম, প্রচুর আর্দ্রতা, বার্ষিক বৃষ্টিপাত মধ্যম প্রকৃতির এবং দৈনিক তাপমাত্রার তারতম্য কম—ইহাই এই অঞ্চলের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য। উড়িষ্যার উপকূলের উত্তরপ্রান্ত

হইতে তামিলনাড়ুর উপকূলের দক্ষিণপ্রান্ত পর্যন্ত কোথাও ক্রান্তীয় সাভানা, কোথাও ক্রান্তীয় স্টেপ এবং কোথাও বা ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু দেখা যায়।

তাপমাত্রা ঃ ফেব্রুয়ারী হইতে মে পর্যন্ত তাপমাত্রা বাড়িতে থাকে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা দেখা যায় পুরী (৩৬° সে.) মসুলিপত্তন (৩৫° সে.) ও মাদ্রাজ (৩৫° সে.) অঞ্চলে। উপকূলের অভ্যন্তরভাগে তাপমাত্রা আরও বেশী। জানুয়ারীতে (অর্থাৎ শীতকালে) উপকূল অঞ্চলে ২২° সে. এবং অভ্যন্তরভাগে তাপমাত্রা আরও কম (১৯।২০° সে.) থাকে। সমুদ্র ও নাতিউচ্চ ভূ-প্রকৃতি হওয়ায় তাপমাত্রার বার্ষিক তারতম্য খুব বেশী নয়।

বৃষ্টিপাত ঃ উপকূলাঞ্চলে বৃষ্টিপাত (১৪০—১৭০ সে. মি.) অপেক্ষাকৃত বেশী এবং ইহা ক্রমশঃ অভ্যন্তরভাগের দিকে কমিতে (৭০—৮০ সে. মি.) থাকে। সেইজন্য বালেশ্বর, পুরী, কাকিনাড়া প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং তুতিকোরিন (৬০ সে. মি.) পানায়ামকোট্টাই (৯২ সে. মি.) প্রভৃতি অঞ্চলে বৃষ্টিপাত তুলনামূলকভাবে কম। ইহার কারণ উড়িষ্যা ও অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলাঞ্চলে অধিকাংশ বৃষ্টি দক্ষিণপশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে হয়। যতই দক্ষিণে যাওয়া যায়, ততই উপকূলভাগ মৌসুমী বায়ুর প্রভাব হইতে দূরে সরিয়া যায়। আরও দক্ষিণে গেলে প্রত্যাবর্তনকারী মৌসুমী বায়ুর দ্বারা ঝড় সহ বৃষ্টিপাত হয়।

মৃত্তিকা ঃ এই অঞ্চল মূলতঃ পলিদ্বারা গঠিত হইলেও ল্যাটেরাইট, রক্তমৃত্তিকা ও কৃষ্ণমৃত্তিকাও স্থান বিশেষে দেখা যায়। (১) **পলিমৃত্তিকাঃ** ইহা দুই প্রকারেরঃ তটভূমির পলি ও নদীজাত পলি। বালেশ্বর হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত অংশে তটভূমির পলি এবং বিভিন্ন নদী মোহনা ও ব-দ্বীপ অঞ্চলে নদীজাত পলি দেখা যায়। এই মৃত্তিকা অত্যন্ত উর্বর ও ধান চাষের পক্ষে অনুকূল। (২) **ল্যাটেরাইট ঃ** ইহা ক্রান্তীয় ও উপ-ক্রান্তীয় অঞ্চলের মৃত্তিকা। উড়িষ্যার উপকূলের বালেশ্বরের উত্তর দিকে, অন্ধ্র উপকূলে গোদাবরী ও নেলোর জেলায় এবং তামিলনাড়ু উপকূলে তাঞ্জাবর ও চিঙ্গেলপুট জেলায় এই মৃত্তিকা দেখা যায়। এই মৃত্তিকা লৌহ, এ্যালুমিনা প্রভৃতি ধাতব গুণসম্পন্ন। (৩) **রক্তবর্ণ মৃত্তিকা ঃ** অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলাম, বিশাখাপত্তন, পূর্ব গোদাবরী প্রভৃতি জেলায় প্রচুর পরিমাণে এবং কৃষ্ণা, গুণ্টুর, নেলোর প্রভৃতি স্থানে স্বল্প পরিমাণে দেখা যায়। তামিলনাড়ুর অনেক অংশ এই মৃত্তিকায় গঠিত। প্রচুর পরিমাণে লৌহ থাকায় ইহা রক্তবর্ণ। এই মৃত্তিকা চুন ও ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ। (৪) **কৃষ্ণ মৃত্তিকাঃ** এই মৃত্তিকা চুন, এ্যালুমিনা ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ। তবে ফসফরাস, নাইট্রোজেন ও জৈবপদার্থ ইহাতে স্বল্প পরিমাণে পাওয়া যায়। চিল্কা হ্রদ সন্নিহিত অঞ্চল, পশ্চিম গোদাবরী, গুণ্টুর, কৃষ্ণা জেলায় এই মৃত্তিকা দেখা যায়। তামিলনাড়ুর মাদুরাই, রামনাথপুরম, তিরুচিরাপল্লী জেলার অধিকাংশ এই মৃত্তিকায় গঠিত।

স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জঃ উপকূল ভাগের অরণ্যাঞ্চল তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। অধিকাংশ সমভূমি কৃষি কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়, তবে তটভাগের অরণ্য, জলাভূমি ও গুল্মজাতীয় বৃক্ষ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে এই সকল অঞ্চলও মুক্ত করিয়া কাজুবাদাম ও নারিকেল চাষ করা হইতেছে।

অরণ্যভূমি ঃ (১) ক্রান্তীয় আর্দ্র পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য পুরী, গঞ্জাম প্রভৃতি জেলায় দেখা যায়। এই অরণ্য অন্ধ্রপ্রদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত যুক্ত শ্রীকাকুলাম, বিশাখাপত্তন, পূর্ব ও পশ্চিম গোদাবরী প্রভৃতি জেলায়ও দেখা যায়। (২) কাঁটা

ও গুল্ম জাতীয় বৃক্ষের অরণ্য সমুদ্র উপকূলের নেলোর, তিরুনা-ভেলী ও রামনাথপুরম জেলায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রামেশ্বরম ও পাম্বানের সন্নিহিত সমুদ্রতীরের বালিয়াড়ীতে বাবলা জাতীয় গাছ জন্মে। (৩) কটক ও বালেশ্বরের সমুদ্র সন্নিহিত বনভূমি, কৃষ্ণা, গুণ্টুর ও নেলোর জেলার সমুদ্র সন্নিহিত বনভূমি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তামিলনাড়ুর উপকূলাঞ্চলে এই সকল বৃক্ষ বিক্ষিপ্তভাবে দেখা যায়।

৩। সাংস্কৃতিক পরিচয়

জনসংখ্যা : সমগ্র উপকূলাঞ্চলের ১০২.৮৮২ বর্গ কিলোমিটার পরিমিত এলাকায় ৩,৫১,৮৫,৭২০ লোক বাস করে। সুতরাং এখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ৩৪২ জন। উড়িষ্যার মহানদী-ব্রাহ্মণী ব-দ্বীপ অঞ্চল ও রুশি-কুল্যা সমভূমি, অন্ধ্রপ্রদেশের বংশধারা-নাগবতী নদী উপত্যকা ও কৃষ্ণা-গোদাবরী ব-দ্বীপে, তামিলনাড়ুর নিম্ন পালার, নিম্ন পান্নিয়ার ও ভেলোর অববাহিকায়, নিম্ন কাবেরী ও তাম্রপর্ণী নদী উপত্যকায় সর্বাধিক জনবসতি দেখা যায়।

জনসংস্কৃতি : সমগ্র জনসংখ্যার অতি ক্ষুদ্র অংশই কর্মে নিযুক্ত আছে, তবে অন্ধ্র উপকূলেই কর্মীর সংখ্যা তুলনায় কিছু বেশী। কৃষি কাজ এই অঞ্চলের প্রধান জীবিকা বলিয়া সমগ্র কর্মীর ৫০% ইহা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। খনি ও খনি সংক্রান্ত কর্ম, গৃহজাত শিল্প ও বৃহদায়তন শিল্পে সমগ্র কর্মীর ১১ শতাংশ এবং অবশিষ্ট অংশ ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী, পরিবহণ ও নানাবিধ উপায়ে অন্নসংস্থান করে। সমগ্র উপকূলাঞ্চলে উড়িয়া ও তামিলী জাতি বাস করে। ইহারা উড়িয়া ও তামিল ভাষা ব্যবহার করে। মূলতঃ হিন্দু হইলেও এই অঞ্চলে কিছু পরিমাণে মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকও বাস করে।

গ্রাম ও শহর : সমগ্র জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ উপকূলাঞ্চলের অসংখ্য ক্ষুদ্রবৃহৎ গ্রামে বাস করে। সমুদ্র ও নদীকে কেন্দ্র করিয়া এই সকল গ্রাম গড়িয়া উঠিয়াছে। অবশিষ্ট জনসংখ্যা উপকূলের ক্ষুদ্রবৃহৎ ২০টি শহরে বাস করে। তুলনামূলকভাবে উড়িষ্যার উপকূল সর্বনিম্ন এবং তামিলনাড়ুর উপকূল সর্বাধিক শহরসমৃদ্ধ অঞ্চল। প্রাচীনকালের সমুদ্রতীরবর্তী নগর ও বন্দরগুলি এবং ধর্মক্ষেত্রগুলিও (পুরী, রামেশ্বরম্ প্রভৃতি) বর্তমানে সমৃদ্ধ শহরে রূপান্তরিত হইয়াছে।

(ক) উড়িষ্যা উপকূলের শহর : (১) ভুবনেশ্বর : (৩৮২১১) কটক হইতে ৩২ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত উড়িষ্যার নবনির্মিত আধুনিক শহর ও নূতন রাজধানী। এখানে একটি ডিজেল শক্তি কেন্দ্র, রিজিওন্যাল কলেজ অব এডুকেশন আছে। ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্স্ পরিচালিত বিমানপথের একটি বন্দর এখানে অবস্থিত। **(২) কটক :** মহানদী নদীর তীরে অবস্থিত উড়িষ্যার প্রাচীন রাজ-ধানী। এখানে চৌদুয়ার ও বারাং শিল্প এলাকা সমেত অন্যান্য অনেকগুলি শিল্প কেন্দ্র আছে। **(৩) বহরমপুর :** (৭৬৯৩১) : জেলার সদর শহর, এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ইহা উড়িষ্যার তৃতীয় বৃহৎ শহর এবং উপকূলাঞ্চল ও চিল্কা হ্রদ অঞ্চলের আর্থিক কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করে। **(৪) পুরী :** (৬০৮১৫) জগন্নাথদেবের মন্দিরের জন্য প্রসিদ্ধ। **(৫) বালেশ্বর :** জেলার প্রধান শহর। এখানকার সমুদ্র উপকূল (চন্ডীপুর-অন-সী) বিশেষ মনোরম স্থান ও পর্যটক-দের পক্ষে আকর্ষণীয়।

(খ) **অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের শহর : (১) বিশাখাপত্তন** (১,৮২,০০৪) অন্ধ্র উপকূলের সর্ববৃহৎ শহর। নানাবিধ বাণিজ্যিক ও শিল্প কেন্দ্রের প্রসারে এই শহর যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। জাহাজ নির্মাণ শিল্প, তৈল শোধনাগার প্রভৃতির জন্য ইহা বিখ্যাত। (২) রাজমুন্দ্রীঃ (১,৩০,০০২) গোদাবরী নদীর ব-দ্বীপে অবস্থিত দ্বিতীয় বৃহৎ শহর। রপ্তানী বাণিজ্যের জন্য এই শহর প্রসিদ্ধ। নানাবিধ শিল্প এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ইহা একটি উল্লেখযোগ্য শহর। (৩) **কাকিনাড়াঃ** (১২২৮৬৫) পূর্ব গোদাবরী জেলার সদর শহর ও উল্লেখযোগ্য শিল্পকেন্দ্র। এখানে দস্তা ধাতু শিল্প, এ্যালুমিনিয়াম শিল্প প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা একটি ক্ষুদ্র বন্দর। (৪) **বিজয়বাড়া :** কৃষ্ণা ব-দ্বীপে অবস্থিত একটি চাউল রপ্তানী কেন্দ্র। শহরের চারিপাশে তামাক ও সব্জী চাষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রেও ইহার নাম আছে। (৫) **নেলোর:** পেন্নার নদীর দক্ষিণতটে জাতীয় সড়ক ৫-এর নিকটে অবস্থিত। চাউল কল, তামাক শিল্প, মোটর সংক্রান্ত শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এখান হইতে চাউল রপ্তানী হয়।

(গ) **তামিলনাড়ু উপকূলের শহর : (১) মাদ্রাজ :** (১৭,২৯,১৪১) করমণ্ডল উপকূলে অবস্থিত তামিলনাড়ু রাজ্যের প্রধান শহর, রাজধানী ও বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র। কৃষি ভিত্তিক ও ধাতু ভিত্তিক নানাবিধ শিল্প এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতের বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বন্দর হিসাবে ইহার বিশেষ গুরুত্ব আছে। (২) **মাদুরাইঃ** (৪২৪৮১০) তামিলনাড়ুর দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। ইহা মূলতঃ একটি বাণিজ্যপ্রধান শহর এবং তামিলনাড়ুর একটি প্রাচীন জনপদ। এখানকার মন্দির-স্থাপত্য ভারতবিখ্যাত ও পর্যটকদের পক্ষে বিশেষ আকর্ষণীয়। (৩) **পণ্ডিচেরী :** (৪০৪২১) একদা ফরাসী অধিকৃত স্থান এবং বর্তমানে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

৪। আর্থিক পরিচয়

কৃষিজ সম্পদ : কৃষিজ সম্পদ দ্বারাই পূর্ব উপকূলাঞ্চলের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। তিনটি উপকূলের বৈশিষ্ট্য তিন প্রকার। সমগ্র অঞ্চলে ধানাই প্রধান কৃষিজ উৎপাদন হইলেও উড়িষ্যা উপকূলে পাট অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে তামাক ও তৈলবীজ এবং তামিলনাড়ুর উপকূলে বাদাম ও অন্যান্য তৈলবীজ প্রধান।

ধান : ব-দ্বীপ অঞ্চলগুলি ধান্য চাষের পক্ষে খুবই অনুকূল। মহানদী ব-দ্বীপের দেবীদয়া, শালিপুর ও পাটকুয়া অঞ্চলে প্রচুর ধান্য চাষ হয়। অন্ধ্রপ্রদেশের পূর্ব ও পশ্চিম গোদাবরী জেলায় কৃষ্ণা, গুণ্টুর, নেলোর ও শ্রীকাকুলাম জেলায়ও প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হয়। তামিলনাড়ুর পালার কাবেরী ও তাম্রপর্ণী নদী উপত্যকা ধান্য চাষের জন্য ব্যবহৃত হয়।

পাটঃ উড়িষ্যায় মহানদীর ব-দ্বীপে (কেন্দ্রপাড়া, পাটামুড়াই, পাটকুড়া) সর্বাধিক পাট উৎপন্ন হয়। অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুতে ইহার চাষ উল্লেখযোগ্য নয়।

ডাল : উড়িষ্যায় রুশিকুল্যা নদী সমভূমি, অন্ধ্রের সমগ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে (বিশেষতঃ বিশাখাপত্তনে) এবং তামিলনাড়ুর সর্বত্রই ছোলা জাতীয় ডাল উৎপন্ন হয়।

বাজরা ও রাগী : উড়িষ্যার দক্ষিণ বালেশ্বর অঞ্চলে, অন্ধ্রপ্রদেশের গুণ্টুর, শ্রীকাকুলাম, নেলোর প্রভৃতি উপকূলীয় অঞ্চলে এবং তামিলনাড়ুর উত্তর আর্কট,

চিংগেলপুট, বৃন্ধচলম জেলায় ইহার উৎপাদন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তৈলবীজ ঃ উড়িষ্যায় মহানদী-ব্রাহ্মণী-বৈতরণী ব-দ্বীপের মধ্যাঞ্চলে, অন্ধ্রপ্রদেশের গুণ্টুর, পূর্ব গোদাবরী, পশ্চিম গোদাবরী ও বিশাখাপত্তনে এবং তামিলনাড়ুর তিরুচিরাপল্লী ও রামনাথপুরমে ইহার উৎপাদন হইয়া থাকে।

বাদাম ঃ উড়িষ্যায় ইহার উৎপাদন তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তবে অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা, গুণ্টুর বিশাখাপত্তন, শ্রীকাকুলাম প্রভৃতি জেলায় এবং তামিলনাড়ুর উত্তর ও দক্ষিণ আর্কট অঞ্চলে ইহা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে চাষ হইয়া থাকে।

ইক্ষু ঃ উড়িষ্যার মহানদী-বৈতরণী-ব্রাহ্মণী ব-দ্বীপের মধ্যবর্তী অঞ্চলে, অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলাম, পশ্চিম গোদাবরী, বিশাখাপত্তন অঞ্চলে এবং তামিলনাড়ুর কাবেরী উপত্যকায় ইহার চাষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অন্যান্য ঃ অন্ধ্রের পূর্ব গোদাবরী অঞ্চল এবং তামিলনাড়ুর সমগ্র তীরবর্তী অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে নারিকেল চাষ হয়। তামাক উৎপাদনে অন্ধ্রের গুণ্টুর জেলার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তামিলনাড়ুর রামনাথপুরমে ও মাদুরাইয়ের কৃষ্ণমৃত্তিকায় উৎকৃষ্ট তুলা উৎপন্ন হয়।

সেচ-ব্যবস্থা ঃ নিম্নভূমি অঞ্চলে (কৃষ্ণা, মহানদী প্রভৃতির ব-দ্বীপ অঞ্চলে) খালের দ্বারা জলসেচ হয়। তটভূমি অঞ্চলে (চিংগেলপুট, শ্রীকাকুলাম প্রভৃতি অঞ্চল) জলাশয়ের দ্বারা এবং উপকূলের উচ্চভূমি অংশে কূপ দ্বারা জলসেচন করা হয়। **উড়িষ্যার উপকূলে** (১) সালান্ডি প্রকল্প মূলতঃ বালেশ্বর জেলার জন্য, (২) বৈতরণী প্রকল্প নদীসান্নিহিত তটভূমি অঞ্চলের জন্য, (৩) মহানদী খাল প্রকল্প দেবী-মহানদী অঞ্চল, মহানদী-বিরূপা অঞ্চল ও বিরূপা-ব্রাহ্মণী অঞ্চলের জন্য, (৪) রুশিকুল্যা প্রকল্প নদীসান্নিহিত তটভূমি অঞ্চলের জন্য, (৫) হীরাধর বাতি প্রকল্প রুশিকুল্যা নদীর পূর্ব তটের জন্য, (৬) সুলিয়া প্রকল্প চিল্‌কা হ্রদের পশ্চিমাঞ্চলের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (খ) **অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলে** গোদাবরী নদীর তিনটি খাল দ্বারা, কৃষ্ণা নদীর দুইটি খাল দ্বারা জলসেচ হইয়া থাকে। বিশাখাপত্তন, নেলোর ও শ্রীকাকুলাম অঞ্চলে জলাশয়ের দ্বারা এবং কোন কোন অঞ্চলে নলকূপের সাহায্যেও জলসেচ করা হয়। (গ) **তামিলনাড়ুর উপকূলে** কাবেরী ও তাম্রপর্ণী ব-দ্বীপে খাল সেচ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চিংগেলপুট, রামনাথপুরম, তিরুনাভেলী অঞ্চলে জলাশয়ই প্রধান সেচ কেন্দ্র। পালার, পন্নিয়ার, ভেলার, মণিমুক্তা প্রভৃতি নদীগুলি সেচ কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। কাবেরী প্রকল্প দ্বারা তাঞ্জাবর ও তিরুচিরাপল্লী জেলা বিশেষ উপকৃত হয়।

শিল্পজ সম্পদ ঃ পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চল শিল্পোৎপাদনের দিক হইতে তেমন উন্নত নহে। এই অঞ্চলের তামিলনাড়ু সর্বাপেক্ষা উন্নত এবং উড়িষ্যার উপকূল অনগ্রসর অঞ্চল। শিল্পস্থাপনের উপযোগী কাঁচামালের অভাবই ইহার প্রধান কারণ। তবে তামিলনাড়ুর এই শিল্পোন্নতির মূলে আছে তাপশক্তির প্রাচুর্য, উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা, বৃটিশদের স্থাপিত আদি শিল্পকেন্দ্র সমূহ। নিম্নে সমগ্র অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকৃতির শিল্পোৎপাদনের বিবরণ দেওয়া হইল ঃ

(১) **তাপ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন** ঃ উড়িষ্যার চৌধায় একটি তাপকেন্দ্র এবং ভুবনেশ্বর, জলেশ্বর, ভদ্রক অঞ্চলে ডিজেল শক্তি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তন, নেলোরে তাপ উৎপাদন দ্বারা গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতের সম্প্রসারণ ও শহরাঞ্চলে শিল্পের প্রসার হইয়াছে। তামিলনাড়ুতে স্থানীয় লিগনাইটকে কেন্দ্র করিয়া

নিয়েভেলী অঞ্চলে একটি বৃহৎ তাপকেন্দ্র নির্মিত হইয়াছে। মাদ্রাজের নিকটবর্তী কলাপাখাম অঞ্চলের আণবিক শক্তি কেন্দ্রটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

(২) **খনিজ শিল্পঃ** উড়িষ্যার উপকূলাঞ্চলে জাজপুরে একটি ফেরো-ক্রোম শিল্প, চৌদুয়ার শিল্পাঞ্চলে গ্যালভানাইজড পাইপ শিল্প, বারাং শিল্পাঞ্চলে সেরামিক ও কাঁচ শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্ধ্রপ্রদেশের রাজমুন্দ্রী, বিশাখাপত্তন ও বিজয়নগর অঞ্চলে অ্যালুমিনিয়াম এবং রাজমুদ্রী অঞ্চলে দস্তাকে কেন্দ্র করিয়া অনেক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। বিজয়বাড়া ও গুণ্টুরে সিমেণ্ট, পূর্ব ও পশ্চিম গোদাবরী ও নেলোরে মৃৎ শিল্প ও সেরামিক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশাখাপত্তন ও মানালি (তামিলনাড়ু) অঞ্চলে দুইটি তৈলশোধনাগার আছে। তামিলনাড়ুর তিরুচিরাপল্লী, রামনাথপুরম, তিরুনাভেলী অঞ্চলে সিমেণ্ট শিল্প, মাদ্রাজ ও নিয়েভেলী অঞ্চলে সার শিল্প, তুতিকোরিন অঞ্চলে লবণ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

(৩) **কৃষিজ শিল্প ঃ** উড়িষ্যার উপকূলাঞ্চলে চৌদুয়ার শিল্পক্ষেত্রে বস্ত্রবয়ন, ও তটভূমি অঞ্চলে দেশের অধিকাংশ ধান্যকল স্থাপিত। তামিলনাড়ুর উপকূল ভাগে কাঞ্চিপুরম, মাদুরাই, রামনাথপুরম প্রভৃতি অঞ্চলে অনেকগুলি বস্ত্রবয়ন কেন্দ্র আছে। অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে এই শিল্প তেমন প্রসার লাভ করে নাই।

(৪) **কারিগরী শিল্পঃ** উড়িষ্যার কটকে রেফ্রিজারেটার নির্মাণ কেন্দ্র, খুরদা অঞ্চলে রেলওয়ে সংক্রান্ত শিল্প, অন্ধ্র উপকূলের বিশাখাপত্তনে জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র, তামিলনাড়ুর ভান্ডালপুর প্রভৃতি অঞ্চলে মোটরগাড়ী, লরী নির্মাণ প্রভৃতি শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এশিয়ার বৃহত্তম কোচ নির্মাণ কেন্দ্রটি পেরাম্বুরে অবস্থিত।

(৬) **বিবিধ শিল্প ঃ** উড়িষ্যার চৌদুয়ার অঞ্চলে কাগজ নির্মাণ কেন্দ্র, চিল্কা হ্রদ অঞ্চলে মৎস্য সংক্রান্ত শিল্প, পুরীর শিংজাত হস্তশিল্প প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অন্ধ্রের বনজ সম্পদ ভিত্তি করিয়া পূর্ব ও পশ্চিম গোদাবরী অঞ্চলে কয়েকটি শিল্প স্থাপিত হইয়াছে। তামিলনাড়ুর নোমপেট অঞ্চলে চর্ম শিল্প, রামনাথপুরম (শিবকাশী) অঞ্চলে দেশলাই শিল্প বিশেষ প্রসিদ্ধ।

যোগাযোগ-ব্যবস্থা ঃ এই অঞ্চলের সড়ক ও রেলপথ উপকূলের প্রায় অভ্যন্তরভাগ পর্যন্ত প্রসারিত। জাতীয় সড়ক ৫ কলিকাতা—কটক—বিশাখাপত্তন—বিজয়বাড়া—তিরুচিরাপল্লী—মাদুরাই হইয়া তামিলনাড়ুর দক্ষিণপ্রান্ত পর্যন্ত গিয়াছে।

সড়কপথ ঃ উড়িষ্যা উপকূলাঞ্চলের ছয়টি শহর হইতে সড়কপথগুলি নদীর সমান্তরাল হইয়া সমুদ্র উপকূলের দিকে প্রসারিত হইয়াছে। অন্ধ্র-উপকূলে একটি মাত্র গুরুত্বপূর্ণ সড়ক (জাতীয় সড়ক ৫) পথ আছে—অন্যান্য সড়কগুলি দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করিতেছে। তামিলনাড়ু-উপকূলে চারিটি জাতীয় সড়ক (৪৪, ৪৫, ৪৬ ও ৪৯) প্রসারিত হইয়াছে। এই সকল সড়কপথ নাগাপত্তন, রামেশ্বরম, তুতিকোরিন, তিরুচিরাপল্লী প্রভৃতি স্থানের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতেছে।

রেলপথ ঃ উড়িষ্যার উপকূলাঞ্চলে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের একটি শাখা বালেশ্বর ভদ্রক-কটক-খুরদা রোড গঞ্জাম হইয়া অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের শ্রীকাকুলাম, বিশাখাপত্তন পর্যন্ত বিস্তৃত। অতঃপর দক্ষিণ রেলপথের একটি শাখা অন্ধ্রের বিশাখাপত্তন হইতে কাকিনাড়া-গুণ্টুর-নেলোর হইয়া, তামিলনাড়ুর মাদ্রাজ-কুড্ডালোর-তিরুচিরাপল্লী-তুতিকোরিন পর্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে।

জলপথ : উড়িষ্যার একমাত্র জলপথ কটক জেলায় তালাডাঙ্গা, কেন্দ্রপাড়া, গোবাড়ী প্রভৃতি খালের মাধ্যমে লবণ, খাদ্যশস্য কাঠ ইত্যাদি সামগ্রী বহন করা হয়। গোদাবরী কৃষ্ণা ব-দ্বীপে প্রচুর খাল থাকা সত্ত্বেও সেগুলি দ্বারা বর্তমানে যাতায়াত করা সম্ভব হয় না। তামিলনাড়ুতে সড়কপথ ও রেলপথ হওয়ার আভ্যন্তরীণ জলপথের তেমন উন্নতি হয় নাই।

বিমানপথ : সমগ্র পূর্ব উপকূলের মধ্যে একমাত্র মাদ্রাজ ও ভুবনেশ্বরেই বিমান-বন্দর আছে। এই দুইটি স্থান হইতে বহির্ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক দেশগুলির সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। তামিলনাড়ুর মাদুরাই ও তিরুচিরাপল্লীর অপর দুইটি ক্ষুদ্র বিমানবন্দর হইতে ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে যাতায়াত করা হয়।

বন্দর : (১) মাদ্রাজ : বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত ইহা ভারতের তৃতীয় বৃহত্তর বন্দর। ইহা একটি কৃত্রিম বন্দর ও পোতাশ্রয় বলিয়া ইহার রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তামিলনাড়ুর, কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশের কিয়দংশ এই বন্দরের পশ্চাদভূমি। বিভিন্ন রেলপথের দ্বারা এই বন্দরটি পশ্চাদভূমির সহিত সংযুক্ত। কার্পাস ও কার্পাস বস্ত্র, অভ্র তৈলবীজ, চা তামাক ও কফি এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। আমদানী দ্রব্যের মধ্যে খনিজ তৈল, গম, চাউল, যন্ত্রপাতি কাগজ, রাসায়নিক দ্রব্য বিলাস সামগ্রী প্রভৃতি প্রধান।

(২) বিশাখাপত্তন : অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলে অবস্থিত ভারতের চতুর্থ প্রধান বন্দর ও স্বাভাবিক পোতাশ্রয়। পর্বত বেষ্টিত বলিয়া এই স্থান প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইতে সহজেই রক্ষা পায়। উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশের কিয়দংশ, কলিকাতা বন্দরের পশ্চাদভূমির কিয়দংশ এই বন্দরের পশ্চাদভূমি। এই বন্দর দিয়া ম্যাঙ্গানীজ, তৈলবীজ, কাঠ, লৌহ, অভ্র, তামাক, কার্পাস বস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্য রপ্তানী হয় এবং আমদানী দ্রব্যের মধ্যে খনিজ তৈল, যন্ত্রপাতি, বিলাস দ্রব্য ও শিল্পজাত দ্রব্যই প্রধান।

(৩) পারাদীপ : উড়িষ্যার উপকূলাঞ্চলে এই বন্দরটি গড়িয়া উঠিতেছে। ইহার পশ্চাদভূমি আকরিক লৌহ সমৃদ্ধ। এই বন্দরের মাধ্যমে জাপানে আকরিক লৌহ রপ্তানী করা হয়। যোগাযোগ উন্নত করিবার জন্য কটক হইতে পারাদীপ পর্যন্ত একটি শাখা রেলপথ নির্মিত হইতেছে।

(৪) তুতিকোরিন : ইহা তামিলনাড়ুর সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত দক্ষিণ ভারতের একটি প্রধান বন্দর। তিনেভেলী, রামনাদ, তিরুচিরাপল্লী প্রভৃতি এই বন্দরের পশ্চাদভূমি। ভারতের সহিত শ্রীলংকার বাণিজ্য সম্বন্ধ এই পথেই গড়িয়া উঠিয়াছে। এই বন্দর দিয়া কার্পাস, চা, পিয়াজ, লংকা, এলাচ, গবাদিপশু ইত্যাদি রপ্তানী হয় এবং কয়লা, যন্ত্রপাতি, শিল্পদ্রব্য ইত্যাদি আমদানী হইয়া থাকে।

৮
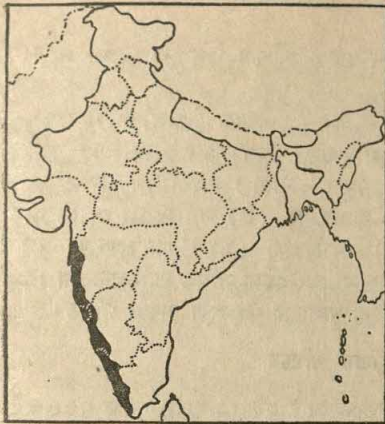
।। পশ্চিম উপকূল অঞ্চল ।।

১. সাধারণ পরিচয়

ভূমিকা ঃ পশ্চিমের উপকূলীয় অঞ্চল স্পষ্টই তিনটি অংশে গঠিত ঃ কোংকন, কর্ণাটক বা কানাড়া এবং কেরালা বা মালাবার উপকূল। ইহাদের মধ্যে কর্ণাটক উপকূল অন্য দুইটি উপকূলাঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। উত্তরে কোংকন উপকূলাঞ্চল ক্রমে আরো উত্তরে প্রসারিত হইয়া গুজরাট সমভূমির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। দক্ষিণে মালাবার উপকূলাঞ্চল আরও দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হইয়া পূর্বঘাট পর্বতের সহিত মিলিত হইয়াছে।

অবস্থান ও সীমা ঃ এই অঞ্চলটি ৪°১৫′ উত্তর হইতে ২০°২২′ উত্তর এবং ৭২°৪০′ পূর্ব হইতে ৭৭°২০′ পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিমে আরব সাগর ইহার প্রাকৃতিক সীমারেখা নির্দেশ করিলেও, পূর্বদিকে এই অঞ্চলের কোন সীমারেখা না থাকায় সহ্যাদ্রি পর্বতের পাদদেশের ১৫০ মিটার সমোন্নতি রেখাকেই এই অঞ্চলের পূর্বের সীমারেখা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। রাজনৈতিক দিক হইতে মহারাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূল (কোংকন), কর্ণাটকের পশ্চিম উপকূল (কর্ণাটক বা কানাড়া) এবং কেরালার (মালাবার) পশ্চিম উপকূল লইয়া এই অঞ্চল গঠিত।

আয়তন ঃ সমগ্র অঞ্চলের আয়তন ৬৪,২৮৪ বর্গ কিলোমিটার। সমগ্র তটরেখার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪০০ কিলোমিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে গড় বিস্তৃতি ৮০ কিলোমিটার। আয়তনের দিক হইতে মালাবার উপকূলের স্থান প্রথমেই এবং কর্ণাটক উপকূলের দৈর্ঘ্য সর্বাপেক্ষা কম।

বর্তমান ইতিহাস ঃ বৃটিশ রাজত্বকালে এই অঞ্চল বোম্বাই, মাদ্রাজ ও মাদ্রাজের ত্রিবাংকুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্য পুনর্গঠনের সময়ে কোচিন, ত্রিবাংকুর ও মালাবার লইয়া কেরালা রাজ্য গঠিত হয়। বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ ও তৎকালীন মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশ লইয়া মহারাষ্ট্র গঠিত হয় এবং মহীশূর, হায়দ্রাবাদ ও মাদ্রাজের কিছু অংশ লইয়া মহীশূর রাজ্য (অধুনা কর্ণাটক) গঠিত হয়। কন্যাকুমারী মূলতঃ ত্রিবাংকুরের অংশ হইলেও উহা নিয়মানুযায়ী তামিলনাড়ুর (পূর্বতন মাদ্রাজ) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক,

কেরালা ও তামিলনাড়ুর যে সকল অংশ লইয়া পশ্চিম উপকূল অঞ্চল গঠন করা হইয়াছে, তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল ঃ

অঞ্চল পরিচয়ঃ মহারাষ্ট্রের (১) থানা, (২) কোলাবা (আলীবাগ), (৩) রত্নগিরি, (৪) গোয়া লইয়া কোংকন উপকূল অঞ্চল। কর্ণাটক রাজ্যের (৫) কারোয়ার (উত্তর কানাড়া), (৬) ম্যাঙ্গালোর (দক্ষিণ কানাড়া) লইয়া কর্ণাটক বা কানাড়া উপকূল অঞ্চল। কেরালা রাজ্যের (৭) কান্নানোড়, (৮) কালিকট (কোজিকোদ), (৯) পালঘাট, (১০) ত্রিচুর, (১১) কোট্টিয়াম, (১২) এর্ণাকুলম্, (১৩) আল্লেপ্পি, (১৪) কুইলন, (১৫) ত্রিবান্দ্রাম এবং ইহার সহিত তামিলনাড়ুর (১৬) কন্যাকুমারী (নাগের কয়েল) জেলা লইয়া মালাবার উপকূল অঞ্চল গঠিত।

২. প্রাকৃতিক পরিচয়

সহ্যাদ্রি পর্বত ঃ আরব সাগরের সমান্তরালবর্তী হইয়া সহ্যাদ্রি পর্বত ৭৬০ হইতে ১২২০ মিটার উচ্চতা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বিভিন্ন উপাদানে গঠিত এই পর্বতটির নিম্নভূমির দিকে খাড়াই-ঢাল বিশিষ্ট। এই ধারাবাহিক পর্বতের মধ্যবর্তী বহু স্থানে ঘাট (Gap) আছে। যেমনঃ—থল ঘাট, ভোর ঘাট, পালঘাট ইত্যাদি। এই সকল ঘাট বা Gap থাকায় পর্বতের পূর্ব পার্শ্বে দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য অংশে যাতায়াতের পথ সুগম হইয়াছে।

কোংকন উপকূল ঃ কোংকনের বন্ধুর নিম্নভূমি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫৬০ কিলোমিটার এবং ইহার সর্বনিম্ন বিস্তৃতি ৩০ কিলোমিটার। যদিও স্থানে স্থানে ইহা সমুদ্র হইতে প্রায় ৫০ কিলোমিটার প্রশস্ত, বম্বের নিকট ইহা সর্বাধিক প্রশস্ত। সাধারণভাবে কোংকন উপকূলের উত্তরাংশে যে দুইটি বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হয় তাহা হইল (১) সমুদ্রতীরে মৌসুমী বায়ুর দ্বারা তাড়িত হইয়া প্রচুর বালুকা স্তূপীকৃত হয় এবং বালিয়াড়ীর সৃষ্টি করে ও (২) পশ্চিমঘাট পর্বত হইতে উৎপন্ন ছোট ছোট নদীগুলি এই বালুকাস্তূপে বাধা পাইয়া জলাশয়ের সৃষ্টি করে। অপর পক্ষে, দক্ষিণ কোংকন অঞ্চলের প্রস্তরময়, রুক্ষ ও সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী ও মালভূমির ঢাল দিয়া অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য অংশের তুলনায় গোয়ার নিকটবর্তী অঞ্চলের উপকূল ভাগ কিছু পরিমাণে ব-দ্বীপের বৈশিষ্ট্যযুক্ত। এখানে নদীমোহনার প্রকৃতি রিয়া (Ria) ধরনের এবং তাহা বেশ প্রশস্ত।

কর্ণাটক উপকূলঃ এই উপকূল ৩২০ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ইহার সর্বনিম্ন প্রস্থ ২৫ কিলোমিটার। (দক্ষিণ কর্ণাটক অঞ্চলে) ও সর্বাধিক বিস্তৃতি ৭০ কিলোমিটার (ম্যাঙ্গালোরের নিকটে)। কারোয়ারে ৬১ মিটার উচ্চে নিস্ (Gneiss) পাথরের এক শংকু আকৃতির পর্বত আছে। তিন সারি বন্ধুর সমান্তরাল বৈচিত্র্যময় এই ভূ-খণ্ডের বৈশিষ্ট্য হইল ঃ (১) উপকূলের সন্নিকটে অপেক্ষাকৃত নবগঠিত তটভূমি। ইহা প্রায় সমতল বা কোথাও সামান্য ঢালযুক্ত, বালুস্তূপ, নদী মোহনার পলি, কর্দম ইত্যাদির সমভূমি এবং উপত্যকা সমভূমি দ্বারা গঠিত।

এই ভূভাগের গড়-উচ্চতা ৩০ মিটার, (২) ইহার পূর্বে আছে ৬১ মিটার উচ্চ এক ক্ষয়ীভূত ভূখণ্ড, ইহার দক্ষিণাংশ মাত্র ২৫ কিলোমিটার প্রশস্ত। এই অংশে বহু খাড়া ঢালের নদীর সৃষ্টি হইয়াছে। (৩) আরও অভ্যন্তর ভাগে আছে ৯১ মিটার হইতে ৩০৫ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট বিচ্ছিন্ন পার্বত্য ভূখণ্ড। এই সকল বিচ্ছিন্ন পর্বত আর্কিয়ান যুগের নিস দ্বারা গঠিত।

মালাবার উপকূল ঃ ইহা ৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ইহার সর্বনিম্ন প্রস্থ ২০ কিলোমিটার। তবে স্থানে স্থানে ইহা ১০০ কিলোমিটার পর্যন্তও বিস্তৃত দেখা যায়। ইহার উত্তর ও দক্ষিণাংশ অপ্রশস্ত তবে মধ্যাংশ সর্বাধিক প্রশস্ত। ত্রিবান্দ্রামের ১৪ কিলোমিটার দক্ষিণে কোবালাম ব্যতীত সমগ্র কেরালা রাজ্যের উপকূলেই একজাতীয় বিচিত্র গঠনের বালুকাস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় ভাষায় ইহার নাম টেরিস (Teris)। প্লায়োষ্টোসিন ও বর্তমান যুগের সৃষ্ট এই সকল বালিয়াড়ীর দ্বারা এই অঞ্চলে অনেক অগভীর উপ-হ্রদ হইয়াছে, ইহাদের স্থানীয় নাম কয়াল। কোজিকোদ জেলায় ল্যাটেরাইট যুক্ত পর্বত এবং আরও অভ্যন্তরে গ্রানাইট গঠিত পর্বতশৃঙ্গ দেখা যায়। উপকূল ভাগের বালিয়াড়ীর জন্য কোন সমুদ্রগামী জাহাজ বন্দরে আসিতে পারে না।

নদ-নদী ঃ পশ্চিম উপকূলের নদীগুলির নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ (১) নদীগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র, সংখ্যায় অগণিত এবং প্রখর বেগযুক্ত, (২) সহ্যাদ্রি পর্বতের পশ্চিমে ঢালের গভীর উপত্যকার মধ্য দিয়া প্রবাহিত, (৩) প্রায় নদীই পূর্ব-পশ্চিমে সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হইয়া আরব সাগরে পড়িয়াছে।

কোংকন উপকূলের নদী ঃ এই অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নদী হইল বৈতরণী, উলহাস ও অম্বা। প্রায় ১৩০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট উলহাস এই অঞ্চলের বৃহত্তম নদী। ভোরঘাট হইতে উৎপন্ন হইয়া ইহা সলসেট্ দ্বীপের (বেসেয়িন খাঁড়ি) উত্তরে সমুদ্রে পড়িয়াছে। বোম্বাইয়ের দক্ষিণে অপ্রশস্ত উপকূলভাগে সাবিত্রী ও বশিষ্ট নদী দুইটি প্রবাহিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খরস্রোতা নদী সহ্যাদ্রি পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া উপকূলভাগের বালুকাভূমিতে বাধা পাইয়া জলাভূমির সৃষ্টি করিয়াছে।

কর্ণাটক উপকূলের নদী ঃ আরও দক্ষিণে গোয়া ও উত্তর কর্ণাটক অঞ্চলের নিকটে আছে কালিন্দী, গঙ্গাবতী, ভদ্রী, সারাবতী প্রভৃতি নদী। দক্ষিণ কর্ণাটকের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নদীর নাম নেত্রবতী, ম্যাঙ্গালোর বন্দরের নিকটেই মোহনা। এই সকল নদীর মোহনার নিকট যানচলাচল সম্ভব।

মালাবার উপকূলের নদী ঃ এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য নদীগুলির মধ্যে পেরিয়ার ২৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ—কিন্তু অধিকাংশ নদীই ক্ষুদ্র—গড় দৈর্ঘ্য মাত্র ৬০ কিলোমিটার। শুধুমাত্র বেইপুর, ভরতপুঝা, পেরিয়ার ও পাম্বা নদীর দৈর্ঘ্য ১৬০ কিলোমিটারের বেশী।

জলবায়ু ঃ এই অঞ্চলে প্রায় সারা বৎসরই তাপমাত্রা অধিক। শীত ও গ্রীষ্মের দৈনিক তাপমাত্রার পার্থক্য ১০°—১৪° সে. মাত্র। এপ্রিল ও মে মাসে প্রখর গ্রীষ্ম, তখন বায়ুতে আর্দ্রতার আধিক্য থাকে। মধ্যাহ্ন বা সন্ধ্যায় সমুদ্র হইতে আগত মনোরম স্নিগ্ধ বায়ু এই সময়ের আবহাওয়ার বৈশিট্য। এই অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা গড়ে ৩২° সে. এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা গড়ে ২১° সে. পর্যন্ত হইয়া থাকে।

বৃষ্টিপাত ঃ গড়ে কোংকন উপকূলে বার্ষিক ২৮০ সে. মি. কর্ণাটক উপকূলে বার্ষিক ৩১০ সে. মি. এবং মালাবার উপকূলে বার্ষিক ২৪০ সে. মি. বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। জুন হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত কোংকন ও উত্তর কর্ণাটক উপকূলেই সর্বাধিক বৃষ্টি হয়। মৌসুমী বায়ু আগমনের সময়ে জুন জুলাই মাসে এবং প্রত্যাবর্তন করিবার সময়ে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে দ্বিতীয়বার বৃষ্টিপাত হয়।

মৃত্তিকা ঃ এই অঞ্চলের মৃত্তিকাগুলি পরস্পর কয়েকটি সমান্তরাল শ্রেণীতে

বিন্যস্ত। ইহাদের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ : **বালু-মৃত্তিকা :** সমুদ্র সন্নিকট অঞ্চল এই মৃত্তিকায় গঠিত, কর্ণাটক অঞ্চলের বালু-মৃত্তিকা পলিমিশ্রিত, মালাবার অঞ্চলে ইহা দালিয়াড়ীর সহিত দেখা যায়। উত্তর কোংকন উপকূলের এই মৃত্তিকা কিছুটা মোটা ধরনের। ইহা লবণাক্ত, স্বল্প জৈব শক্তিসম্পন্ন বলিয়া উর্বরা শক্তি কম। **পলিমৃত্তিকা :** কোংকন অঞ্চলে ইহা সর্বাধিক পরিমাণে দেখা যায় এবং উত্তর কর্ণাটক বা মালাবার উপকূলে ইহার পরিমাণ খুবই কম। দক্ষিণ কর্ণাটকে ইহা বালু ও রক্তবর্ণ মৃত্তিকার সহিত দেখা যায়। নদীজাত পলি ও নদী মোহনার কর্দম দিয়া গঠিত বলিয়া ইহা অতিশয় উর্বর। **ল্যাটেরাইট বা রক্তবর্ণ মৃত্তিকা :** পূর্বোক্ত মৃত্তিকা স্তরের পূর্বাংশে এই মৃত্তিকা স্তর দেখা যায়। ইহা নুড়ি ও বালুসমৃদ্ধ, ইহাতে কাদার পরিমাণ কম। চুণ ও জৈব পদার্থের স্বল্পতার জন্য ইহার উর্বরা-শক্তি খুবই সীমিত। **কৃষ্ণ মৃত্তিকা:** কোংকন উপকূল মূলতঃ এই মৃত্তিকায় গঠিত। ইহাতে নানাবিধ খনিজ পদার্থ থাকায় ইহার উর্বরাশক্তি খুবই বেশী। **পীট ও অরণ্য মৃত্তিকা :** মালাবার উপকূলে ও সহ্যাদ্রি পর্বতের কোন কোন অংশে যথাক্রমে পীট ও অরণ্য মৃত্তিকা দেখা যায়। পীট মৃত্তিকা পটাশ ও জৈব পদার্থ সম্পন্ন হইলেও অম্লরসের আধিক্যের জন্য ইহা কৃষিকাজের অনুপযোগী।

স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ: (১) লবণাক্ত বালুময় সমুদ্র উপকূলে নারিকেল, কাজু বাদাম প্রভৃতি। (২) মোহনা, খাঁড়ি ও জলাভূমি অঞ্চলে মানগ্রোভ ও ঘাস-আগাছা প্রভৃতি। (৩) নিম্নভূমি বা পার্বত্য ভূমির ল্যাটেরাইট গঠিত অঞ্চলে ঝোপঝাড়, বাঁশ প্রভৃতি এবং (৪) সহ্যাদ্রি পর্বতের উচ্চ ঢালে আর্দ্রপর্ণমোচী ও ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়। বর্তমানে অরণ্য অঞ্চলগুলি মুক্ত করিয়া কৃষি কাজের জন্য ব্যবহার করা হইতেছে।

৩. সাংস্কৃতিক পরিচয়

জনসংখ্যা : পশ্চিম উপকূলের ৬৪২৮৪ বর্গ কিলোমিটার পরিমিত এলাকায় ২৫ মিলিয়নের অধিক লোক বাস করে বলিয়া এখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৩৯৪ জন। তুলনামূলকভাবে মালাবার উপকূলে সর্বাধিক জনবসতি দেখা যায়। বোম্বাই, ম্যাঙ্গালোর, ত্রিবান্দ্রম প্রভৃতি শিল্প প্রধান নগরীকে কেন্দ্র করিয়া শহরাঞ্চলের অধিবাসীগণ বাস করে।

জনসংস্কৃতি: সমগ্র জনসংখ্যার মাত্র ৩৭ শতাংশ বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত আছে। তন্মধ্যে মালাবার উপকূলে গড়ে শতকরা ৩৪ জন, এবং কর্ণাটক উপকূলাঞ্চলে শতকরা ৪৫ জন কর্মজীবি। গ্রামাঞ্চলে কৃষি কাজই প্রধান জীবিকা, বৃহত্তম বোম্বাই শহরের বহু লোক নানা শিল্পে নিযুক্ত আছে। এই অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও পরিবহণ ইত্যাদিতেও বহু কর্মী নিযুক্ত আছে। গৃহ শিল্প ও কুটির শিল্প দ্বারা বেশ কিছু লোকের অন্নসংস্থান হয়। কোংকন উপকূলের মারাঠীগণ মারাঠী ভাষা ব্যবহার করে। কানাড়ী ভাষা কর্ণাটক উপকূলে মালয়ালাম ভাষা মালাবার উপকূলে প্রচলিত। এই অঞ্চলে প্রধানতঃ হিন্দু সম্প্রদায় বাস করিলেও কেরালা অঞ্চলের খ্রীস্টানরাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গ্রাম ও শহর: সমগ্র জনসংখ্যার ৬৮ শতাংশ উপকূলাঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে বাস করে। এই সকল গ্রাম ধান্য ক্ষেত্র কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। বৃহত্তম বোম্বাই অঞ্চলে গ্রামাঞ্চল নাই। আবার কর্ণাটক উপকূলে শহরাঞ্চল তেমন উল্লেখযোগ্য

নয়, শহরাঞ্চলের অধিবাসীরা বৃহত্তম বোম্বাই শহরেই অধিক পরিমাণে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কর্ণাটক উপকূলের ম্যাঙ্গালোর, মালাবার উপকূলে ত্রিবান্দ্রাম প্রভৃতি শহরের উপর সমগ্র উপকূলাঞ্চলের অর্থনীতি নির্ভর করিতেছে।

বোম্বাই ও বৃহত্তম বোম্বাই (৪১,৫২,০৫৬) ঃ কোংকন উপকূলের দ্বৈপ অঞ্চলরূপে খ্যাত এই শহরটি মহারাষ্ট্রের রাজধানী ও বৃহত্তর বোম্বাই শহরের বন্দর। ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা প্রকার শিল্পে এই অঞ্চলটি ভারতের মধ্যে সর্বাধিক সমৃদ্ধ অঞ্চল। এখানে বস্ত্রবয়ন, কারিগরী, পরিবহণ সংক্রান্ত নানাবিধ শিল্প কেন্দ্র আছে। **ম্যাঙ্গালোর** (১৪,২৬,৬৯) ঃ কর্ণাটক উপকূলের গুরপুর ও নেত্রবতী নদীর সংযোগস্থলে এই শিল্প ও বাণিজ্য শহরটি অবস্থিত। এই বাণিজ্য কেন্দ্রে খাদ্যশস্য, যন্ত্রপাতি, কারিগরী দ্রব্য ইত্যাদির পাইকারী ব্যবসা হয়। এখানে ৮৯টি শিক্ষা কেন্দ্র আছে। **ত্রিবান্দ্রম** (২৩৯৮১৫) ঃ মালাবার উপকূলের এই শহরটি কেরালা রাজ্যের রাজধানী। কিলিয়ার নদী শহরের মধ্যস্থল দিয়া প্রবাহিত। শহরের কেন্দ্রস্থলে কেরালা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি শহরের চালাইবাজার পালাইয়াম প্রভৃতি অঞ্চলে অবস্থিত। **গোয়া** ঃ কোংকন উপকূলের এই রাজ্যটি দীর্ঘদিন বিদেশী শাসনে থাকিবার পর স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পাঞ্জিম এই রাজ্যের রাজধানী। ধান্য, কাজু বাদাম, ম্যাঙ্গানীজ ও লৌহ এই রাজ্যের প্রধান উৎপাদন। ইহার প্রধান বন্দর মার্মাগাঁও। **রত্নাগিরি** (৩১০৯১) জেলার প্রধান শহর এবং মহারাষ্ট্রের কোলাপুর শিল্পনগরীর সহিত রেলপথে যুক্ত। মৎস্য ও লবণ উৎপাদন এবং উপকূলীয় বাণিজ্য কেন্দ্ররূপে খ্যাত। **কুইলন** ঃ মালাবার উপকূলে অবস্থিত জেলার প্রধান শহর ও বন্দর। এখানে জাহাজ, নৌকা নির্মাণ ও এ্যালুমিনিয়াম শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। **এর্ণাকুলম** ঃ মালাবার উপকূলে অবস্থিত এই জেলার প্রধান এবং কেরালার দ্বিতীয় বৃহৎ শহর। কোচিন বন্দর এই জেলায় অবস্থিত। **কোজিকোদে** ঃ জেলার প্রধান শহর, ইহার পূর্বনাম কালিকট। অরণ্যের জন্য ইহা প্রসিদ্ধ। এখানে প্রচুর পরিমাণে নারিকেল ও এ্যারেকানাট উৎপন্ন হয়। **পালঘাট** ঃ কেরালা রাজ্যের সমুদ্র-উপকূলের এই শহরের মধ্য দিয়া সহ্যাদ্রি পর্বতের পূর্বদিকে অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যে যাতায়াত করিতে পারা যায় বলিয়া ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নারিকেল ও এ্যারেকানাট ইহার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য।

৪. আর্থিক পরিচয়

কৃষিজ সম্পদ ঃ উপকূলাঞ্চলের সমগ্র জমির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কৃষি কাজ করা হয়। তুলনামূলকভাবে মালাবার উপকূলেই কৃষিজমির পরিমাণ বেশী। অনুর্বর ভূমিখণ্ডে পশুচারণ হইয়া থাকে। উপকূলের দক্ষিণাংশের কৃষিক্ষেত্রগুলিতে একই ভূমিতে দুইবার করিয়া চাষ করা হয়। এই অঞ্চলের কৃষিজ উৎপাদন নিম্নরূপঃ

ধান্য ঃ কোংকন ও মালাবার উপকূলের নিম্নভূমি অংশে এবং কর্ণাটক উপকূলের দোঁয়াশ মৃত্তিকায় ও ল্যাটেরাইট মৃত্তিকাযুক্ত অঞ্চলে ইহা উৎপন্ন হয়। **নারিকেল** ঃ উত্তর হইতে দক্ষিণে সর্বত্রই বালুকাযুক্ত অঞ্চলে ইহার চাষ হইলেও কান্নানোর ও কোজিকোদে অঞ্চলে ইহার উৎপাদন সর্বাধিক। **কাজুবাদাম** ঃ কোংকন উপকূলের ল্যাটেরাইট মৃত্তিকায় গোয়ার উচ্চভূমিতে কর্ণাটক উপকূলের অভ্যন্তর ভাগে প্রচুর কাজুবাদাম উৎপন্ন হয়। ইহা প্রধানতঃ রপ্তানী করিবার জন্য উৎপাদন করা হয়। **এ্যারেকানাট** ঃ কোংকন উপকূলের ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা অঞ্চলে এবং

মালাবার উপকূলের বিভিন্ন অংশে প্রধানতঃ বাণিজ্য-উদ্দেশ্যে ইহা উৎপাদন করা হয়। **ডাল** ঃ দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের জন্য উত্তরে কোলাবা, রত্নগিরি, কর্ণাটক উপকূলের ধান্য ক্ষেত্রগুলিতে মালাবার উপকূলের ত্রিচুর, কন্যাকুমারী প্রভৃতি অঞ্চলে নানাবিধ ডাল উৎপন্ন হয়। **ফল ও সব্জী** ঃ আঞ্চলিক চাহিদাপূরণের জন্য উপ-কূলের উত্তরের বোম্বাই, থানা, কোলাবা, পানভেল, মধ্যাংশের বসতি এলাকার নিকটে বিভিন্ন ধরনের ফল ও সব্জীর চাষ করা হয়। **ট্যাপিওকা**ঃ ইহার উৎপাদন প্রধানত মালাবার উপকূলের কোট্টিয়াম, আল্লেপ্পি কোজিকোদে, ত্রিচুর, কন্যাকুমারী অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। **বিবিধ** ঃ ইক্ষু, আদা, বাদাম প্রভৃতি মালাবার উপকূলের প্রধান পণ্য শস্য। মালাবার উপকূলের মধ্যাংশে তৈলবীজ, ভুট্টা, রাগী প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। উপকূলের নানা অঞ্চলে দারুচিনি, রবার, কফি, চা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য আবাদ ফসল জন্মিয়া থাকে।

সেচ-ব্যবস্থা ঃ পশ্চিম উপকূলের সেচ ব্যবস্থা খুবই অনুন্নত। কোংকন ও কর্ণাটক উপকূলে কূপের সাহায্যে এবং মালাবার উপকূলে খাল, জলাশয় ও নদীর সাহায্যে জলসেচ হয়। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে কোডিয়ারে প্রথম জলসেচ-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে পীচি ও চালাকুড়ি-এক নামে আরও দুইটি সেচ-প্রকল্প চালু হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাঝানি ও নেইয়ার-এক সেচ-প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। এবং ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে আরও ছয়টি সেচ-প্রকল্পের কাজ শেষ হয়।

বনজ সম্পদঃ বনজাত দ্রব্যে এই অঞ্চল বিশেষ সমৃদ্ধ নহে। কোংকন উপকূলের অরণ্যে শাল, সেগুন, আবলুস প্রভৃতি বৃক্ষ এবং মালাবার উপকূলের অরণ্যে চন্দন, আবলুস সেগুন প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। এই সকল বনজকে কেন্দ্র করিয়া এখানে দড়ি, সাবান প্রভৃতি শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

খনিজ সম্পদ ঃ খনিজ সম্পদ এই অঞ্চলে বিশেষ নাই। তবে গোয়ায় ম্যাঙ্গানীজ, ও লৌহ, বোম্বাইয়ে কোন কোন স্থানে কয়লা ও ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত চীনামাটি ও এ্যালুমিনিয়ামও স্বল্প পরিমাণে পাওয়া যায়।

শিল্পজ সম্পদ ঃ প্রধানতঃ তিনটি স্থানে শিল্পাঞ্চলগুলি কেন্দ্রীভূত হইয়াছে—(১) কোংকন উপকূলের বোম্বাই ও বৃহত্তর বোম্বাই অঞ্চল (২) কর্ণাটক উপকূলে ম্যাঙ্গালোর শহর ও বন্দর অঞ্চল (৩) মালাবার উপকূলে কেরালার নিম্নভূমি অঞ্চল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে বোম্বাই অঞ্চলে বৃহদায়তন শিল্প ও কেরালা অঞ্চলে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রসারলাভ করিয়াছে। সমগ্র পশ্চিম উপকূলাঞ্চলের শিল্পোৎপাদন নিম্নরূপ ঃ

কৃষিজ-ভিত্তিক ঃ বোম্বাই শিল্পাঞ্চলে কার্পাস ও রেশম বয়ন কেন্দ্র, পশম শিল্প, ম্যাঙ্গালোর শিল্পাঞ্চলে বস্ত্রবয়ন, তৈলকল, তামাক প্রভৃতি শিল্প এবং ধান কল, কফি ও কাজুবাদাম শিল্প, কেরালার শিল্পাঞ্চলে ১৮৫টি কাজুবাদাম সংক্রান্ত শিল্প, চা ও কফি শোধন কেন্দ্র, মৎস্য শিকার ও সংরক্ষণ শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **বনজভিত্তিক** ঃ বোম্বাই অঞ্চলের রবার শিল্প, কেরালা অঞ্চলের করাতকল, প্লাইউড নির্মাণ, কাগজ শিল্প, আসবাবপত্রের উপযোগী কাষ্ঠ উৎপাদন, রবার প্রভৃতি শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। **খনিজভিত্তিক** ঃ বোম্বাই অঞ্চলে কৃষি ও বয়ন যন্ত্রপাতি, ইস্পাত-আসবাবপত্র, সার, ম্যাঙ্গালোর অঞ্চলের মৃৎশিল্প (টালি), নানাবিধ ধাতুদ্রব্য-নির্মাণ প্রভৃতি শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেরালার শিল্পাঞ্চলে এর্ণাকুলাম ও কুইলনে এ্যালুমিনিয়াম শিল্প, কোট্টিয়াম ও কুইলনে সিমেণ্ট এবং অন্যত্র মৃৎশিল্প, চীনা-

মাটির বাসনপত্র নির্মাণের কারখানা আছে। **কারিগরী শিল্পঃ** বোম্বাই অঞ্চলে বিদ্যুৎ ও তাপ উৎপাদন, রসায়ন, বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন, ট্রানজিস্টার, বৈদ্যুতিক তার, রং, বার্ণিশ, কষ্টিক সোডা ও সোডা গ্যাস প্রস্তুত, ম্যাঙ্গালোর অঞ্চলে মোটর নির্মাণ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, পরিবহণ সংক্রান্ত শিল্প, রসায়ন, মালাবার উপকূলে বয়ন শিল্প বিদ্যুৎ ও তাপ উৎপাদন, সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে লবণ উৎপাদন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **বিবিধঃ** এতদ্ব্যতীত বোম্বাইয়ের চর্ম সংক্রান্ত শিল্প, উত্তরে কর্ণাটক উপকূলে নৌকা নির্মাণ, কেরালার দাঁড় শিল্প এবং উপকূলের বিভিন্ন অংশে মৎস্য-শিকার-সংরক্ষণ শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ শহরাঞ্চল ব্যতীত অন্যত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই অনুন্নত। যাতায়াতের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা থাকিলেও অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে তাহা যথেষ্ট নয়। বোম্বাই হইতে রেলপথ তিনদিকে প্রসারিত হইয়া পশ্চিম ভারতের বৃহৎ শহরগুলিকে যুক্ত করিয়াছে। এই অঞ্চলে রেলপথের বৈদ্যুতিককরণ ও শহরতলী অঞ্চলে ইহার প্রসার হইলেও তুলনামূলকভাবে কেরালা অঞ্চলেই রেলপথের সর্বাধিক বিস্তার হইয়াছে। সমগ্র অঞ্চলটি পশ্চিম, দক্ষিণ ও মধ্য রেলপথের অন্তর্গত উপকূলাঞ্চলের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়ক দ্বারা বম্বে, রত্নগিরি, গোয়া, ম্যাঙ্গালোর, ত্রিবান্দ্রম, এর্ণাকুলাম প্রভৃতি শহরগুলি যুক্ত হইয়াছে। এই সড়কপথগুলি উপকূলের সমান্তরালে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। মালাবার উপকূলের ৫৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি খাল এবং অন্যান্য ৬২০টি ক্ষুদ্র খাল দ্বারা মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলের বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিতে যাতায়াত করা হয়। বোম্বাইয়ের সান্তাক্রুজ বিমানবন্দর ভারতের প্রধান তিনটি বিমানবন্দরের অন্যতম। কোচিন, ত্রিবান্দ্রম ও ম্যাঙ্গালোরেও বিমানপথের সুবিধা আছে। এই সকল শহর বোম্বাই ও তামিলনাড়ুর সহিত বিমানপথে যুক্ত।

বন্দর ও পোতাশ্রয়ঃ পশ্চিম উপকূল দীর্ঘ ও ভগ্ন হওয়ায় এখানে বন্দর ও প্রাকৃতিক পোতাশ্রয় গড়িয়া উঠিয়াছে। **বোম্বাই ঃ** ভারতের সর্বপ্রথম স্বাভাবিক পোতাশ্রয় ও বন্দর। ট্রম্বেতে পেট্রোকেমিক্যাল শোধনাগার স্থাপিত হওয়ার পর হইতে ইহার উন্নতি হইতেছে। তুলা ও তুলাবস্ত্র, ময়দা, বাদাম, শন, চিনি প্রভৃতি রপ্তানী এবং লৌহ ও ইস্পাত, কেরোসিন, মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশ, চীনামাটি, কয়লা প্রভৃতি আমদানী করে। গুজরাট, মহারাষ্ট্র পাঞ্জাব ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি। ইহা ব্যতীত কোংকন উপকূলে রত্নগিরি, আলীবাগ, শ্রীবর্ধন বিজয়দুর্গ প্রভৃতি ৪৮টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্দর আছে। **ম্যাঙ্গালোর ঃ** ভারতের ৭৫ শতাংশ কফি ৫০ শতাংশ টালি এবং গোলমরিচ, চা, কাজুবাদাম এই বন্দর দিয়া বিদেশে রপ্তানী হয় এবং আমদানীকৃত দ্রব্যের মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্যই প্রধান। পশ্চাদ্‌ভূমি অনুন্নত হওয়ায় এই বন্দরটি তেমন উন্নতি করিতে পারিতেছে না। **কোচিন ঃ** মালাবার উপকূলে অবস্থিত ভারতের বৃহত্তম বন্দর। এই বন্দর হইতে নারিকেল, ছোবড়া, গোলমরিচ, আদা, দারুচিনি, ট্যাপিওকা, কাজুবাদাম প্রভৃতি রপ্তানী হয় এবং পেট্রোলিয়াম, যন্ত্রপাতি, সার, খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে আমদানী করা হয়। সমগ্র কেরালা ও তামিলনাড়ুর পশ্চিমাংশ এই বন্দরের পশ্চাদভূমি। কোজিকোদে, আল্লেপ্পি, ত্রিবান্দ্রাম প্রভৃতি এই অঞ্চলের অন্যান্য বন্দর।

৯
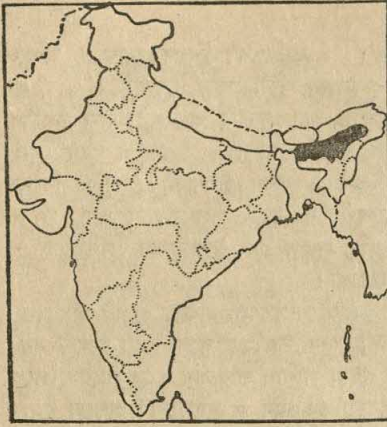
।। ব্রহ্মপুত্র নদী-উপত্যকা ।।

১। সাধারণ পরিচয়

ভূমিকা ঃ ভৌগোলিক দিক হইতে ইহা উত্তরভারতের বৃহৎ সমভূমির একটি পূর্ব-প্রসারিত শাখা হইলেও, প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্যই ব্রহ্মপুত্র নদী-উপত্যকাকে একটি পৃথক ভৌগোলিক অঞ্চল বলা চলে। মূলতঃ ব্রহ্মপুত্র নদীর উত্তর ও দক্ষিণ তট লইয়া গঠিত এই অঞ্চলটির চতুর্দিকেই পূর্ব-হিমালয়ের অংশ ও হিমালয়ের দক্ষিণ-মুখী শাখার দ্বারা সীমাবদ্ধ বলিয়া ইহার বৈশিষ্ট্যও উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় উপ-ত্যকা অঞ্চল হইতে কিছুটা পৃথক।

অবস্থান ও আয়তন ঃ বর্তমান আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা অঞ্চল ২৫°৪৪′ উত্তর হইতে ২৭°৫৫′ উত্তর পর্যন্ত এবং ৮৯°৪১′ পূর্ব হইতে ৯৬°২′ পূর্ব পর্যন্ত অবস্থিত। পূর্ব পশ্চিমে এই নদী-উপত্যকার সর্বাধিক দৈর্ঘ্য প্রায় ৭২০ কিলোমিটার এবং উত্তর-দক্ষিণে ইহার সর্বাধিক বিস্তৃতি প্রায় ৮০ কিলোমিটার। সুতরাং সাধারণভাবে এই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার আয়তন প্রায় ৫৬২৭৪ বর্গ কিলোমিটার।

সীমাঃ এই ভৌগোলিক অঞ্চলটির প্রাকৃতিক সীমা নিম্নরূপঃ সমগ্র উত্তরে ও উত্তর-পূর্বে পূর্ব-হিমালয়ের অংশবিশেষ এবং দক্ষিণে গারো, খাসি, জয়ন্তিয়া, মিকির প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চল। পশ্চিমে গাঙ্গেয় সমভূমির হিমালয়-পাদদেশ অঞ্চল এবং পূর্বে হিমালয়ের দক্ষিণমুখী শাখা (নাগাপাহাড়, তুয়েনসাং পাহাড় প্রভৃতি) দ্বারা পরিবেষ্টিত। রাজনৈতিক দিক হইতে এই অঞ্চলটি উত্তরে ও উত্তর-পূর্বে নেফা (অরুণাচল), পূর্বে নাগাল্যান্ড, দক্ষিণে নবগঠিত মেঘালয় ও সংযুক্ত মিকির ও কাছাড় জেলা এবং পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ (জলপাইগুড়ি ও কুচ-বিহার) দ্বারা সীমাবদ্ধ।

বর্তমান পরিস্থিতি ঃ ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে উত্তরপূর্ব ভারতের এই অঞ্চল অত্যন্ত অনুন্নত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের কালে এই অঞ্চলে যাতায়াত-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে এবং স্থানীয় উপকরণ লইয়া শিল্পকেন্দ্র স্থাপিত হয়। স্বল্প জনসংখ্যা যুক্ত এই অঞ্চলে এখন ক্রমেই ভারতের বিভিন্ন অংশ হইতে, যথা ঃ পূর্ব

পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) হইতে চাষী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়; উড়িষ্যা, বিহার ও উত্তর প্রদেশ হইতে চা-বাগানের,; খনির ও দিনমজুরীর শ্রমিক সম্প্রদায় এখানে আসিয়া বসতি স্থাপন করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে এই অঞ্চলের অর্থ-নৈতিক সম্ভাবনা সকলের দৃষ্টিগোচর হইলে পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, রাজস্থান, উত্তর-প্রদেশ হইতে ব্যবসায়ী শ্রেণী এখানে ব্যবসা ও শিল্প স্থাপন করিতে আসে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে এই অঞ্চলে তৈলখনি আবিষ্কৃত হওয়ায় সমগ্র উপত্যকা অঞ্চলের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক দারুণ পরিবর্তন দেখা দেয়। তদবধি ইহা ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

অঞ্চল পরিচয়ঃ সমগ্র আসাম রাজ্যে বিভিন্ন ধরনের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য বর্তমান বলিয়া কেবলমাত্র নিম্নলিখিত জেলা লইয়া ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা অঞ্চল গঠিত হইয়াছেঃ (১) লখিমপুর (২) শিবসাগর, (৩) দারাং, (৪) নওগাঁ, (৫) কামরূপ (৬) গোয়ালপাড়া। ব্রহ্মপুত্র নদী গোয়ালপাড়া, কামরূপ, শিবসাগর ও লখিমপুর জেলার মধ্যাংশ এবং নওগাঁ জেলার উত্তর সীমান্ত দিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

২. প্রাকৃতিক পরিচয়

ভূপ্রকৃতিঃ উপত্যকার উত্তরাংশ খাড়া ঢাল ও দক্ষিণাংশ স্বল্প ঢাল যুক্ত। উপত্যকার পূর্বাংশ অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত, কিন্তু মধ্যবর্তী অংশে মিকির পর্বতের গ্রানাইট গঠিত অঞ্চলে ইহার উপত্যকা কিঞ্চিৎ সংকীর্ণ হইয়াছে। দক্ষিণে শিলং মালভূমির নিকট নদী উপত্যকা ক্রমেই সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই সমভূমির উচ্চতা পূর্বে ১৩০ মিটার এবং পশ্চিমে ৩০ মিটার মাত্র। চতুর্দিকের ১৫০ মিটার উচ্চ সমোন্নতি রেখা দ্বারা এই নদী উপত্যকাটিকে চিহ্নিত করা যায়।

বিচ্ছিন্ন পর্বতঃ নদীর দুই তটে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন পাহাড় (Hillock) দেখিতে পাওয়া যায়। তেজপুর মিকির হইতে পশ্চিমে ধুবড়ী পর্যন্ত স্থানে ইহারা অবস্থিত। নদীপ্রবাহ দ্বারা এই সকল পাহাড় দক্ষিণের মেঘালয় উপত্যকা হইতে পৃথক হইয়া রহিয়াছে।

ব্রহ্মপুত্র সমভূমি (উত্তর)ঃ ব্রহ্মপুত্র নদীর উত্তর ও দক্ষিণাংশের মধ্যে যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য রহিয়াছে। উত্তরের সমভূমিতে ভুটান-হিমালয় ও নেফা (অরুণাচল) হইতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী পর্বতগাত্র বাহিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। তাহাদের বাহিত পলিদ্বারা নদীমুখে পলিভূমি গঠিত হইয়া নদীর গতিপথ ব্যহত করিতেছে। ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইবার পূর্বে এই সকল নদী অসংখ্য অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ সৃষ্টি করিয়া বিস্তীর্ণ জলাভূমির গঠন করিয়াছে। ফলে এই অঞ্চলে আর্দ্র ভূমি ও অরণ্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

ব্রহ্মপুত্র সমভূমি (দক্ষিণ)ঃ এই উপত্যকা অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত এবং ইহার শাখানদীগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। ধনসিরি ও কপিলী নদী উপত্যকার পার্শ্বক্ষয়ের ফলে মিকির পার্বত্য অঞ্চল মেঘালয় উপত্যকা হইতে পৃথক হইয়া রহিয়াছে। এই সমভূমির পশ্চিমাংশ আরও অপ্রশস্ত এবং সংকীর্ণ শাখা নদীগুলি বাঁক সৃষ্টি করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। তবে পূর্বাংশে জলাভূমি ও অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ দেখা যায়।

বালুচর ও দ্বীপঃ গতি প্রবাহ তীব্র নয় বলিয়া এই নদীর গতিপথে অসংখ্য নদী-দ্বীপ ও বালুচরের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল নদী-দ্বীপের মধ্যে উচ্চ

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মাজুলি (আয়তনঃ ৯২৭ বর্গকিলোমিটার) দ্বীপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নদ-নদীঃ তিব্বতের কৈলাস পর্বতমালা (৫১৫০ মিটার) হইতে সৃষ্ট সাংপো নামে পরিচিত ব্রহ্মপুত্র নদীই এই উপত্যকা অঞ্চল গঠন করিয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম অভিমুখে প্রবাহিত হইয়া নেফা (অরুণাচল) অঞ্চলে প্রবেশ করিবার পর ইহা ডিহাং নামে পরিচিত হইয়াছে। অতঃপর সাদিয়ার নিকটে উত্তর হইতে ডিবাং এবং পূর্ব হইতে লোহিত নদী মিলিত হইয়া তিনটি ধারার সমন্বয়ে ব্রহ্মপুত্র গঠিত হইয়াছে। বালুময় নদীগর্ভের মধ্যে অসংখ্য শাখা-প্রশাখা সৃষ্টি করিয়া ইহা প্রবাহিত হইয়াছে।

নিম্নগতি ঃ ধুবড়ীর দক্ষিণ দিকে ইহা গারো পাহাড়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত বাংলা-দেশের সমভূমিতে গঙ্গার শাখানদী পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। উত্তরে আসামের ব্রহ্মপুত্র নদী এবং দক্ষিণে শ্রীহট্টের (বাংলাদেশ) সুরমা নদীর জলবিভাজিকা রূপে গারো পাহাড় দাঁড়াইয়া আছে। অতঃপর এই সম্মিলিত স্রোত দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে।

অন্যান্য নদীঃ প্রায় ৩৫টি নদী ব্রহ্মপুত্র নদীর সহিত যুক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে উত্তর তটের সুবর্ণসিরি, ধর্নসিরি, বড়নদী, পাগলাদিয়া, মানস, সংকোষ প্রভৃতি এবং দক্ষিণ তটে লোহিত, ডিহাং, কপিলী, নোয়া-ডিহিং প্রভৃতি নদী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বন্যাঃ প্রবল বর্ষার সময়ে উত্তরতটের নদীগুলি হিমালয়ের তুষার গলা জল ও বর্ষার জলের সম্মিলিত ধারা এবং দক্ষিণ তটের বর্ষার জলপুষ্ট নদীর ধারা ব্রহ্মপুত্র নদীর দিকে ধাবিত হয়। এই সকল নদীর স্রোতের সঙ্গে নদীবাহিত দ্রব্য ক্ষয়ীভূত ভূমি প্রভৃতি আসিতে থাকে এবং সেগুলি নদীগর্ভে অবক্ষেপণের ফলে নদী প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং তখন বন্যার সৃষ্টি হয়।

জলবায়ুঃ যদিও এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের মধ্যে একটি সমজাতীয়তা দেখা যায়। তথাপি ইহাদের বৈশিষ্ট্যগুলির আঞ্চলিক পার্থক্য সহজেই লক্ষণীয়। নদী উপত্যকার পূর্বাংশে প্রচুর বৃষ্টিপাত ও অল্প উত্তাপ এবং পশ্চিমাংশে অল্প বৃষ্টিপাত ও প্রচুর উত্তাপ। কিন্তু মধ্যবর্তী অংশে মিকির পর্বত থাকায় বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলরূপে একটি মিশ্র-জলবায়ু এলাকায় পরিণত হইয়াছে।

তাপমাত্রাঃ শীতকালের তাপমাত্রা ১৩° সে.-এর উপরে থাকে। কুয়াশা সৃষ্টি হয়, তবে জানুয়ারীই শীতলতম মাস। গ্রীষ্মকালের (মার্চ—মে) মাসগুলিতে গড় উত্তাপ থাকে ২৩° সে.। পশ্চিমবঙ্গের ন্যায় এখানেও কালবৈশাখীর ঝড় দেখা যায়। তবে বর্ষার (জুন—সেপ্টেম্বর) সময়ে উত্তাপ আরও বাড়িয়া (গড়ে ২৭° সে.) যায় এবং আগস্ট মাসে এই অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপ দেখা যায়। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে মৌসুমী বায়ু প্রত্যাবর্তনের সময়ে উত্তাপ ক্রমেই কমিতে থাকে। এই সময়ে আবহাওয়া পরিষ্কার থাকে ও উত্তরা বায়ু বহিতে থাকে।

বৃষ্টিপাতঃ সমগ্র শীতকালে (ডিসেম্বর—ফেব্রুয়ারী) বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাত্র ১১ সে. মি., তবে গ্রীষ্মের (মার্চ-মে) আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পরিমাণ বাড়িতে (গড়ে ১৭ সে. মি.) থাকে। ব্রহ্মপুত্র উপতাকায় ভারতের সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। বর্ষাকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এখানে প্রতি মাসে ১৮-২০ দিন বৃষ্টি হয়। ইহার পরবর্তী সময়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমিয়া (১৫ সে. মি.) যায়।

মৃত্তিকা ঃ সমগ্র নদী-উপত্যকা নদীবাহিত নূতন ও পুরাতন পলি দ্বারা গঠিত হইলেও এখানে আরও নানাবিধ মৃত্তিকা দেখা যায়। যথাঃ (১) **পলি মৃত্তিকাঃ** নদীর উভয় তটই নবযুগের পলি দ্বারা গঠিত। উভয় তটের কামরূপ, গোয়ালপাড়া জেলার মধ্যভাগে এবং দক্ষিণ তটে গোয়ালপাড়া জেলার দক্ষিণাংশ নওগাঁ, শিবসাগর ও লখিমপুর জেলার মধ্য অংশ আদিযুগের পলি দ্বারা গঠিত। নব পলি অঞ্চল কৃষিকাজের পক্ষে খুবই অনুকূল এবং আদি পলি অঞ্চল চা-চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। (২) **ল্যাটেরাইট ঃ** কেবলমাত্র নওগাঁ জেলার দক্ষিণতম অংশে এই মৃত্তিকা দেখা যায়। কৃষিকাজের পক্ষে এই মৃত্তিকা বিশেষ সুবিধাজনক নহে। (৩) **পর্বত-পাদদেশের মৃত্তিকাঃ** নেফার (অরুণাচল) দক্ষিণে অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত সমগ্র উত্তর প্রান্তে এই মৃত্তিকা দেখা যায়। মৃত্তিকা আর্দ্র বলিয়া এই অঞ্চলে অরণ্য সৃষ্টি হইয়াছে। (৪) **পার্বত্য মৃত্তিকাঃ** আদিপলি গঠিত অঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্বাংশে অর্থাৎ শিবসাগর ও লখিমপুর জেলার দক্ষিণ-পূর্বাংশ এই মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত।

স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জঃ মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের বৃষ্টির ফলে এই উপত্যকায় গভীর অরণ্য সৃষ্টি হইয়াছে। এই উপত্যকার সর্বত্রই নানা জাতীয় সংরক্ষিত বনভূমি দেখা যায়। এই সকল অরণ্য অঞ্চল নানাবিধ মূল্যবান বৃক্ষে সমৃদ্ধ। ইহাদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইলঃ (১) **ক্রান্তীয় চিরহরিৎ অরণ্যঃ** লখিমপুর ও শিবসাগর জেলার এই অরণ্যে হোলিং, নাবর, মেকাই, অগরু (অগরুসেণ্ট) প্রভৃতি চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়। গোয়ালপাড়া ও দারাং জেলার অরণ্যে বনসুম ও আমারী নামক মূল্যবান বৃক্ষ জন্মে। (২) **স্যাভানা প্রকৃতির অরণ্যঃ** উচ্চভূমির প্রান্তাঞ্চলে এবং নিম্নভূমির নদীতটবর্তী অঞ্চলে এই অরণ্য দেখা যায়। কাশ, কুল প্রভৃতি এই অরণ্যে জন্মে। (৩) **নদীতটের অরণ্যঃ** পশ্চিমে সংকোষ নদী হইতে গোয়ালপাড়া ও কামরূপের মধ্য দিয়া দারাং জেলার পূর্ব-সীমান্তে ভূটানের পাদদেশ পর্যন্ত ভূখণ্ডে এই জাতীয় অরণ্য দেখা যায়। এখানে খয়ের, শিমুল, কদম প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। (৪) **বিবিধঃ** নওগাঁ জেলার পশ্চিমাংশ, কামরূপ ও গোয়ালপাড়া জেলার বৃহৎ অংশে শাল বৃক্ষের অরণ্য, উপত্যকার সর্বত্র বিশেষতঃ দারাং জেলার চিরহরিৎ অরণ্যে বেত, নিম্ন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় মিশ্র পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য (শিমুল, সিধু, শাল, মার্কাড় ও ডাল প্রভৃতি) দেখা যায়।

৩. সাংস্কৃতিক পরিচয়

জনসংখ্যাঃ এই অঞ্চল ৯১,৭৯,১২৭ লোক বাস করে। আয়তন ৫৬২৭৪ বর্গ কিলোমিটার হওয়ায় এখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১৬২ জন লোক বাস করে। এই অঞ্চলের জনসংখ্যা ভীতিজনকভাবে বাড়িতেছে। ইহার কারণস্বরূপ বলা যায় পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) উদ্বাস্তু আগমন, নেপালীদের আগমন এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চল হইতে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে ক্রমেই লোক আসিতেছে বলিয়া জনসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে।

জনসংস্কৃতিঃ জনবহুল পশ্চিমবঙ্গের নিকটবর্তীতা, প্রাচীন বসতি কেন্দ্র এবং কৃষিযোগ্য জমির সহজ প্রাপ্যতার জন্যই নিম্ন উপত্যকায় জনসংখ্যার চাপ খুব বেশী। নওগাঁ অঞ্চলে বিস্তৃত সমভূমির জন্য সেখানে অধিক লোক বাস করে, কিন্তু উত্তরতটের জনপদগুলি উত্তরের পার্বত্য নদীগুলির বন্যার জন্য স্বল্প সংখ্যাযুক্ত।

সমগ্র জনসংখ্যার ৪৩ শতাংশ নানাবিধ কর্মে নিযুক্ত আছে। প্রায় ৭৫ শতাংশ কৃষিকাজ দ্বারা, ২০ শতাংশ চাকুরি, গঠনমূলক কাজ, বন সংক্রান্ত ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত। অবশিষ্ট কর্মী ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি দ্বারা জীবিকা অর্জন করে। সাধারণভাবে সমগ্র জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ শিক্ষিত। এখানকার অধিবাসীরা মূলতঃ হিন্দু হইলেও সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় ২৫ শতাংশ হইল মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়।

গ্রাম ও শহরঃ সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় ৯৩ শতাংশ এই উপত্যকা অঞ্চলের ১৬৩০৭ ক্ষুদ্র বৃহৎ গ্রামে বাস করে। দক্ষিণাংশের গ্রামগুলিতে অধিক সংখ্যক লোক কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। অবশিষ্ট অধিবাসী এই অঞ্চলের ৪৬টি ক্ষুদ্রবৃহৎ শহরে থাকে। এই সকল শহরের গুরুত্ব নিম্নরূপঃ (১) রেলপথের উন্নতির জন্য যোগীঘোপা, রঙিয়া, চাপারমুখ, শিমালুগড়ি প্রভৃতি শহরের উন্নতি হইয়াছে। (২) খনিজ সম্পদের জন্য ডিগবয়, ধুলিয়াজান, কামরূপ, মোরান প্রভৃতি শহর গড়িয়া উঠিয়াছে। (৩) চা শিল্পের জন্য বাঙগাপাড়া প্রভৃতি অঞ্চল শহর হইয়াছে। (৪)

(৪) প্রশাসনিক ও ব্যবসা কেন্দ্ররূপে জোড়হাট, তিনসুকিয়া, নওগাঁ, তেজপুর, ধুবড়ী প্রভৃতি শহর বৃদ্ধি পাইয়াছে। (৫) রেলওয়ে-শহররূপে লামডিং, মারিয়ানি বঙ্গাইগাঁও প্রভৃতি অঞ্চল সমৃদ্ধ হইয়াছে।

গৌহাটি (১০০৭০৭) ঃ ব্রহ্মপুত্র নদী উপত্যকার সর্বপ্রধান নগর, দক্ষিণ কামরূপে অবস্থিত। চা, কাঠ, এন্ডি প্রভৃতির বাণিজ্য কেন্দ্র। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় এই শহরে অবস্থিত। ইহার অদূরে কামাখ্যাদেবীর মন্দির হিন্দুদের তীর্থস্থান। ইহার নিকট পান্ডু উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলপথের কেন্দ্র। (২) **ডিব্রুগড়** (৫৮৪৮০) ঃ লখিমপুর জেলায় অবস্থিত। ইহা একটি বাণিজ্য শহর। সমগ্র উপত্যকার চা, কাঠ ডিগবয়ের খনিজ তৈল প্রভৃতি এই নদী বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানী করা হয়। (৩) **ডিগবয়** ঃ লখিমপুর জেলায় নেফা সীমান্তে অবস্থিত খনিজ শহর। ভারতের সর্বাধিক খনিজ তৈল এই খনি হইতে পাওয়া যায়। এখানে একটি তৈল শোধনের কেন্দ্রও আছে। ইহার নিকটবর্তী মার্ঘেরিটা তৈলের জন্য প্রসিদ্ধ। এই তৈল ডিগবয় নদী বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানী হয়।

৪। আর্থিক পরিচয়

কৃষিজ সম্পদঃ কৃষিজ পণ্য এই অঞ্চলের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সম্পদ। ইহা শুধু যে অধিবাসীর খাদ্য সংস্থান করে তাহা নয়। কোন কোন

শিল্পের (চা ও পাট) পক্ষে এই অঞ্চল ভারতের অন্যান্য অঞ্চলকে সাহায্য করিয়া থাকে। সমগ্র কর্ষিত জমির প্রায় তিন-চতুর্থাংশ পরিমিত এলাকায় খাদ্যশস্য এবং অবশিষ্ট অংশে পণ্যশস্য ও বিবিধ দ্রব্য উৎপাদন হয়।

ধান্য ঃ সমগ্র কর্ষিত জমির দুই-তৃতীয়াংশে ধান্য চাষ হয়। ইহা এই অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য। ইহা বিভিন্ন অঞ্চলে অত্যন্ত অসমপরিমাণে উৎপন্ন হয়। **চা** ঃ অধিকাংশ চা-বাগান লখিমপুর, শিবসাগর ও দারাং জেলায় অবস্থিত। তবে অন্যান্য অঞ্চলেও অল্প পরিমাণে হইয়া থাকে। ভারতের ৭৬০০ চা-বাগানের মধ্যে ৭০০টিই এই অঞ্চলে অবস্থিত। লখিমপুর জেলায় বৃহৎ চা-বাগান এবং শিবসাগর জেলায় ক্ষুদ্রায়তন চা-বাগানগুলি অবস্থিত। **পাট** ঃ চায়ের পরই আঞ্চলিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে পাটের স্থান। নিম্ন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এবং উত্তরতটের দারাং জেলায় সর্বাধিক পরিমাণে পাট চাষ হইয়া থাকে। **তৈলবীজ** ঃ সরিষা ও অন্যান্য তৈলবীজ এখানে চাষ করা হয়। গোয়ালপাড়া, কামরূপ, নওগাঁ, দারাং প্রভৃতি অঞ্চলে ইহা সর্বাধিক পরিমাণে এবং অন্যত্র অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়। **বিবিধ** ঃ আভ্যন্তরীণ চাহিদা-পূরণের জন্য নিম্ন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার নানাস্থানে ডাল চাষ করা হয়। পণ্যশস্য হিসাবে এই অঞ্চলে আখ অতি গুরুত্বপূর্ণ। ইহা সর্বত্র উৎপন্ন হইলেও শিবসাগর ও কামরূপ অঞ্চলে সর্বাধিক জন্মে। তামাকের জন্য খুব বেশী ব্যয়িত না হইলেও একর প্রতি উৎপাদন বেশী—ইহা মূলতঃ নিম্ন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় চাষ করা হয়।

সেচ ব্যবস্থা ঃ সমগ্র কর্ষিত জমির মাত্র ২২ শতাংশে সেচ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। কামরূপ ও গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রধানতঃ জলাশয় এবং লখিমপুর ও গোয়ালপাড়ার অপর অংশে খাল দ্বারা জলসেচ হইয়া থাকে। শিবসাগর জেলায় জলসেচ ব্যবস্থা নাই, তবে অন্যান্য অঞ্চলে খাল অথবা পাম্পের সাহায্যে জলসেচ হয়। প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া জল সেচনের কোন প্রয়োজন হয় না।

সরকারী প্রকল্প ঃ শীতকালে রবিশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার সেচ ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিয়াছেন। নওগাঁ জেলায় জল সেচের দ্বারা উৎকৃষ্ট গম উৎপাদন হইতেছে। ফেব্রুয়ারী ও মার্চের শুষ্ক সময়ে সমগ্র চা-বাগান এলাকায় পাম্প ও ছোট খালের সাহায্যে জলসেচ দ্বারা ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে। বর্তমানে এখানে দুইটি সেচ প্রকল্প চালু হইয়াছে ঃ (১) **যমুনা সেচ প্রকল্প** ঃ যমুনা নদীর বাঁকালিয়াঘাট অঞ্চলে বাঁধ দিয়া নওগাঁ জেলার ৬৪০০০ একর জমিতে সেচ হইতেছে। (২) **মোবা-ধনসিরি প্রকল্প** ঃ শিবসাগর জেলায় অবস্থিত এই প্রকল্পটি ৯০০০ একর পরিমিত এলাকায় জলসেচনের ক্ষমতা সম্পন্ন।

পশুজ-সম্পদ ঃ (১) **গৃহপালিত** ঃ পশুপালন এই অঞ্চলের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। গরু, মহিষ, ছাগল এখানে প্রতিপালিত হইয়া থাকে। সম্প্রতি পোলট্রির প্রচলন হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও পশু খাদ্য সংকট, স্বল্প উৎপাদন, পরিচর্যার অভাব ইত্যাদি নানা কারণে এই শিল্প তেমন উন্নতি করিতে পারিতেছে না। (২) **অরণ্য পালিত** ঃ বিশাল অরণ্য অঞ্চলে যে সকল পশু প্রতিপালিত হয়, তাহাও এই অঞ্চলের একটি আর্থিক সম্পদ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। স্তন্যপায়ী জীবদের মধ্যে হাতী, গণ্ডার, বাইসন, হরিণ প্রভৃতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এক শৃঙ্গী গণ্ডার বিক্রয় করিয়া প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হয়। বনজ-দ্রব্যাদি পরিবহণের জন্য হস্তীর দান অসামান্য। ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব অংশে কাজিরাঙ্গা এবং পশ্চিম অংশে মানস নামক দুইটি অরণ্যে শিকারের সুবিধা আছে।

বনজ-সম্পদ ঃ উপত্যকার অরণ্য অঞ্চলে বিশেষতঃ পূর্বাংশে চায়ের পেটি নির্মাণ ও প্লাইউড নির্মাণের উপযোগী কাঠ পাওয়া যায়। গঠনমূলক কাজের জন্য লোহা কাঠ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমাংশের ক্রান্তীয় আর্দ্রপর্ণমোচী অরণ্য বিখ্যাত শাল ও সেগুন বৃক্ষে সমৃদ্ধ। অধিকাংশ অরণ্য সম্পদই এখনও অব্যবহৃত রহিয়াছে।

খনিজ সম্পদ ঃ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা কেবলমাত্র তৈল সম্পদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র অঞ্চলের অর্থনীতি এই তৈল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে এই তৈল সরবরাহ করা হয়। বিচিত্র ভূতাত্ত্বিক সংগঠনের জন্যই এখানকার ভূগর্ভে প্রচুর পরিমাণে তৈল সঞ্চিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লাও এখানে কিছু পরিমাণে পাওয়া যায়।

তৈল ও গ্যাস ঃ উচ্চ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ভারতের প্রায় ৫০% তৈল সংরক্ষিত আছে। ডিগবয়, নাহারকাটিয়া, মোরান, রুদ্রসাগর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রায় অধিকাংশ তৈল উৎপাদন করা হয়। তৈলকূপ ব্যতীত, কোন কোন কূপ হইতে গ্যাসও উৎপন্ন হয়। নাহারকাটিয়া ও মোরান অঞ্চলে ১১,৪০,০০০ ঘন-কিউবিক ফুট গ্যাস সঞ্চিত আছে বলিয়া অনুমান করা হয়। নিকটবর্তী ধুলিয়াজান বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের জন্য এই গ্যাস ব্যবহার করা হয়।

কয়লা ঃ উপত্যকার দক্ষিণ পূর্ব অংশে লেডো-মাকুম, জয়পুর-দিল্লী ও নাজিরা অঞ্চলে ৩৩,০০,০০,০০০ টন কয়লা সঞ্চিত আছে বলিয়া বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন। এই কয়লা খুব উচ্চস্তরের নয়। তবে ইহা রেলওয়ে, লৌহ ও তাম্র শিল্প, ইষ্টক নির্মাণ, আভ্যন্তরীণ জলপথের স্টীমার, চা-বাগান ও নানারূপ গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ফায়ার ক্লে ঃ উপত্যকার পূর্ব অংশে কয়লা ক্ষেত্রগুলির সঙ্গেই ইহা একসঙ্গে পাওয়া যায়। সম্প্রতি গোয়ালপাড়ার চন্দ্রডোঙ্গা পর্বত, কামরূপ-মেখলা সীমান্তে-হাফলং প্রভৃতি অঞ্চলে লৌহ ও কোয়ার্টজাইট খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

শিল্পজ সম্পদ ঃ ব্রহ্মপুত্রের উচ্চগতিতে ডিব্রুগড় ও নিম্নগতিতে গৌহাটিকে কেন্দ্র করিয়া এখানকার যাবতীয় শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। সমগ্র কর্মীর প্রায় এক চতুর্থাংশ নানাবিধ ক্ষুদ্র শিল্প, বৃহৎ শিল্প, খনিশিল্প প্রভৃতিতে নিযুক্ত আছে। এখানকার শিল্পগুলি মোটামুটি তিনটি ভাগে বিভক্ত ঃ (ক) কৃষি-ভিত্তিক (খ) খনি-ভিত্তিক (গ) অরণ্য-ভিত্তিক ও (ঘ) বিবিধ।

(ক) কৃষি-ভিত্তিক ঃ (১) **খাদ্য সংক্রান্ত ঃ** নওগাঁ ও কামরূপ অঞ্চলে চাউল কল, নানাস্থানে ময়দা কল, ফল সংরক্ষণ, ডেয়ারী শিল্প, তৈল কল, বেকারী প্রভৃতি শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। আখ উৎপন্ন হইলেও চিনি উৎপাদনে এই অঞ্চল তেমন উন্নতি করিতে পারে নাই। (২) **চা-শিল্প ঃ** লখিমপুর ও শিবসাগর জেলায় এই অঞ্চলের ৬৩৬টি চা-কারখানার ৪৯১টিই অবস্থিত। ভারতের প্রায় অর্ধাংশ চা এখানে উৎপন্ন হয় এবং রাজ্যের ১৫% অর্থাগম ইহার মাধ্যমেই হইয়া থাকে। (৩) **বয়ন শিল্প ঃ** নওগাঁ জেলার দুটি স্থানে (মিল ঘাটে পাট শিল্প এবং জায়গীর রোডে রেশম শিল্প) বয়ন কেন্দ্র আছে। সম্প্রতি গৌহাটিতে একটি পাওয়ারলুম স্থাপিত হইয়াছে। বয়ন শিল্পে এই অঞ্চল খুবই অনুন্নত। (৪) **প্রাণীজ তন্তু ঃ** আসাম অরণ্যের এরি, মুগা, এণ্ডি প্রভৃতি তন্তুজাত শিল্প কামরূপ জেলায় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে।

(খ) খনি-ভিত্তিক ঃ (১) **লৌহ ও ইস্পাত ঃ** ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া, জোড়হাট প্রভৃতি অঞ্চলে ক্ষুদ্রায়তন লৌহ ও ইস্পাত শিল্প আছে। এখানে চা-বাগান ও কৃষি

কাজের যন্ত্রপাতি নির্মাণ হয়। গৌহাটির শিল্প কেন্দ্রে 'রড' ও 'বার' তৈয়ারী হয়। (২) **অ-ধাতু শিল্প ঃ** ক্ষুদ্রায়তন শিল্প হিসাবে গৌহাটি অঞ্চলের তামা ও কাঁসা কেন্দ্র করিয়া এখানে তৈজসপত্র তৈয়ারী হয়। কামরূপ (হাজো) ও শিবসাগর জেলায় ইহা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। (৩) **তৈল-শোধনাগার ঃ** ডিগবয় ও গৌহাটির নিকটবর্তী নুনমাটিতে তৈল শোধনাগার আছে। অশোধিত তৈল নলপথে বিহারের বারৌণী তৈল শোধনাগারে পাঠানো হয়। (৪) **সার শিল্প ঃ** স্থানীয় প্রাকৃতিক গ্যাসের সাহায্যে লখিমপুর জেলায় একটি রাসায়নিক সার উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এখানে একটি তাপশক্তি উৎপাদন কেন্দ্রও আছে। (৫) **বিবিধ ঃ** এই সকল শিল্প ব্যতীত এখানে গ্যাস-সিলিণ্ডার, মৃৎশিল্প, ডিগবয় ও তিনসুকিয়া ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প, গৌহাটির সাইকেল রিক্সা, এ্যালুমিনিয়াম আসবাবপত্র, ট্রাংক ইত্যাদি নলকূপের নল, রেল মেরামত প্রভৃতি বহুবিধ শিল্প এই অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছে।

(গ) **অরণ্য ভিত্তিক ঃ** করাত কল, বেত শিল্প, চায়ের বাক্স নির্মাণ প্রভৃতি শিল্প স্থানীয় অরণ্য সম্পদ ভিত্তি করিয়া ধুবড়ী অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছে। গৌহাটিতে হার্ডবোর্ড নির্মাণ, মার্ঘেরিটা মারিয়ানী ও তিনসুকিয়া অঞ্চলে প্লাইউড নির্মাণ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গোয়ালপাড়া জেলার যোগীঘোপা অঞ্চলে একটি কাগজ কল স্থাপনের সম্ভাবনা আছে।

যোগাযোগ-ব্যবস্থা ঃ অসংখ্য নদী, নদীর জল স্ফীতির জন্য বন্যা, স্থলভাগের স্বল্পতা ইত্যাদি নানা কারণে এই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন উন্নত নয়। সমগ্র অঞ্চলটি উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলপথের অন্তর্গত এবং গৌহাটির নিকটবর্তী পাণ্ডু ইহার কার্যালয়। এই সমভূমির প্রায় সর্বত্রই মিটার গেজ রেলপথ চালু আছে। নদীর সমান্তরালে উত্তরে ও দক্ষিণে দুইটি রেলপথ দ্বারা সমস্ত উল্লেখযোগ্য শহরগুলি যুক্ত হইয়াছে। চা, পাট, তৈল ও তৈলজাত দ্রব্য এই রেলপথে যাতায়াত করে। নদীর দক্ষিণে জাতীয় সড়ক ৩৭ গোয়ালপাড়া, নওগাঁ, জোড়হাট, শিবসাগর, ডিব্রুগড় প্রভৃতি শহরের উপর দিয়া গিয়াছে। নদীর উত্তরাংশেই অনুরূপ একটি সুদীর্ঘ জাতীয় সড়ক প্রসারিত হইয়াছে। সম্প্রতি গৌহাটিতে ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর সেতু নির্মাণ হওয়ায় যানবাহন চলাচলের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে এবং বর্তমানে ইহার মাধ্যমে আন্তঃরাজ্য (পশ্চিমবঙ্গ-বিহার-আসাম) লরী চলাচল করিতে পারে। আভ্যন্তরীণ জলপথের ক্ষেত্রে ব্রহ্মপুত্র এবং ইহার শাখা নদীগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেশ বিভাগের ফলে ব্রহ্মপুত্র জলপথের গুরুত্ব অনেক কমিয়া গিয়াছে। ভারত হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন হওয়ায় এখানে বিমানপথের উন্নতি হইয়াছে। এখানে পাঁচটি বিমান-বন্দর আছে ঃ (১) বড়ঝর (গৌহাটি) (২) সালোনি (তেজপুর) (৩) রৌবয়া (জোড়হাট) (৪) লীলাবাড়ী (উত্তর লখিমপুর) ও (৫) মোহনবাড়ী (ডিব্রুগড়)। এই সকল বিমানপথ উপত্যকার বিভিন্ন অংশ ও কলিকাতার সহিত সংযুক্ত।

১০
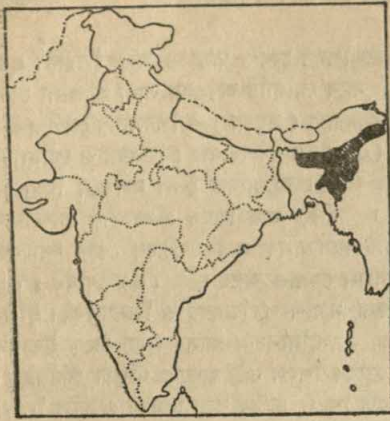
।। উত্তর-পূর্বের পার্বত্য অঞ্চল ।।

১. সাধারণ পরিচয়

ভূমিকাঃ এই পার্বত্য অঞ্চল ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী, কারণ ইহা ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত এবং এখানে বহু প্রতিবেশী রাষ্ট্র মিলিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার দক্ষিণে সমগ্র পার্বত্যঅঞ্চল পূর্বে আসাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই অঞ্চল মূলতঃ আদিবাসী অধ্যুষিত, কিন্তু এখানকার বিভিন্ন অংশের অধিবাসীগণের মধ্যে নানা-বিষয়ে পার্থক্যের ফলে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে বিগত কয়েক বৎসরে আসামের রাজনৈতিক মানচিত্রে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বর্তমানে এখানে ক্ষুদ্র-বৃহৎ সাতটি রাজ্য ও রাজ্য অংশ লইয়া এই ভৌগোলিক অঞ্চল গঠিত হইয়াছে। উহারা পূর্বে আসাম নামে পরিচিত হইলেও বর্তমানে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত।

অবস্থান ও আয়তনঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত এই অঞ্চলটি অনেক-গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ও জেলা লইয়া গঠিত। মোটামুটিভাবে ইহারা ২১°৫৭′ উত্তর হইতে ২৮°২৩′ উত্তর এবং ৮৯°৪৭′ পূর্ব হইতে ৯৭°২৫ পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলের আয়তন ১৩০০৯১ বর্গকিলোমিটার, ইহাদের মধ্যে মণিপুর রাজ্যই আয়তনে সর্ববৃহৎ, নবগঠিত মেঘালয় রাজ্যের স্থান ইহার পরে।

সীমাঃ এই পার্বত্য অঞ্চলের প্রাকৃতিক সীমা নিম্নরূপ : সমগ্র উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদী উপত্যকার পলিগঠিত অঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে গঙ্গা-সমভূমির ব-দ্বীপ অঞ্চল, দক্ষিণ ও সমগ্র পূর্ব অংশ আরাকান ইয়োমার পার্বত্য অঞ্চল দ্বারা বেষ্টিত। কিন্তু এই অঞ্চলের পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশে বাংলাদেশ (পূর্বের পূর্ব-পাকিস্তান), পূর্বে ব্রহ্মদেশ, উত্তর-পূর্ব অংশে নেফা (অরুণাচল) ও উত্তরাঞ্চল আসাম রাজ্য দ্বারা সীমিত।

বর্তমান ইতিহাসঃ দীর্ঘ দিন ধরিয়া বিভিন্ন পর্যায়ে, এই পার্বত্য রাজ্যগুলির গঠনের কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে। (১) স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে মণিপুর ও ত্রিপুরার রাজা-শাসিত রাজ্য দুইটি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে ইহারা কেন্দ্রীয়

অঞ্চল (Union Territory) রূপে গণ্য হয়। (২) ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে বালিপাড়া সীমান্ত অঞ্চল, অবর পর্বত, মিশমী পর্বত, তিরাপ সীমান্ত অঞ্চল ও আসাম লইয়া উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল (North Eastern Frontier Agency বা সংক্ষেপে Nefa) গঠিত হয়। (৩) ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে নাগাল্যান্ড পাহাড় ও তুয়েনসাঙ অঞ্চল লইয়া নাগাল্যান্ড রাজ্য গঠিত হয়। (৪) পূর্বতন মিজো অধ্যুষিত লুসাই পাহাড় অঞ্চলটি বর্তমানে মিজোরাম রাজ্য নামে পরিচিত। (৫) উত্তর কাছাড় ও মিকির পার্বত্য জেলা লইয়া ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে সংযুক্ত মিকির ও উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলা গঠিত হয়। (৬) সর্বশেষে ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে গারো, খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড় লইয়া মেঘালয় রাজ্য গঠিত হয়।

অঞ্চল পরিচয়ঃ যে সকল স্থান লইয়া এই ভৌগোলিক অঞ্চলটি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ (ক) উত্তরে পূর্বতন নেফা (বর্তমানে অরুণাচল) রাজ্যের লোহিত সীমান্ত বিভাগের দক্ষিণ অংশ ও তিরাপ সীমান্ত বিভাগ, (খ) ইহার দক্ষিণ-পশ্চিমে নাগাল্যান্ডের মোককচাং, কোহিমা, তুয়েনসাং অঞ্চল, (গ) ইহার দক্ষিণে মণিপুর রাজ্যের মাও, উখরুল, ইম্ফল পালেল, যোধল, চূড়াচাঁদপুর, বিষ্ণুপুর, জিবিঘাট, তামেংলং, কাংপোক্‌সি অঞ্চল (ঘ) ইহার পশ্চিমে কাছাড় জেলার উত্তরাংশ ও মিকির পার্বত্য অঞ্চল, (ঙ) ইহার দক্ষিণে মিজোরাম রাজ্যের কোলোশিব, আইজল, ভানলাইফাই, দেমাগিরি অঞ্চল, (চ) ইহার পশ্চিমে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা, সোনামুরা, অমরপুরী, বিলোনিয়া, উদয়পুর, সবরুম, খোয়াই, কমলপুর, কৈলাসহর, ধর্মনগর অঞ্চল এবং (ছ) মণিপুরের পশ্চিমে গারো ও সংযুক্ত খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড় লইয়া মেঘালয় রাজ্য।

২. প্রাকৃতিক পরিচয়

ভূ-প্রকৃতিঃ উত্তর-পূর্ব ভারতের এই অঞ্চলটি একটি সুবিস্তৃত পার্বত্য এলাকা। এই পার্বত্য অঞ্চলে দুইটি স্পষ্ট বিভাগ দেখা যায়। প্রথমতঃ হিমালয়ের দক্ষিণমুখী শাখার পাতকোই, নাগা, বরাইল ও লুসাই পর্বতগুলি এই অঞ্চলে সমগ্র পূর্বাংশ জুড়িয়া অবস্থিত। দ্বিতীয়তঃ দাক্ষিণাত্যের সুকঠিন মালভূমির উত্তর-পূর্ব শাখার একটি প্রসারিত অংশ দ্বারা মেঘালয় ও সন্নিহিত অঞ্চল গঠিত হইয়াছে। ইহার মধ্যভাগে (অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ অঞ্চলে) গাঙ্গেয় পলি সঞ্চিত হওয়ায় ইহা দাক্ষিণাত্যের কঠিন ভূখণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এই পার্বত্য অঞ্চলটি পশ্চিম হইতে পূর্বে (গারো, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া পার্বত্য অঞ্চল) প্রসারিত হইয়া পূর্ব প্রান্তের বরাইল পর্বতাঞ্চলের সহিত মিলিত হইয়াছে। নিম্নে এই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল ঃ

(ক) **তিরাপ-লোহিত অঞ্চলঃ** এই অংশের গড় উচ্চতা প্রায় ৯০০ মিটার এবং ইহা দক্ষিণাভিমুখে বাড়িতে বাড়িতে নাগাল্যান্ড ও মণিপুর অঞ্চলে সর্বোচ্চ হইয়াছে। কিন্তু তিরাপ হইতে উত্তরে নেফার (অরুণাচল) পূর্বদিকে লোহিত অঞ্চলে ইহার উচ্চতা গড়ে ১৫০০ মিটার। সাধারণ ভাবে তিরাপ-লোহিত অঞ্চলের ডালফাবুম শৈলশিরা সর্বোচ্চ (৪৫৭৯ মিটার) পর্বত। এই সকল পর্বত গাত্র হইতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর সৃষ্টি হইয়াছে।

(খ) **নাগাল্যান্ড অঞ্চলঃ** বরাইল পর্বতমালার উত্তর কাছাড় হইতে নাগাল্যান্ডে প্রবেশ করিয়া কোহিমা পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জাপাভো

(২৯৭০ মি) কোহিমার নিকটেই অবস্থিত। ইহার পূর্বে আরও দুইটি শৈল-শিরা আছে ; প্রথমটি কোহিমা পর্বত এবং দ্বিতীয়টি নাগাপাহাড়। নাগাপাহাড় এই অঞ্চলের পূর্ব সীমা নির্ধারণ করিতেছে। এই পর্বতটি ব্রহ্ম ও ভারতের নদীগুলির জলবিভাজিকা রূপে কাজ করিতেছে। এই অঞ্চলে ৩০০ মিটার উচ্চতা-যুক্ত অনেক শৃঙ্গ আছে, তবে সর্বোচ্চ (৩৯২৬ মি) শৃঙ্গের নাম সারামতী।

(গ) **মিকির পার্বত্য অঞ্চল** : নাগাল্যান্ডের পশ্চিমে অবস্থিত এই অঞ্চলটি চতুর্দিকে সমভূমি (উত্তরে ব্রহ্মপুত্র সমভূমি, দক্ষিণে ত্রিপুরা-কাছাড় সমভূমি) দ্বারা বেষ্টিত হওয়ায় ইহা পারিপার্শ্বিক হইতে কিছুটা বিচ্ছিন্ন মনে হয়। দীর্ঘদিন ধরিয়া ক্ষয়কার্যের ফলে এই অঞ্চলের বর্তমান উচ্চতা প্রায় ৪৫০ মি. এবং দক্ষিণে ঢালু কিন্তু ইহার মধ্যবর্তী অংশের উচ্চতা প্রায় ১০০০ মিটার। উত্তরদিকের একটি পার্বত্যশ্রেণী আসামের নওগাঁ জেলার ডবাকা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে আসামের শিবসাগর জেলা অবধি বিস্তৃত এবং দক্ষিণের পর্বত অংশটি (৯০০ মি. উচ্চ) রেংমা পর্বত নামে পরিচিত। এই পর্বতময় অঞ্চলটির দক্ষিণাংশ জয়ন্তিয়া পার্বত্য অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে।

(ঘ) **গারো-খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পার্বত্য অঞ্চল** : এই অঞ্চলের পশ্চিমে গারো পর্বত, দক্ষিণে বাংলাদেশ সমভূমি, উত্তরে ব্রহ্মপুত্র সমভূমি ও পূর্বে মিকির পার্বত্য অঞ্চল। পশ্চিমপ্রান্তে পশ্চিমবঙ্গ সন্নিহিত স্থানের উচ্চতা ১৫০ মিটারের নিম্নে এবং উচ্চতা চতুর্দিক হইতে বাড়িয়া মধ্যভাগে তুরা পর্বতশ্রেণীতে সর্বোচ্চ হইয়াছে (তুরা পর্বতশ্রেণী গারো হিলের প্রায় মধ্যস্থলে পূর্ব-দক্ষিণে প্রসারিত) নরবোক (১৫১৫ মি) ইহার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। অবশিষ্ট অংশের গড় উচ্চতা প্রায় ৪৫০ মিঃ। ইহার পূর্বাংশে (খাসিয়া, জয়ন্তিয়া) প্রকৃতপক্ষে একটি মালভূমি অঞ্চল। শিলং মালভূমি নামে পরিচিত এই অঞ্চলেই মেঘালয় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত এই পর্বতশ্রেণীর মধ্য অংশের গড় উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১৮০০ মিঃ উচ্চ। মালভূমির উপরের অংশ প্রায় সমতল হইয়া আসিয়াছে। অসংখ্য নদীর সৃষ্টি করিয়া ইহা ধীরে ধীরে ব্রহ্মপুত্র নদীর দিকে ঢালু হইয়া গিয়াছে এবং ইহার দক্ষিণ অংশ অপেক্ষাকৃত কম ঢাল সম্পন্ন হইয়া দক্ষিণে বাংলাদেশের সুর্মা নদী উপত্যকা গঠন করিয়াছে।

(ঙ) **মণিপুর অঞ্চল** : এই অঞ্চলটির চতুর্দিকে পাহাড় (গড় উচ্চতা ৯০০ মিঃ) বেষ্টিত থাকায় কোহিমা উপত্যকা একটি ডিম্বাকৃতি নিম্নসমভূমি অঞ্চলরূপে গঠিত হইয়াছে। ইহা উত্তর দক্ষিণে ৫৭ কিঃ মিঃ এবং পূর্ব-পশ্চিমে কমপক্ষে ৩২ কিঃ মিঃ প্রস্থ বিশিষ্ট। লোকটাক হ্রদ এই উপত্যকার সর্বনিম্ন অঞ্চল। ইহার দক্ষিণে লুসাই পর্বত অবস্থিত।

(চ) **ত্রিপুরা-কাছাড় সমভূমি অঞ্চল** : প্রকৃতপক্ষে এই পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে ত্রিপুরা-কাছাড় অঞ্চল একটি নিম্ন উচ্চতা বিশিষ্ট সমভূমি মাত্র। ইহার উত্তরাংশ মিজোহিল বা লুসাই পাহাড়ের অংশ বিশেষে পরিণত হইয়াছে। প্রকৃত-পক্ষে ইহা নদীবাহিত পলি, বালি, কর্দম, নুড়ি ইত্যাদি দ্বারা গঠিত সুর্মা নদীর উপত্যকা বিশেষ। এই অঞ্চলের ঢাল নদীস্রোতের অনুকূলে নয় বলিয়া স্থানে স্থানে জল আবদ্ধ হইয়া জলাভূমি ও নিম্নভূমির সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার গড় উচ্চতা ১৫০ মি.।

(ছ) **লুসাই পাহাড় বা মিজো হিল অঞ্চল** : এই পার্বত্য অঞ্চলের গড়

উচ্চতা প্রায় ৪৫০ মি.। তবে সর্বোচ্চ ১৫০০ মি. উচ্চ। লুসাই পাহাড়ের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা উত্তর-দক্ষিণে কয়েকটি সমান্তরাল পর্বতমালায় বিস্তৃত হইয়াছে বলিয়া এই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি কেবলমাত্র পর্বত ও পর্বত-উপত্যকা দ্বারা গঠিত। এই অঞ্চলের নদীগুলিও ভূ-প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত হইতেছে।

নদ-নদীঃ এই পার্বত্য অঞ্চলে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর সৃষ্টি হইয়াছে। অধিকাংশ নদীই উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত, ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মিজোহিল অঞ্চল। পূর্বাঞ্চলের নদীগুলি পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইলেও গারো, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলের নদীগুলি উত্তর ও দক্ষিণ উভয়দিকেই প্রবাহিত হইয়াছে। এই সকল নদীর স্রোত খুব তীব্র এবং নদীউপত্যকা অত্যন্ত অপ্রশস্ত। **উত্তর বাহিনী নদীঃ** গারো-খাসি-জয়ন্তিয়া পার্বত্য অঞ্চল হইতে উৎপন্ন গোনাল, রিঙ্গি, চাগুয়া, অজগর, খারি প্রভৃতি নদীগুলি উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদীর দিকে প্রবাহিত। মিজোহিল হইতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী উত্তরমুখে প্রবাহিত হইতেছে। **পশ্চিম বাহিনী নদীঃ** লোহিত, বুড়ি, ডিহাং, ডিয়ুং, প্রভৃতি নদীগুলি পূর্বের পার্বত্য অঞ্চল হইতে উৎপন্ন হইয়া পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার দিকে ধাবিত হইয়াছে এবং গোমতী কুমিয়ারা প্রভৃতি নদীগুলি মেঘনা নদীর সহিত যুক্ত হইয়াছে। মিকির পর্বতের নদীগুলি (ধনসিরি, যমুনা, কপিলী) এই অঞ্চলের উত্তর-পূর্বের পর্বতাঞ্চল হইতে উৎপন্ন হইয়া পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র নদীর দিকে প্রবাহিত হইতেছে। **দক্ষিণ-বাহিনী নদীঃ** মণিপুর হইতে প্রবাহিত মণিপুর নদী এবং মিজোহিল হইতে প্রবাহিত কলাদাম নদী এই অঞ্চলের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষিণমুখী নদী। অপরাপর দক্ষিণমুখী নদীগুলির মধ্যে গারো-জয়ন্তিয়া পার্বত্য অঞ্চল হইতে উৎপন্ন দারং, সন্দা, যদুকাটা, মতনা প্রভৃতি নদীগুলি দক্ষিণে শ্রীহট্ট সমভূমিতে (বাংলাদেশ) সুর্মা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। **পূর্ব-বাহিনী নদীঃ** ইহারা আকারে ক্ষুদ্র। ভারতের পূর্ব সীমান্ত বরাবর পর্বতমালা থাকায় অধিক সংখ্যায় নদী পূর্বদিকে প্রবাহিত হইতে পারে নাই। তিরাপ, নাগাল্যাণ্ড ও মণিপুর অঞ্চলের তিনটি নদী পূর্বমুখে প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মদেশের চিন্দুইণ নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

জলবায়ুঃ পার্বত্য অঞ্চল বলিয়া এখানে গ্রীষ্মকাল মৃদু এবং শীতকাল অতি তীব্র। শীতকালে এই অঞ্চলে গড় তাপমাত্রা থাকে ১৭° সে.। জানুয়ারী সর্বাপেক্ষা শীতল মাস। ফেব্রুয়ারী হইতে উত্তাপ বাড়িতে থাকে এবং গ্রীষ্মকালে এই অঞ্চলের তাপমাত্রা গড়ে ২৭° সে. পর্যন্ত হয়। বর্ষার পর দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রত্যাবর্তন করিলে এই অঞ্চলে তাপমাত্রা পুনরায় কমিতে আরম্ভ করে।

বৃষ্টিপাতঃ মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এই অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। খাসিয়া পাহাড়ের দক্ষিণ দিকের চেরাপুঞ্জীতে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ১২৫০ সে. মি. কিন্তু তাহার উত্তর দিকের বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে শিলং শহরে মাত্র (২০০ সে. মি.) বৃষ্টিপাত হয়। এই অঞ্চলের অন্যান্য স্থানে বৃষ্টির পরিমাণ আরও কম। গত কয়েক বৎসর যাবৎ শিলং-এর নিকটবর্তী মৌসিনরাম নামক স্থানে চেরাপুঞ্জী অপেক্ষাও অধিক বৃষ্টিপাত হইতেছে। বৃষ্টির পরিমাণ মণিপুর অঞ্চলে ১৫০ সে. মি. উত্তর কাছাড়, মিজোহিল ও পশ্চিম মণিপুরে ১৫০-২০০ সে. মি.।

মৃত্তিকাঃ সমভূমি, পর্বত, পর্বতের পাদদেশ ও নদীউপত্যকা লইয়া এই

অঞ্চল গঠিত বলিয়া এই অঞ্চলের মৃত্তিকার নানারূপ বৈচিত্র্য দেখা যায়। যে সকল মৃত্তিকা দ্বারা এই অঞ্চল গঠিত, তা' মূলতঃ নিম্নরূপ (১) **পর্বত পাদদেশের দোঁয়াশ মৃত্তিকাঃ** মণিপুর, মিজোহিল, উত্তর কাছাড়ের পার্বত্য অঞ্চলে। মিকির পর্বতের উত্তরাংশে এবং মেঘালয়ের প্রায় সমগ্র অঞ্চলে এই প্রকার মৃত্তিকা দেখা যায়। তিরাপ ও লোহিতের পার্বত্য অঞ্চল বালি প্রধান দোঁআশ দ্বারা গঠিত। এই মৃত্তিকা জৈবগুণ সম্পন্ন এবং কৃষিকাজের পক্ষে অনুকূল। (২) **পলিমৃত্তিকাঃ** লোহিত ও তিরাপ জেলার অন্যত্র মেঘালয় ও মিকির হিলের উত্তরে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা সন্নিহিত অঞ্চলে, মণিপুরের মধ্যভাগে বালি ও কাদা মিশ্রিত পলি এবং ত্রিপুরা ও কাছাড়ের অধিকাংশই পলি মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। এই মৃত্তিকা খুবই উর্বর। (৩) **ল্যাটেরাইটঃ** নাগাল্যাণ্ডের পশ্চিমদিকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা সন্নিহিত সামান্য অংশে। মিকির হিলের উত্তর ও দক্ষিণের সামান্য অংশে ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা দেখা যায়। ইহা তেমন উর্বর নহে বলিয়া কৃষি কাজের পক্ষে অনুকূল নয়। (৪) **কৃষ্ণমৃত্তিকাঃ** নাগাল্যাণ্ডের প্রায় সর্বত্রই এই মৃত্তিকা দেখা যায়। এই মৃত্তিকা প্রচুর পরিমাণে চুন, লোহ ও ফসফরাস দ্বারা সমৃদ্ধ বলিয়া কৃষিকাজের পক্ষে বিশেষ অনুকূল।

স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জঃ ভারতের বনজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই পার্বত্য অঞ্চলের একটি বিশেষ স্থান আছে। এখানে বহু সংরক্ষিত অরণ্য আছে। ঝুম পদ্ধতির চাষ দ্বারা যদিও এই অরণ্যের অনেক ক্ষতি হইতেছে, তথাপি এখনও এই অরণ্যে যে সকল বৃক্ষ জন্মে সেগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। (১) **ক্রান্তীয় চিরহরিৎঃ** ৩০০ মিটার উচ্চতায় শাল, সাম,চাপা, গোমারি বৃক্ষ এবং নানাবিধ বাঁশ, বেত ইত্যাদি জন্মে। এই অরণ্য গারো পাহাড়,, খাসিয়া, জয়ন্তিয়ার উত্তর ও দক্ষিণ ঢালে, মিকির হিল এবং অন্যত্র দেখা যায় (২) **ক্রান্তীয় তৃণভূমিঃ** ৩০০-৭৫০ মিঃ উচ্চতায় যে সকল স্থান সেগুলি নানাবিধ তৃণদ্বারা আবৃত। এই সকল অঞ্চলে ঝোপঝাড় জাতীয় বৃক্ষও দেখা যায়। (৩) **সরলবর্গীয়ঃ** আরও উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে উইলো, বার্চ, ওক, চেসনাট, মেপল, ম্যাগনোলিয়া প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। পূর্ব মেঘালয়ে পাতকোই-নাগা লুসাই পার্বত্য অঞ্চলের উচ্চ-অংশে এই অরণ্য দেখা যায়।

সাংস্কৃতিক ও আর্থিক পরিচয়।

এই বিস্তীর্ণ পার্বত্য এলাকায় উপরোক্ত প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের পটভূমিতে এখানে এক বিচিত্র ধরনের সাংস্কৃতিক ও আর্থিক বৈচিত্র্য সৃষ্টি হইয়াছে। সমগ্র অঞ্চলের এই বৈশিষ্ট্য এতই বৈচিত্র্যপূর্ণ যে তাহাদের আলোচনা পৃথক রূপে করা প্রয়োজন। এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বিভিন্নতার ফলে অধিবাসীদের আর্থিক জীবনও প্রভাবিত হইতেছে। এই সকল কারণে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন খণ্ড রাজ্যগুলির আলোচনা পৃথক ভাবে করা হইল।

তিরাপ-লোহিত অঞ্চল

৩. সাংস্কৃতিক পরিচয়।

জনসংখ্যাঃ এই অঞ্চলটি দুর্গম এবং জনসংখ্যা খুব অল্প হওয়ায় তিরাপ-লোহিত অঞ্চলটি দীর্ঘদিন ধরিয়া আমাদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে এখানে সর্বপ্রথম আদমসুমারী হয়। এখানকার ১৬০০০ বর্গ কিলোমিটার ভূ-খণ্ডে

৬৭৩০০০ লোক বাস করে। তিরাপ অঞ্চলেই সর্বাধিক লোকের বাস। তিরাপ ও বোয়া ডিহাং নদী এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় সমগ্র জনসংখ্যার অধিকাংশই এই নদীউপত্যকায় বাস করে। লোহিত অঞ্চলে জনসংখ্যা খুবই কম, ইহারা পশ্চিমাংশে লোহিত নদীর দক্ষিণ উপত্যকায় কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। এই অঞ্চলের পূর্বাংশ প্রায় জনশূন্য।

জনসংস্কৃতিঃ এখানকার অধিবাসীরা প্রায় সকলেই আদিবাসী। নক্‌টে, ওয়ানচো, টাংসা প্রভৃতি উপজাতি তিরাপ জেলায় এবং মিশমী জাতির ডিয়াগাম, সিজু ও ইদু সম্প্রদায় লোহিত জেলায় বাস করে। এই কারণে পূর্বে এই অঞ্চল

'মিশমীহিল' নামে পরিচিত ছিল। ইহারা মূলতঃ কৃষিজীবী, সমগ্র জনসংখ্যার মাত্র ৭ শতাংশ শিক্ষিত। ১৪ বৎসরের ঊর্ধ্বে সকল ব্যক্তিই কোন না কোন কর্মে নিযুক্ত আছে। ইহারা খুব স্বাধীনতা প্রিয়। তাই অন্যদের সহিত গোষ্ঠীবন্ধ জীবনযাপন করিতে পারে না।

গ্রাম ও শহরঃ সমগ্র অঞ্চলটি পার্বত্য ও অরণ্যময় হওয়ায় এখানে কোন শহর গড়িয়া উঠে নাই। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গ্রামে এই সকল আদিবাসী গোষ্ঠীবন্ধ জীবন যাপন করে। তিরাপ জেলার প্রধান কেন্দ্র তৈজু এবং লোহিত জেলার প্রধান কেন্দ্র খেলা—এই অঞ্চলের দুইটি উল্লেখযোগ্য বর্ধিষ্ণু অঞ্চল। যাবতীয় প্রশাসনিক কাজকর্ম এই দুইটি অঞ্চলের মাধ্যমে হয়।

৪. আর্থিক পরিচয়।

কৃষিজ সম্পদঃ ঝুম পদ্ধতির সাহায্যে কৃষিকাজ করাই ইহাদের প্রধান জীবিকা। লোহিত অঞ্চলের খাম্পটি উপজাতি ভিন্ন অন্যরা কেউই লাঙলের ব্যবহার জানে না। ইহারা জলশক্তির সাহায্যে ধান-ভানা কল চালাইতে জানে। তিরাপ জেলায় ধান, ভুট্টা প্রভৃতি শস্য এবং কচু, ট্যাপিওকা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। লোহিত অঞ্চলে নানাবিধ সামগ্রী উৎপন্ন হয়। উচ্চ অংশে গম, বার্লি প্রভৃতি এবং নিম্ন অংশে ধান, জোয়ার, কলাই, ইক্ষু, আলু, তৈলবীজ, আনারস প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে।

শিল্পজ সম্পদঃ কোনও প্রকার খনিজ সম্পদ আবিষ্কৃত না হওয়ায় এখানে শিল্প উৎপাদনমূলক অরণ্য ও কৃষি-ভিত্তিক। প্রধান উপাদান সামগ্রী হইল হাতে কাটা সুতা দ্বারা বস্ত্র, বাস্কেট, কাঠের আসবাব, তীর ও ধনুক ও দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য। লৌহ ও রৌপ্য গৃহশিল্পরূপে ব্যবহৃত। বেত ও বাঁশের কাজও হইয়া থাকে।

যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ এই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত। জাতীয় সড়ক ৩৮ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ডিব্রুগড় হইতে তিরাপ জেলার পশ্চিম প্রান্তে লিখাপানি পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সড়ক পথটি তিরাপ জেলার পূর্ব পশ্চিম বরাবর প্রসারিত রহিয়াছে। এই অংশের নদীগুলি অত্যন্ত খরস্রোতের জন্য নৌচলাচলের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নয়।

নাগাল্যাণ্ড অঞ্চল

৩. সাংস্কৃতিক পরিচয়।

জনসংখ্যাঃ এই অঞ্চলের জনসংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। নাগাল্যাণ্ডের ১৫৭৬৩ বর্গ কিলোমিটার পরিমিত এলাকায় ৩,৬৯,২০০ ব্যক্তি বাস করে বলিয়া এখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ২২ জন। কিন্তু তুলনামূলক বিচারে ইহার কোহিমা জেলা অপেক্ষা মোককচাং ও তুয়েনসাং জেলায় লোকসংখ্যা অধিক পরিমাণে বাস করে।

জনসংস্কৃতিঃ প্রধানতঃ আদিবাসী অধ্যুষিত এই অঞ্চলে প্রায় কুড়িটি সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কন্যাকা, আওস, সেমা, চকবেসাং, আঙগামি, সাংতামা প্রভৃতি আদিবাসীই প্রধান। ইহারা সকলে নাগা নামে পরিচিত বলিয়া এই অঞ্চলের নাম হইয়াছে নাগাল্যাণ্ড। সমগ্র অধিবাসীর মাত্র ৭ শতাংশ অন্য সম্প্রদায় ভুক্ত। ইহাদের অধিকাংশই খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিলেও প্রতিটি উপজাতির পৃথক পৃথক পোশাক, উৎসব, ভাষা ইত্যাদি আছে। সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় ১/৩ অংশ নানা প্রকার কর্মে নিযুক্ত আছে। তন্মধ্যে পুরুষ কর্মীর সংখ্যা কিছু বেশী। স্ত্রী কর্মীগণ কৃষি সংক্রান্ত এবং পুরুষগণ অন্যান্য নানাবিধ কর্ম করে।

গ্রাম ও শহরঃ ভারতের মধ্যে হিমাচল প্রদেশের পরেই এই রাজ্যে সর্বাপেক্ষা গ্রাম (৯৪.৮%) অঞ্চল দেখা যায়। এখানে ৮৯৪টি গ্রামে সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় ৮৪ শতাংশ বাস করে। অবশিষ্ট কোহিমা (৭২৪৮) মোককচাং (৬৯-৫৩), ডিমাপুর (৫৭৫৩) শহরে কেন্দ্রীভূত। কোহিমা নাগাল্যাণ্ডের প্রধান কেন্দ্র। তুয়েনসাং অঞ্চলের প্রধান কেন্দ্র তুয়েনসাং বর্তমানে শহর হইয়া উঠিতেছে।

৪. আর্থিক পরিচয়।

কৃষিজ সম্পদঃ কৃষিজ উৎপাদনই এই অঞ্চলের প্রধান আর্থিক সম্পদ। সমগ্র জমির শতকরা ৮১ অংশে চাষ করা হয়। কৃষি পদ্ধতির ত্রুটির জন্য এখানকার ভূমিক্ষয় বাড়িতেছে ও ভূমির উর্বরা শক্তি কমিতেছে। এখানে আর্দ্র কৃষি পদ্ধতি ও ঝুম পদ্ধতি-দুই ব্যবহৃত হয়। ঝুম পদ্ধতিতে প্রথম বৎসরে ধান, দ্বিতীয় বৎসরে অনুরূপ কোন শস্য হইলেও তৃতীয় বৎসরে জোয়ার, তুলা নানা-বিধ সব্জী ব্যতীত অন্য কোন কিছু চাষ করা যায় না। আর্দ্র কৃষি পদ্ধতি দ্বারা পাহাড়ের গায়ে ধাপ কাটিয়া জলের সাহায্যে ধান উৎপাদন করা হয়, ইহা ব্যতীত পাহাড়ের ঢালু অংশে চা চাষ হইয়া থাকে। কৃষি ভূমিতে জল সেচের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তবে প্রয়োজনের তুলনায় তাহা খুবই কম।

খনিজ সম্পদঃ কোহিমার পূর্বে সিজ্জু উপত্যকায় এক জাতীয় চুন পাওয়া যায়। নীচুগড়ের নিকটবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে লিগনাইট পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে সামান্য কয়লার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তবে ইহা খুব নিকৃষ্ট ধরনের।

শিল্পজ সম্পদঃ এই অঞ্চলে প্রতিকূল পরিবেশ থাকিলেও নাগারা তাহাদের সহজাত শিল্প প্রতিভার দ্বারা তাঁত শিল্পে অগ্রসর হইয়াছে। কুটির শিল্পজাত এই সকল তাঁত শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্যের বেশ চাহিদাও আছে। সম্প্রতি সরকার ডিমাপুরে একটি চিনি কল ও মোককচাং জেলায় একটি কাগজ শিল্প প্রকল্প গ্রহণ করিয়াছেন। কোহিমা ও মোককচাং জেলায় ১০টি গ্রামে রেশম শিল্প শুরু হইয়াছে। ডিমাপুরে কাষ্ট শোধন কারখানা আছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ এই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা অতি ত্রুটিপূর্ণ। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথের একটি শাখা নাগাল্যান্ড সীমান্তের ডিমাপুর স্পর্শ করিয়াছে মাত্র। জাতীয় সড়ক ৩৯ দ্বারা উত্তরে আসাম, দক্ষিণে মণিপুর, নাগাল্যান্ডের কোহিমা শহর যুক্ত হইয়াছে। এখানে কোনরূপ আভ্যন্তরীণ জলপথ বা বিমান বন্দরের সুবিধা নাই। নিকটবর্তী বিমানবন্দর আসামের জোরহাটে অবস্থিত।

মিকির-পার্বত্য অঞ্চল

৩. সাংস্কৃতিক পরিচয়।

জনসংখ্যাঃ সমগ্র মিকির ও মেঘালয় রাজ্যের জনসংখ্যা প্রায় ১ মিলিয়ন হইলেও, মিকির পার্বত্য অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত কম লোক বাস করে। এই অঞ্চলের জনসংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। কারণ উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চলগুলির মধ্যে এই অঞ্চলটিতে যোগাযোগ ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত। পার্বত্য অঞ্চলের বন্ধুরতা এই অংশে কিছুটা কম।

জন সংস্কৃতিঃ অধিবাসীদের মিকির বলা হয়। ইহারা বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা করিলেও, ইহাদের মধ্যে হিন্দু ও খ্রীষ্টানই বেশী। সমগ্র জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশও শিক্ষিত হইয়া উঠে নাই। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে স্ত্রী-কর্মীর সংখ্যা অধিক হওয়ায় সমগ্র কর্মীর সংখ্যা এখানে অপেক্ষাকৃতভাবে বেশী। ইহারা প্রধানতঃ কৃষিকাজ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। ব্যবসা-বাণিজ্য, যানবাহন ও সরকারী চাকুরিতে অল্প সংখ্যক লোক নিযুক্ত আছে।

গ্রাম ও শহরঃ এখানে কোন শহর নাই। সমগ্র রাজ্যে অসংখ্য গ্রাম দেখা যায়। দিফু (২০০০) এই অঞ্চলের প্রধান কেন্দ্র। এখানে যোগাযোগের ব্যবস্থা ভাল। ইহাকে একটি ক্ষুদ্র শহর বলা যায়। এই অঞ্চলের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য জনপদ হইল—বোকাজান, মাহুর, আমলখী, হাওড়াঘাট প্রভৃতি।

৪। আর্থিক পরিচয়

কৃষিজ সম্পদঃ অধিকাংশ ব্যক্তি কৃষিকাজ দ্বারাই জীবিকার্জন করে। ইহাদের চাষের পদ্ধতি অতি প্রাচীন। কৃষিভূমি স্বল্পতার জন্য শুষ্ক কৃষি (Dry Farming) পদ্ধতি দ্বারা কৃষিকাজ করা হয়। বিস্তৃত এলাকায় ধান-চাষ হইলেও চাহিদার তুলনায় তা হয় একান্ত অপর্যাপ্ত। এতদ্ব্যতীত ভুট্টা, তুলা, রেঢ়ি, লাঙ্কা ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। বর্তমানে ইহারা আর্দ্র চাষ ও পাহাড়ের কোলে ধাপ কাটিয়া চাষ করিতে শিখিয়াছে।

প্রাণীজ সম্পদঃ এখানে দুগ্ধ ও কৃষি কাজের জন্য পশুপালন করা হয়। এই অঞ্চলে গৃহ পালিত মহিষের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। প্রায় সর্বত্রই পোল্ট্রি প্রচলিত আছে। বন্যপশুর মধ্যে বুনো মহিষ, বাঘ, ভালুক, বন্যবরাহ, কুকুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আসাম-অরণ্যের গণ্ডারের ইহাই হইল আদিভূমি। বর্তমানে এই সকল বন্যপশু খুবই কমিয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত পদমপুখরী, বোকাজান ও হাওড়াহাট অঞ্চলের বিলে সরকারী উদ্যোগে মৎসচাষ—এই অঞ্চলের একটি বিশিষ্ট প্রাণীজ সম্পদ।

বনজ-সম্পদ ঃ এই অঞ্চলের অরণ্য নানাবিধ মূল্যবান কাঠ (শাল, সেগুন প্রভৃতি), বাঁশ, বেত প্রভৃতি সম্পদে সমৃদ্ধ। এই সকল দ্রব্য কাগজ-মণ্ড, আসবাব নির্মাণ প্রভৃতি শিল্পে ব্যবহৃত হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত বলিয়া এখনও এই সকল সম্পদের সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয় নাই।

খনিজ সম্পদঃ এই পার্বত্য অঞ্চলটি নানাপ্রকার খনিজ দ্রব্যে সমৃদ্ধ। তবে এখনও পর্যন্ত ইহাদের পূর্ণ ব্যবহার করা হয় নাই। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য খনিজগুলি হইল (১) **কয়লাঃ** ত্রিটেশান ও টার্শিয়ারী যুগে গঠিত কয়লাদ্বারা এই অঞ্চল সমৃদ্ধ। এখানে ভূগর্ভে প্রায় সাড়ে তিন মিলিয়ন কয়লা সংরক্ষিত আছে। (২) **চুনাপাথরঃ** উচ্চ শ্রেণীর চুনাপাথর গরমপানি, কৈলাঘান ও লংলাই অঞ্চলে পাওয়া যায়। ইহা স্থানীয় সিমেন্ট শিল্পে ব্যবহৃত হয়। (৩) **বিবিধঃ** এই পার্বত্য অঞ্চলের নানা স্থান কাদাপাথর, চীনামাটি, জিপ্সাম প্রভৃতি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ।

শিল্পজ সম্পদ ঃ দুই একটি খনি-ভিত্তিক শিল্প ও নানাবিধ ক্ষুদ্র শিল্প দ্বারাই এই অঞ্চলের শিল্প মানচিত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া অঞ্চলে কপিলী নদী উপত্যকা প্রকল্পের কাজ শেষ হইলে এই অঞ্চলে জল-বিদ্যুৎ আসিবার সম্ভাবনা আছে। বর্তমানে যে সকল শিল্প এখানে প্রতিষ্ঠিত আছে সেগুলি হইল স্থানীয় চুনাপাথরের সাহায্যে বোকাজান অঞ্চলে একটি সিমেন্ট শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কৈলাঘান অঞ্চলের কয়লাখনি কেন্দ্র করিয়া কয়লা সংক্রান্ত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। স্থানীয় লৌহ দ্বারা এখানে গৃহশিল্প রূপে দৈনন্দিন ব্যবহারের উপযোগী নানা-প্রকার (ছুরি, মৎস্য শিকারের সরঞ্জাম, ক্ষুর, কুঠার ইত্যাদি) দ্রব্য তৈরী করা হয়। দিফু শহরে এই উদ্দেশ্যে একটি সরকারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

স্থানীয় উপাদান দ্বারা কুটির শিল্পরূপে বাস্কেট, মাদুর ইত্যাদি তৈয়ারী হয়।

যোগাযোগ-ব্যবস্থাঃ সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে এই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই ক্ষীণ। প্রধান সড়কপথগুলির মধ্যে শিলং-ডাউকী সড়কপথ ও ডিমাপুর-নুমালীপুর সড়কপথের কিছু অংশ এই অঞ্চলে প্রসারিত হইয়াছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথের একটি শাখা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার নওগাঁ হইতে লামডিং পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া এই অঞ্চলের দিফু (সর্বপ্রধান রেলষ্টেশন) হইয়া উত্তরাঞ্চলে গিয়াছে। ইহার দ্বিতীয় অংশটি লামডিং হইতে হাফলং হইয়া কাছাড়ে প্রবেশ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত যমুনা, ডিয়াং, কপিলী প্রভৃতি নদী বর্ষাকালে আভ্যন্তরীণ জলপথরূপে ব্যবহৃত হয়, এখানে কোন বিমানপথের সুবিধা নাই।

মেঘালয় অঞ্চল

৩। সাংস্কৃতিক পরিচয়।

জনসংখ্যাঃ সমগ্র মেঘালয়-মিকির রাজ্যের জনসংখ্যা প্রায় ১ মিলিয়ন। তদনুযায়ী এই দুই রাজ্যে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ২৮ জন। তবে পৃথকভাবে মেঘালয় অঞ্চলেই সর্বাধিক জনসংখ্যা বাস করে। নানাপ্রকার প্রাকৃতিক অসুবিধার জন্য এখানে জনসংখ্যা বিক্ষিপ্তভাবে বাস করিতে বাধ্য হয়। তবে সাধারণভাবে বলা চলে যে, মেঘালয়ের পূর্বাংশ অপেক্ষা পশ্চিম অংশে লোক-বসতি অপেক্ষাকৃত ঘন।

জনসংস্কৃতিঃ গারোহিল অঞ্চলে গারো ও কোচ উপজাতি বাস করে। খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া অঞ্চল খাসি উপজাতি দ্বারা অধ্যুষিত। ইহারা নানারূপ প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা করে এবং এখনও তেমন উন্নত হইয়া উঠে নাই। ইহারা অধিকাংশ হিন্দু ও খ্রীষ্টান। শিলং অঞ্চলে অধিবাসীদের শিক্ষার হার সর্বাধিক, পশ্চিমাংশের গারো হিল সন্নিহিত অঞ্চল এবং পূর্বাংশে জয়ন্তিয়া পাহাড় সন্নিহিত অঞ্চলে ইহা কম। স্ত্রী-কর্মীর সংখ্যা অধিক হওয়ায় সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই কর্মী বলা যাইতে পারে। কৃষি কাজই ইহাদের প্রধান জীবিকা। তবে কিছু সংখ্যক লোক বাণিজ্য, পরিবহণ, গঠনমূলক কাজ ও সরকারী চাকুরিতে নিযুক্ত আছে।

গ্রাম ও শহরঃ এই অঞ্চলের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম প্রধান শহরগুলির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রায় সমগ্র জনসাধারণই গ্রামে বাস করে। তবে এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য শহরগুলি হইল **শিলং** (৭২৪৩৪) এই অঞ্চলের প্রধান শহর। ইহার নিকটবর্তী অন্যান্য শহরগুলি হইল শিলং ক্যান্টনমেণ্ট (১১৩৪৮), নংথিম্মাই (১০০৮৪), মাওলাই (৮৫২৮)। এই সকল শহর ব্যতীত পূর্ব মেঘালয়ে জোরাই (১৬১৯৭), এবং পশ্চিম মেঘালয়ে তুরা (৮৮৮৮) শহর দুইটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খাসি ও জয়ন্তিয়া অঞ্চলের মৌফলং, শেলা, ডাউকী, নংসাটন প্রভৃতি এবং গারো অঞ্চলের ফুলবাড়ী, দলু, সির্জু, বাখনারা প্রভৃতি ক্ষুদ্র শহরগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে শহর হইয়া উঠিতেছে। **চেরাপুঞ্জী** একদা সমগ্র আসামের রাজধানী ছিল। জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য বড়পানি ও বার্নিহাট শহর দুইটির উন্নতি হইয়াছে।

কৃষিজ সম্পদ ঃ কৃষিকাজ দ্বারাই এই অঞ্চলের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হয়।

কৃষিভূমি স্বল্পতার জন্য ঢালু পাহাড়ের গায়ে ধাপ কাটিয়া এবং কখনও কখনও 'ঝুম' পদ্ধতিতে শুষ্ক কৃষি দ্বারা কৃষিকাজ করা হয়। গোয়ালপাড়া সীমান্তে ধান্য এবং সমতল ভূমিতে ছোলা, ডাল, সরিষা, তামাক, আলু, তিল, নানাবিধ ফল ইত্যাদি উৎপন্ন করা হয়। পাট ও ইক্ষু এখানকার একমাত্র পণ্যশস্য। ধান্যের পরই তুলার স্থান। ইহা গারো অঞ্চলে চাষ হয়। এতদ্ব্যতীত কাজুবাদাম, ট্যাপিওকা, ভুট্টা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ফসল।

প্রাণীজ সম্পদঃ পূর্বে গারো ও খাসিয়াগণ শুধুমাত্র মাংস ও সারের জন্য গরু-মহিষ পালন করিত। বর্তমানে ইহারা দুগ্ধ ব্যবসায়ের জন্য পশুপালন করিয়া উত্তরাঞ্চলে আসাম সীমান্তে ও শিলং শহরে দুগ্ধ প্রেরণ করে। এতদ্ব্যতীত ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া ইত্যাদিও প্রতিপালিত হয়। মেঘালয়ের পশ্চিমে অরণ্য অঞ্চলে হাতী বাঘ, চিতা, বন্যবরাহ প্রভৃতি পশু দেখা যায়। এখানকার জলাশয়ে নানাবিধ মৎস্য চাষ হইয়া থাকে। সম্প্রতি শিলং-এ একটি মৎসচাষ কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

বনজ সম্পদঃ সমগ্র অঞ্চলের এক বৃহৎ অংশই অরণ্যাবৃত। এই অরণ্যে শাল, নানাবিধ বাঁশ, লাক্ষা, বেত, কাঠ, তেজপাতা, রজন, মধু প্রভৃতি দ্রব্য পাওয়া যায়, এই সকল দ্রব্য দ্বারা বিভিন্ন কুটির শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

খনিজ সম্পদ ঃ এই অঞ্চল নানাবিধ খনিজ দ্রব্যে সমৃদ্ধ। কিন্তু একমাত্র কয়লা, চুনাপাথর ও সিলিমেনাইট ব্যতীত অন্য কোন খনিজের পূর্ণ সদ্ব্যবহার এখনও করা হয় নাই। **কয়লাঃ** এই অঞ্চলের ভূগর্ভে প্রায় ৩৯৪ মিলিয়ন টন কয়লা সংরক্ষিত আছে বলিয়া অনুমান করা হয়। কিন্তু গারো, খাসি ও জয়ন্তিয়া পার্বত্য অঞ্চলের এই খনিগুলি হইতে বর্তমানে অতি সামান্য পরিমাণে খনিজদ্রব্য উত্তোলিত হয়। **চুনা পাথরঃ** জোরাই, সিজু (জয়ন্তিয়া), গারো হিল অঞ্চলের খনিজ চুনাপাথর স্থানীয় শিল্পে ব্যবহৃত হয়। **সিলিমেনাইট ঃ** ভারতের প্রায় ৯০ শতাংশ সিলিমেনাইট মধ্য মেঘালয় অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত খাসিয়া অঞ্চলের সোনাপাহাড় নামক স্থানে সর্বোচ্চ সিলিমেনাইট উৎপাদন হয়। এই খনি অঞ্চলেই কোরান্ডাম খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়। **সিলিকাঃ** মৃৎ শিল্প ও কাঁচ শিল্পের উপযোগী উৎকৃষ্ট বালুকা চেরাপুঞ্জী তুরা শিলং প্রভৃতি অঞ্চলে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত সমগ্র অঞ্চলের নানা অংশে ফায়ার ক্লে, লৌহ, তামা, স্বর্ণ, জিপসাম, গৃহনির্মাণের উপযোগী প্রস্তর প্রভৃতি পাওয়া যায়।

শিল্পজ-সম্পদঃ উপরোক্ত খনি সমূহে যে সকল শ্রমিক নিযুক্ত আছে তাহারা এই অঞ্চলের খনিসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ (উত্তোলন, সংশোধন) করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত শিল্প এই অঞ্চলে দেখা যায়। **খনি-ভিত্তিক শিল্পঃ** চুনাপাথরের দ্বারা চেরাপুঞ্জীতে একটি সিমেন্ট কারখানা চলিতেছে। চেরাপুঞ্জী অঞ্চলের কয়লা দ্বারা কোল কয়লা উৎপাদন করিয়া তাহা শিলং শহরে প্রেরণ করা হয়। **কারিগরী শিল্পঃ** সম্প্রতি খাসিয়া পর্বতের নাঙ্গল বিব্রা অঞ্চলে নিকটবর্তী কয়লার সহযোগিতায় একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বড়পানি ও উমত্রু জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র দুটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া অঞ্চলে 'কপিলী নদী প্রকল্প' নামে তৃতীয় একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা আছে। এতদ্ব্যতীত শিলং অঞ্চলে বিখ্যাত জি-ই-সি কোম্পানীর সহযোগিতায় একটি মিটার নির্মাণ কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। **কুটির শিল্পঃ** এই অঞ্চলের প্রায় সর্বত্রই স্থানীয় উপকরণের ভিত্তিতে বস্ত্রবয়ন, বাঁশ

ও বেতের সামগ্রী, দেশীয় নৌকা, লাক্ষা দ্রব্য দৈনন্দিন ব্যবহারের উপযোগী লৌহ-যন্ত্র প্রভৃতি নির্মিত হয়।

যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ প্রতিকূল পরিবেশের জন্য এই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত। মেঘালয়ে কোন রেলপথ নাই বলিয়া সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত এবং সমগ্র ভারতের সহিতই ইহা একমাত্র সড়কপথের সহিত যুক্ত। বর্তমানে শিলং-জোয়াই সড়ক পথটি (কাছাড় পর্যন্ত), এবং ফুলবাড়ী-তুরা সড়ক পথটি নির্মিত হইয়াছে। শিলং-জোয়াই সড়কপথটির নির্মাণকার্য শেষ হইলে ত্রিপুরা ও দক্ষিণ আসামের সহিত যোগাযোগ সহজ হইবে। পূর্ব মেঘালয়ে গৌহাটি-শিলং, শিলং-ডাউকী, শিলং-চেরাপুঞ্জী প্রভৃতি সড়কপথ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই অঞ্চলের সিনসাং, কৃষ্ণাই, দিগারু, বড়পানি প্রভৃতি নদী আভ্যন্তরীণ জলপথ রূপে ব্যবহৃত হয়। সম্প্রতি গৌহাটি যাতায়াত করিবার জন্য শিলং শহরে বিমানপথের একটি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গৌহাটি হইতে ত্রিপুরা, শিলচরগামী বিমান-গুলি মেঘালয়ের উপর দিয়া যায়।

মণিপুর অঞ্চল

৩। সাংস্কৃতিক পরিচয়।

জনসংখ্যাঃ কেন্দ্রশাসিত এই রাজ্যে ৭৮০০৩৭ লোক বাস করে। আয়তনের হিসাবে এই রাজ্যে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৩৪ জন লোক বাস করে। তবে মণিপুর উপত্যকায় (ইম্ফল) সমগ্র জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশ কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। কারণ এই অঞ্চলে উর্বর সমতলভূমি, উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা প্রভৃতির সুবিধা আছে। পার্বত্য অঞ্চলে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে মাত্র ১৮ জন বাস করে।

জনসংস্কৃতিঃ অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। মণিপুরের উপত্যকা অঞ্চলে মেইটিস জাতি বাস করে এবং পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা উত্তরে নাগা এবং দক্ষিণে কুকি নামে পরিচিত। নাগারা স্থায়ীভাবে বাস করে ও আর্দ্র কৃষিদ্বারা জীবনযাপন করে। কুকিরা কতকটা যাযাবর প্রকৃতির, ইহারা শুষ্ক কৃষি পদ্ধতি দ্বারা জীবন ধারণ করে। উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে মণিপুর অঞ্চলেই সর্বাধিক শিক্ষিত ব্যক্তি দেখা যায়।

গ্রাম ও শহরঃ সমগ্র জনসংখ্যার ৯১ শতাংশ এই উপত্যকা বেষ্টিত পার্বত্য-অঞ্চলের ক্ষুদ্র-বৃহৎ ১৮৬৬ গ্রামে বাস করে। **ইম্ফল ঃ** ইম্ফল নদীর পশ্চিমতটে বিশাল পলিভূমির উপর মণিপুর রাজ্যের রাজধানী ইম্ফল শহর অবস্থিত। শহরটির আয়তন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, হস্তশিল্পের দিক দিয়া সর্বভারতে ইহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

৪। আর্থিক পরিচয়।

কৃষিজ সম্পদঃ সমগ্র কর্মীর ৮৪ শতাংশই কৃষি কাজ দ্বারা জীবনধারণ করে। মধ্যভাগের বিস্তৃত পলিগঠিত অংশে ভাল কৃষিকাজ হয়। পার্বত্য অঞ্চলের কৃষিভূমিগুলি ঈষৎ বিক্ষিপ্ত। পাহাড়ের গায়ে ধাপ কাটিয়া চাষ করার পদ্ধতি প্রচলিত থাকিলেও সাধারণভাবে, শুষ্ক কৃষি (ঝুম) পদ্ধতিতে অধিকাংশ চাষ হয়। সর্বত্রই ধান্য প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এতদ্ব্যতীত গম, সরিষা, ডাল নানাবিধ সব্জী প্রভৃতি উৎপাদন করা হয়।

খনিজ সম্পদঃ এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য খনিজদ্রব্যগুলির মধ্যে লৌহ, তাম্র, প্রস্তরজাত লবণ ও চুনাপাথর প্রধান। ইম্‌ফল উপত্যকার কয়েকটি সীমিত অংশে লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। তামার খনিটি উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত। প্রস্তরজাত লবণ ও চুনাপাথর প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়।

শিল্পজ সম্পদঃ প্রধানতঃ কুটিরশিল্পের দ্বারা এই রাজ্যের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হয়। স্থানীয় তাঁত শিল্পজাত বস্ত্রের সর্বভারতীয় চাহিদা আছে। সূক্ষ্ম সেলাইয়ের কাজ, ধাতুদ্রব্য, বাঁশ ও বেতের কাজ পুতুল নির্মাণ নকল গহনা প্রভৃতি শিল্পে ইহা বিশেষ অগ্রসর। সম্প্রতি ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রকল্পের সাহায্যে একদিকে ইঁট, টালি বেকারী, সাবান প্রভৃতি এবং অন্যদিকে গাড়ী নির্মাণ ও মেরামতি, হোসিয়ারী, খাল সংরক্ষণ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপিত হইতেছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ এখানে রেলপথ নাই, তবে জাতীয় সড়ক ৩৯ দ্বারা নাগাল্যাণ্ডের কোহিমা এবং মণিপুরের কাংপোক্‌সি, ইমফ্‌ল, থোবল প্রভৃতি অঞ্চল যুক্ত। ইম্‌ফল উপত্যকায় আভ্যন্তরীণ সড়কপথ আছে, তবে কোনরূপ জলপথের ব্যবস্থা নাই। এখানে অবস্থিত বিমানবন্দরটি দ্বারা শিলচর ও আসামের অন্যান্য অংশে যোগাযোগ রক্ষা করা যায়।

ত্রিপুরা-কাছাড় অঞ্চল

৩। সাংস্কৃতিক পরিচয়।

জনসংখ্যাঃ কেন্দ্রশাসিত ত্রিপুরা রাজ্য, আসামের কাছাড় জেলা, এবং উত্তরে কাছাড় জেলার দক্ষিণাংশ লইয়া এই ভৌগোলিক অঞ্চলটি গঠিত। এই অঞ্চলের ১৮৬০০ বর্গ কিলোমিটার পরিমিত এলাকায় ২.৫৪ মিলিয়ন লোক বাস করে। সাধারণভাবে এখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১৯৯ জন। উত্তর কাছাড় জেলায় লোক বসতি খুব কম। ত্রিপুরা অঞ্চল আংশিক সমভূমি ও আংশিক পর্বতময় হওয়ায় এখানে প্রচুর লোক বাস করে।

জনসংস্কৃতিঃ উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে এই অংশটি সর্বাপেক্ষা শহর সমৃদ্ধ অঞ্চল। কৃষি ও কৃষি সংক্রান্ত কাজ, খনিশিল্প ক্ষুদ্রায়তন হস্তশিল্প ও কুটির শিল্প দ্বারা এখানকার অধিবাসীরা জীবিকা নির্বাহ করে। ত্রিপুরা অঞ্চলে প্রচুর বাঙ্গালী বাস করে এবং এখানে শিক্ষিত লোকের সংখ্যাও বেশ উল্লেখযোগ্য।

গ্রাম ও শহরঃ এই অঞ্চলের গ্রামবাসীরা কাছাড়ের সমভূমি অঞ্চলে ঘনবদ্ধভাবে এবং ত্রিপুরার পশ্চিমাংশের সমভূমিতে ও উত্তর কাছাড়ের সমভূমিতে বিক্ষিপ্তভাবে বাস করে। অবশিষ্ট জনসাধারণ ৫১৩টি শহরের অধিবাসী। তন্মধ্যে আগরতলা (৫৪৮৭৮), **শিলচর** (৪১০৬২), **করিমগঞ্জ** (২৮৬৮৩), **হাইলাকান্দি** (১৪১-৩২), **ধরমনগর** (১৩২৪০) প্রভৃতি শহর বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৪। আর্থিক পরিচয়।

কৃষিজ সম্পদঃ কৃষিকাজ এই অঞ্চলের প্রধান জীবিকা হইলেও সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের সুপ্রচলিত 'ঝুম' পদ্ধতি এখানে অনুসৃত হয় না। পার্বত্য এলাকায় ধাপ কাটিয়া আর্দ্র কৃষি এবং সমভূমির উর্বর অংশে নিবিড় চাষ করা হয়। সেচ ব্যবস্থার সুবিধা, আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, উন্নত বীজ ব্যবহার করা হয়

বলিয়া এখানে একর প্রতি উৎপাদনও বেশী। প্রধান শস্য ধান্য ব্যতীত এখানে সম্প্রতি পাট, তৈলবীজ ও তুলা উৎপন্ন হয়।

খনিজ সম্পদঃ এই অঞ্চল নানাবিধ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। তন্মধ্যে উত্তর কাছাড়ের পার্বত্য অঞ্চলে চুনাপাথর, ত্রিপুরার আগরতলা অঞ্চলে কাদাপাথর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অনত্র, লিগনাইট, চুনাপাথর প্রভৃতি খনিজদ্রব্যের সন্ধান পাওয়া গেলেও, ব্যবহারিক দিক হইতে সেগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে নাই।

শিল্পজ সম্পদঃ এখানে আজ পর্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য শিল্পোদ্যোগ দেখা যায় নাই। প্রচলিত হস্তশিল্পগুলির কথা বাদ দিলে এখানে সবই ক্ষুদ্রায়তন কুটির শিল্পজাতীয়, সাম্প্রতিক কালে এগুলি সংখ্যায় অনেক বাড়িয়াছে। এই সকল শিল্পের মধ্যে চা সংক্রান্ত, তুলা সংক্রান্ত ও তামাক সংক্রান্ত শিল্প বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ। এতদ্ব্যতীত এখানে তৈল প্রস্তুত, ধানকল, করাতকল প্রভৃতি শিল্প আছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ এই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উত্তর ভারতের অন্যান্য অংশের তুলনায় কিছুটা উন্নত। আগরতলা-শিলং জাতীয় সড়ক ব্যতীত এখানে বহু আভ্যন্তরীণ সড়কপথ আছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথের একটি শাখা উত্তর কাছাড়ের হাফলং এবং কাছাড়ের করিমপুর, শিলচর প্রভৃতি স্থান যুক্ত করিতেছে। বারাক নদীর একটি খাল দ্বারা শিলচর ও করিমগঞ্জের মধ্যে নৌচলাচল করে। এতদ্ব্যতীত আগরতলায় একটি বিমান বন্দর আছে। ইহার মাধ্যমে কলিকাতা, গৌহাটি, ইম্ফল প্রভৃতি যাতায়াত করা যায়।

মিজো পাহাড় অঞ্চল

৩. সাংস্কৃতিক পরিচয়

জনসংখ্যাঃ এই পার্বত্য এলাকার ২৬০৯১ বর্গকিলোমিটার পরিমিত এলাকায় ২৬৬০৬৩ লোক বাস করে। সুতরাং এখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলো-মিটারে মাত্র ১৩ জন। দক্ষিণের জলবায়ুতে উত্তাপ ও আর্দ্রতা বেশী বলিয়া এবং পূর্বের নদী উপত্যকাগুলি সংকীর্ণ ও নদীস্রোত তীব্র হওয়ায় এই অঞ্চলের জনবসতি সাধারণভাবে উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং পশ্চিম হইতে পূর্বে কমিয়া গিয়াছে।

জনসংস্কৃতি ঃ এখানকার অধিবাসীরা লুসাই নামে পরিচিত। লুংলের দক্ষিণে পানেই, চাকমা, রিয়াং প্রভৃতি সম্প্রদায় বাস করে। কৃষিকাজ পশুপালন, নানাবিধ পশু শিকার প্রভৃতি দ্বারা ইহারা জীবিকা নির্বাহ করে। ইহারা এখনও অনুন্নত, শিক্ষার আলোক ইহাদের মধ্যে তেমন প্রসার লাভ করে নাই।

গ্রাম ও শহরঃ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে এই পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা বসবাস করে। প্রায় সকল অধিবাসীই গ্রামে বাস করে, তবে এই অঞ্চলের একমাত্র শহর আইজল (১৪২৫৭) জনসংখ্যা ও প্রশাসনিক ব্যাপারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৪. আর্থিক পরিচয়

কৃষিজ সম্পদঃ ঝুম পদ্ধতিতে কৃষিকাজই মিজো এলাকার অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা। পর্বতময় অঞ্চল বলিয়া এখানে কৃষি জমির পরিমাণ খুব সামান্য। এখানে

নানাবিধ ধান, তৈলবীজ, তুলা, বাদাম, কুমড়া, ভুট্টা, কচু প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। মনুষ্য খাদ্যরূপে ধান এবং পশু খাদ্যরূপে ভুট্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রাণীজ সম্পদঃ গৃহপালিত পশুর মধ্যে ছাগল, গরু, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। স্থানীয় জলাশয় ও নদীতে মৎস্য চাষ ও শিকার করা হয়।

যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ একটিমাত্র সড়কপথ ব্যতীত এই অঞ্চলে অন্য কোন প্রকার যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে নাই। এই সড়কপথটি উত্তরে কাছাড়ের শিলচর হইতে মিজো পাহাড়ের দক্ষিণ অংশে লুংলে অবধি বিস্তৃত। এখানে কোন প্রকার রেলপথ, বিমানপথ বা জলপথ নাই।

পরিশিষ্ট ঃ অনুশীলনী

প্রথম অধ্যায়

১। অঞ্চল বলিতে কি বুঝায়? উপযুক্ত উদাহরণ সহকারে ব্যাখ্যা কর।
২। ভৌগোলিক অঞ্চল কাহাকে বলে? ইহার সহিত অন্যান্য অঞ্চলের পার্থক্য কি?
৩। নিম্নলিখিত ভৌগোলিক অঞ্চলগুলির অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির নাম নির্দেশ করঃ (ক) গঙ্গা সমভূমি (খ) ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, (গ) কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ের অন্তরীপ, (ঘ) পূর্ব উপকূল অঞ্চল, (ঙ) মরু অঞ্চল।
৪। নিম্নলিখিত রাজ্যগুলির ভৌগোলিক অঞ্চল নির্ণয় করঃ (ক) তামিলনাড়ু, (খ) বিহার, (গ) মেঘালয়, (ঘ) মধ্যপ্রদেশ, (ঙ) উত্তরপ্রদেশ।
৫। মানচিত্রে নির্দেশ করঃ (ক) মধ্যগঙ্গা সমভূমি, (খ) কর্ণাটক উপকূল, (গ) দন্ডকারণ্য-ছত্রিশগড় মালভূমি, (ঘ) মরু ও মরুপ্রায় অঞ্চল, (ঙ) কুমায়ুন হিমালয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের অন্তর্গত রাজনৈতিক অঞ্চলগুলির নামোল্লেখ সহ সমগ্র অঞ্চলটির রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক সীমা নিরূপণ কর।
২। এই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
৩। এই অঞ্চলের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য কি কি?
৪। যে সকল শিল্পে এই পার্বত্য অঞ্চলটি বিশেষ উন্নতি করিয়াছে তাহার বিবরণ দাও।
৫। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ (ক) ভূতাত্ত্বিক গঠন, (খ) তাপমাত্রার বৈশিষ্ট্য, (গ) স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ, (ঘ) কাশ্মীর হিমালয়ের যোগাযোগ ব্যবস্থা, (ঙ) পর্যটন শিল্প।
৬। নিম্নলিখিত শহরগুলি সম্বন্ধে যাহা জান লিখঃ শ্রীনগর, জম্মু, বরামুলা, অনন্তনাগ, সিমলা, কাংরা, বিলাসপুর, দেরাদুন, আলমোড়া, নৈনিতাল, দার্জিলিং, কালিম্পং।
৭। পূর্ব হিমালয় ও পশ্চিম হিমালয়ের অন্তর্গত রাজ্যগুলির একটি তুলনামূলক আলোচনা লিখ।
৮। মানচিত্রে নির্দেশ করঃ (ক) পূর্ব হিমালয়, (খ) গ্রেট কারাকোরাম-লাডাক-পিরপাঞ্জাল পর্বতমালা, (গ) সিন্ধু নদী ও তাহার শাখা-প্রশাখা, (ঘ) শ্রীনগর, জম্মু, সিমলা, কাংরা, নৈনিতাল, দেরাদুন শহর, (ঙ) কুমায়ুন হিমালয়ের সড়কপথ।

তৃতীয় অধ্যায়

১। গঙ্গা-সমভূমি অঞ্চলের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সীমা নির্দেশ করিয়া অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির নাম উল্লেখ কর।

২। গঙ্গা সমভূমির বিভিন্ন অঞ্চলে জনবসতি গড়িয়া উঠিবার কারণগুলি নির্দেশ কর।

৩। কোন কোন কৃষিজ সম্পদের উপর এই অঞ্চলের অর্থনীতি নির্ভর করিতেছে? ইহাদের একটি বিবরণ দাও।

৪। যে সকল গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের জন্য এই অঞ্চল প্রসিদ্ধ, তাহাদের সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা কর।

৫। সিন্ধু সমভূমির অন্তর্গত রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে একটি যুক্তিপূর্ণ আলোচনা কর।

৬। নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলির ভূপ্রকৃতি, কৃষিজ, খনিজ ও শিল্প সম্পদকে কেন্দ্র করিয়া তুলনামূলক আলোচনা কর: (ক) সিন্ধু সমভূমি ও উচ্চগঙ্গা সমভূমি, (খ) উচ্চগঙ্গা সমভূমি ও মধ্যগঙ্গা সমভূমি, (গ) মধ্যগঙ্গা সমভূমি ও নিম্নগঙ্গা সমভূমি।

৭। নিম্নলিখিত শহরগুলি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ: চণ্ডীগড়, অমৃতসর, লুধিয়ানা, আম্বালা, জালন্ধর, দিল্লী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, মীরাট, আগ্রা, বেনারস, আলিগড়, গোরক্ষপুর, মীর্জাপুর, পাটনা, ভাগলপুর, মজঃফরপুর, আসানসোল, রাণীগঞ্জ, খড়্গপুর, টিটাগড়, কল্যাণী, দুর্গাপুর।

৮। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও: (ক) নিম্নগঙ্গা সমভূমির নদী, (খ) সমগ্র গঙ্গা সমভূমির প্রধান সড়কপথ, (গ) সেচ ব্যবস্থা (ঘ) বৃষ্টিপাতের বৈচিত্র্য: (ঙ) ভূ-তাত্ত্বিক গঠন।

৯। মানচিত্রে নির্দেশ কর: (ক) নিম্নগঙ্গা সমভূমি, (খ) গঙ্গা ও তাহার শাখা-প্রশাখা, (গ) চণ্ডীগড়, অমৃতসর, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, আলিগড়, পাটনা, হলদিয়া শহর, (ঘ) দুইটি প্রধান বস্ত্রবয়ন কেন্দ্র, (ঙ) দুইটি প্রধান ধাতু-শিল্প কেন্দ্র।

চতুর্থ অধ্যায়

১। মরু ও মরুপ্রায় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যের নাম উল্লেখ করিয়া ইহার ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সীমা নির্ধারণ কর।

২। এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৩। এই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সম্পদগুলির বিবরণ দাও।

৪। নিম্নলিখিত শহরগুলি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ: যোধপুর, বিকানীর, গঙ্গানগর, সুজানগড়, বারমের, জয়সলমীর।

৫। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও: মরু অঞ্চলের গঠন বৈশিষ্ট্য, ফুলার্স আর্থ, যোগা-যোগ ব্যবস্থা।

৬। মানচিত্রে নির্দেশ কর: (ক) লুনি নদী, (খ) যোধপুর, বিকানীর, গঙ্গা-নগর শহর, (গ) লবণাক্ত মৃত্তিকা অঞ্চল, (ঘ) গম ও তৈলবীজ উৎপাদক, (ঙ) জিপসাম ও লিগনাইট উৎপাদক অঞ্চল, (চ) প্রধান রেলপথ।

পঞ্চম অধ্যায়

১। কচ্ছ-কাথিয়াবাড় অন্তরীপ অঞ্চলের অন্তর্গত রাজ্য বা রাজ্যগুলির নাম উল্লেখ করিয়া ইহার ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সীমা নিরূপণ কর।

২। কচ্ছ ও কাথিয়াবাড় অন্তরীপের ভূপ্রকৃতি ও নদনদী সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
৩। এই অঞ্চলের খনিজ সম্পদ স্থানীয় শিল্পগুলিকে কিভাবে সাহায্য করিতেছে?
৪। নিম্নলিখিত শহরগুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা করঃ আহমেদাবাদ, গান্ধীনগর, বরোদা, রাজকোট, ভুজ, ভবনগর, সুরাট, জামনগর।
৫। এই অঞ্চলের সেচ-ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়া কৃষিজ সম্পদের একটি পূর্ণ বিবরণ দাও।
৬। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ (ক) কাণ্ডলা বন্দর, (খ) কচ্ছের রণ, (গ) যোগাযোগ ব্যবস্থা, (ঘ) বৃষ্টিপাতের বৈচিত্র্য, (ঙ) জনসংখ্যা।
৭। মানচিত্রে নির্দেশ করঃ (ক) কচ্ছের রণ, (খ) দিউ, আহমেদাবাদ, বরোদা, ভাবনগর শহর, (গ) সবরমতী ও ভাদর নদী, (ঘ) লিগনাইট ও বক্সাইট উৎপাদক অঞ্চল, (ঙ) দুইটি খনিজ তৈল সমৃদ্ধ অঞ্চল, (চ) দুইটি প্রধান বন্দর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। দক্ষিণের মালভূমি অঞ্চল বলিতে ভারতের কোন অংশকে বুঝায়? অঞ্চলটির ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সীমারেখার নির্দেশ পূর্বক ইহার বিভিন্ন অংশের বিশদ আলোচনা কর।
২। এই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি ও নদনদী সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
৩। এই অঞ্চলের প্রধান কৃষিদ্রব্যগুলি কোন কোন স্থানে উৎপন্ন হয়?
৪। যে সকল গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের জন্য এই অঞ্চল বিশেষ প্রসিদ্ধ তাহার একটি বিবরণ দাও।
৫। এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে জনবসতির তারতম্যের প্রধান কারণ কি?
৬। ছত্রিশগড়-দণ্ডকারণ্য ও বুন্দেলখণ্ড-বাঘেলখণ্ড অঞ্চল দুইটির মধ্যে কৃষি, শিল্প, খনিজ ও যাতায়াত ব্যবস্থার একটি তুলনামূলক আলোচনা কর।
৭। দাক্ষিণাত্যের আর্থিক সম্পদ সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ লিখ।
৮। গোয়ালিয়র-উদয়পুর-মালব এবং ছোটনাগপুর-উড়িষ্যা মালভূমির একটি তুলনামূলক আলোচনা কর।
৯। নিম্নলিখিত শহরগুলি সম্বন্ধে যাহা জান লিখঃ উদয়পুর, জয়পুর, আজমীর, গোয়ালিয়র, ইন্দোর, ভূপাল, জব্বলপুর, ঝাঁসী, সাতনা, বিলাসপুর, ভিলাই, রায়পুর, রায়গড়, দুর্গ, জগদ্দলপুর, রাঁচী, জামসেদপুর, ধানবাদ, রাউরকেল্লা, সম্বলপুর, বোকারো, পুণা, নাগপুর, নাসিক, ব্যাঙ্গালোর, মহীশূর, ভদ্রাবতী, হায়দ্রাবাদ, কোয়েম্বাটুর, সালেম, তিরুচিরাপল্লী।
১০। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ রাজ্য পুনর্গঠন, প্রধান মৃত্তিকা, পর্ণমোচী বৃক্ষের বন, উদয়পুর-গোয়ালিয়র অঞ্চলের সেচ ব্যবস্থা, বাঘেলখণ্ড-বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা, ছত্রিশগড়-দণ্ডকারণ্য অঞ্চলের বনজ সম্পদ ও শিল্প, ছোটনাগপুর-উড়িষ্যা মালভূমির প্রধান লৌহ-শিল্প কেন্দ্র, দাক্ষিণাত্যের বস্ত্রবয়ন কেন্দ্র।

১১। মানচিত্রে নির্দেশ করঃ (ক) তিনটি রাজধানী শহর, (খ) তিনটি লৌহ ও ইস্পাত কেন্দ্র, (গ) মহানদী ও গোদাবরী নদীর গতিপথ (ঘ) কৃষ্ণ-মৃত্তিকা অঞ্চলের কয়লা ও লৌহ উৎপাদক অঞ্চল।

সপ্তম অধ্যায়

১। পূর্ব উপকূল অঞ্চলের রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক গঠন সম্বন্ধে আলোচনা কর।

২। এই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি ও নদনদীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

৩। যে সকল কৃষিজ দ্রব্যে এই অঞ্চলটি সমৃদ্ধ তাহার একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দাও।

৪। এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য শিল্প-সম্পদ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৫। নিম্নলিখিত শহরগুলি সম্বন্ধে যাহা জান লিখঃ ভুবনেশ্বর, কটক, বহরমপুর, পুরী, বিশাখাপত্তন, রাজমুন্দ্রী, কাকিনাড়া, বিজয়বাড়া, মাদ্রাজ, মাদুরাই।

৬। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ (ক) জনসংখ্যা, (খ) মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য, (গ) যাতায়াত ব্যবস্থা, (ঘ) উল্লেখযোগ্য বন্দর, (ঙ) সেচ ব্যবস্থা।

৭। মানচিত্রে নির্দেশ করঃ (ক) মাদুরাই, ভুবনেশ্বর, বিজয়বাড়া শহর, (খ) চিল্কা হ্রদ ও মহানদী ব-দ্বীপ অঞ্চল, (গ) ধান্য ও তৈলবীজ উৎপাদক অঞ্চল, (ঘ) দুইটি ধাতুশিল্প কেন্দ্র, (ঙ) উপকূলাঞ্চলের রেলপথ।

অষ্টম অধ্যায়

১। পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের রাজনৈতিক গঠন এবং ভৌগোলিক সীমা নির্দেশ কর।

২। এই অঞ্চলের ভূপ্রকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য কি কি?

৩। যে সকল সম্পদের উপর এই অঞ্চলের অর্থনীতি নির্ভর করিতেছে, তাহার একটি পূর্ণ বিবরণ দাও।

৪। নিম্নলিখিত শহরগুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখঃ বোম্বাই, ম্যাঙ্গালোর, ত্রিবান্দ্রাম, গোয়া, রত্নগিরি, কোজিকোদে, কুইলন।

৫। পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের একটি তুলনামূলক আলোচনা লিখ।

৬। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ (ক) জনসংখ্যার ঘনত্ব, (খ) আভ্যন্তরীণ জলপথ, (গ) সেচ-ব্যবস্থা, (ঘ) খনিজ সম্পদ, (ঙ) কর্ণাটক উপকূলের বন্দর।

৭। মানচিত্রে নির্দেশ করঃ (ক) কোংকণ উপকূল, (খ) ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা অঞ্চল, (গ) ত্রিবান্দ্রাম, রত্নগিরি, বোম্বাই শহর, (ঘ) পীচি ও চালাকুডি-এক প্রকল্প, (ঙ) প্রধান বস্ত্রবয়ন ও ধাতুশিল্প কেন্দ্র, (চ) প্রধান সড়কপথ।

নবম অধ্যায়

১। আসাম রাজ্যের কোন কোন অংশ ইহার অন্তর্গত? ইহাদের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সীমা নিরূপণ কর।

২। ভূ-প্রকৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে ব্রহ্মপুত্র ও অন্যান্য নদীর গতিপথ সম্বন্ধে আলোকপাত কর।

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখঃ গৌহাটি, ডিব্রুগড়, ডিগবয়, তিনসুকিয়া, ধুবড়ী, তেজপুর।
৪। সেচ-ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়া এই অঞ্চলের কৃষিজ উৎপাদন সম্বন্ধে আলোচনা কর।
৫। কোন কোন শিল্পের জন্য এই অঞ্চলটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ?
৬। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ (ক) বন্যার কারণ, (খ) জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য, (গ) প্রাণীজ সম্পদ, (ঘ) আভ্যন্তরীণ সড়কপথ (ঙ) ভূতাত্ত্বিক গঠন।
৭। মানচিত্রে নির্দেশ করঃ (ক) তৈলবীজ ও চা উৎপাদক অঞ্চল, (খ) তৈল উৎপাদক অঞ্চল, (গ) ধাতু ও তৈল শিল্প অঞ্চল, (ঘ) গৌহাটি, ধুবড়ী ও ডিব্রুগড় শহর, (ঙ) প্রধান বিমান পথ।

দশম অধ্যায়

১। ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সীমার উল্লেখ করিয়া এই অঞ্চলটির অন্তর্গত রাজ্য ও রাজ্যাংশগুলির নাম লিখ।
২। এই অঞ্চলের, ভূপ্রকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য কি কি?
৩। নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলির সাংস্কৃতিক ও আর্থিক পরিচয় সম্বন্ধে যাহা জান লিখঃ (ক) মণিপুর অঞ্চল, (খ) নাগাল্যান্ড অঞ্চল, (গ) মেঘালয় অঞ্চল, (ঘ) ত্রিপুরা-কাছাড় অঞ্চল, (ঙ) তিরাপ-লোহিত অঞ্চল, (চ) মিজো-হিল অঞ্চল, (ছ) মিকির পার্বত্য অঞ্চল।
৪। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ (ক) রাজ্য গঠনের ইতিহাস, (খ) দোঁয়াশ ও পলিমৃত্তিকা অঞ্চল, (গ) শুষ্ক ও আর্দ্র কৃষি পদ্ধতি, (ঘ) জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য।
(গ) দোঁয়াশ ও পলিমৃত্তিকা অঞ্চল, (ঘ) শুষ্ক ও আর্দ্র কৃষি পদ্ধতি, (ঙ) জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য।
৫। মানচিত্রে নির্দেশ করঃ (ক) কোহিমা, ইম্ফল, আগরতলা, শিলং, তুরা শহর, (খ) প্রধান রেলপথ, (গ) ধান্য ও তৈল উৎপাদক অঞ্চল, (ঘ) খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পর্বত ও তিরাপ লোহিত অঞ্চল, (ঙ) মণিপুর ও লোহিত নদী।